আবার জীবন

সুভাষ সমাজদার



মিত্রালয়
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সাড়ে তিন টাকা

॥ শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৪ ॥

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ হইতে শ্রীমুরারিমোহন কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

যাঁর উৎসাহে আমার মন সাহিত্যচর্চার প্রেরণা পেয়েছিল,

জীবনবোধের গভীরতায় যিনি ছিলেন অনুপম শিল্পী

পরমপূজনীয় **বাবা**-কে

এই উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্র
ও পরিবেশ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

॥ এক ॥

পুবের আকাশে রক্তপলাশের রঙ ধরেছে। কালিযাগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের ঝাউগাছের ঝিরি ঝিরি পাতায ছায়া ছায়া অন্ধকার ঝুলছে বাদুড়ের মত। ঠং ঠং—ঘণ্টার ধাতব শব্দটা তরঙ্গিত হয়ে গেল ভোরের বাতাসে। সার্চ লাইটের উগ্র সাদা আলোয় চারিদিক ঝলসে দিযে হলদিবাড়ী প্যাসেঞ্জার পৌঁছল। মুহূর্ত্তে জেগে উঠল নিঝুম স্টেশনটা। বাক্স বেডিং নিয়ে দলে দলে নামল যাত্রীরা। ঝড়ের মত সোঁ সোঁ করে ছুটে এল 'পথিকবন্ধু' 'পুষ্পকরথ' 'আগে চল' মোটর বাসের ড্রাইভাররা। এল ট্যাক্সীর মালিকরা। 'আসুন—চলে আসুন স্যার, আমাব গাডীতে। মাত্র তিন ঘণ্টায রামনগর'। চেঁচিয়ে উঠল 'পথিক বন্ধু'র বিরজা দাস। 'পুষ্পকরথে'র কড়কড়ি ঝাঁপিযে এসে যাত্রীদের কারো কারো বাক্স বেডিং কুলীদের হাত থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল তার গাড়ীতে। চোখের পলকে 'পথিক বন্ধু' 'পুষ্পক রথ' আর 'আগে চল' মোটর তিনটি যাত্রী বোঝাই হয়ে উঠল। আর যারা দু'এক টাকা বেশী খরচ করতে পারে, তারা ট্যাক্সী নিয়ে রওনা হয়ে গেল রামনগরে।

বড়লোকের বাড়ীতে আশ্রিত গরীব অসহায় আত্মীয়ের মতই এই পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিতান্ত অবহেলায় আর অনাদরে আজও সেই মধ্যযুগের অন্ধকারে মুখ থুবড়ে আছে। মাত্র পঞ্চাশ মাইল রেলপথ ছাড়া এই জেলার বিশাল বিস্তৃত এলাকার কোথাও রেল নেই। যেদিকে তাকাও বিপুলব্যাপ্ত দিগন্তপ্রসারিত ধূ ধূ প্রান্তর। রাঙা মাটির টিলায় টিলায় তালবীথির মর্মর। বরিন্দের মাঠের শোঁ শোঁ করা হাওয়ায যেন পরম শান্তির ঘুমে অচেতন হয়ে গা এলিয়ে পড়ে আছে উত্তর বঙ্গের এই অঞ্চল। যন্ত্রমুখর সভ্যতা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ভারতীয যুক্তরাষ্ট্রের এই

সীমান্তে এই কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে। তার কয়েক মাইল পরেই হাওয়ায় উড়ছে পাকিস্থানের পতাকা। সম্পূর্ণ ভিন্ন রাষ্ট্র! ভিন্ন দেশ! কলকাতা—দিল্লী—বোম্বাই আর দূর পৃথিবীর সংবাদ আসে কাটিহার হয়ে ব্রাঞ্চ লাইনের এই রেলপথ দিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায। আসে খবরের কাগজ, 'মেল'ও আসে এই পথ দিয়ে। আর আসে বিদেশী মানুষ দলে দলে। কেউ জীবিকার সন্ধানে, কেউ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপদ এলাকায় বসতি করার উদ্দেশ্যে, আবার কেউ বা সীমান্ত অঞ্চলে চোরাই ব্যবসা করে সহজে আর অতি কম সময়ে কিছু উপার্জনের আশায়।

সূর্য্যের সোনালী আলো রেশমী ওডনার মতই ছডিযে পড়ল বাস ষ্ট্যাণ্ডে। 'কৈ মশাই বাস ছাড়বেন কি না বলুন?' অধৈর্য্য হয়ে চেঁচিযে উঠল যাত্রীরা। 'পুষ্পক রথে'র কডকডির রক্তাভ চোখদুটো সাপেব জিভের মত চিক চিক করে উঠল। কোমরে হাত দিযে ঘাড বাঁকা কবে বলল—ছাব্বিশ ঘণ্টা ট্রেনে করে আসতে পেরেছেন। তখন কথাটি বলেন নি। আর এখন মাত্র পনের মিনিটেই চটে উঠছেন?

—'মেল' যায, খবরের কাগজ যায আমাদের এই গাডীতে—হাত জোড করে বলল 'পথিক বন্ধু'ব বিরজা দাস—একটু বুঝে সুঝে নিতে হবে তো স্যার।

—তাই বলে ধানের বস্তার মত ঠাসা ঠাসি করে মানুষ ভরিযে নিযেও বসে থাকবেন?

রুদ্ধ আক্রোশে বোমাব মত ফেটে পড়ল যাত্রীরা। 'আগে চল' হর্ণ বাজিয়ে 'ষ্টার্ট' দিযে রওনা হলো। 'পুষ্পক রথে'র কডকডি হেঁকে বলল এ্যাসিষ্ট্যান্টকে—স্টার্ট দে—

'পথিক বন্ধুর' ক্লিনার মণ্টু তখনো চেঁচিয়ে বলছে—আসুন—আসুন একদম ফাঁকা গাড়ী!

—রামনগর এখান থেকে কতমাইল হে?

—পাকা ছাপ্পান্ন মাইল স্যার—ঠোঁটের কোণে বিড়ি ঝুলিয়ে বলল মণ্টু প্রশ্ন কর্তাকে—যাবেন না কি, দাদা?

—কত ভাড়া ?

—ড্রাইভার সিট চার টাকা। বক্স, লেডীজ দিয়ে ফুল হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন। থার্ড ক্লাস মাত্র তিন টাকা—একটু থেমে সে, ধীরেন্দ্রলাল জোয়ার-দারের দারিদ্র্য জীর্ণ, শীর্ণ মুর্তির দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মুখটা বাঁকিয়ে বলল—মনে হচ্ছে ট্যাক গড়ের মাঠ—

—হ্যাঁ ভাই ঠিকই বলেছো—নির্জীব গলায় বলল ধীরেন্দ্রলাল। রাত জাগা চোখ দুটোর দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। বলল—পকেটে মাত্র পাঁচ সিকে পয়সা আছে—

—মাত্তর পাঁচ সিকে! তাহলে ছাতু আর চানা কিনে জল দিয়ে খেয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকুন।

অপমানের যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেল ধীরেন্দ্রলালের মুখ। 'পথিক বন্ধু'র ইঞ্জিনের 'কারবরেটার' আর পেট্রোল ট্যাঙ্কটা তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে নিয়ে বলল বিরজা দাস—পেট্রোল নিয়েছিস তো রে মণ্টু ?

—হ্যাঁ, বাড়তি তিন টিন নিয়েছি।

—ওতেই হবে। কিন্তু ইঞ্জিনের পাইপটা আবার গোলমাল না করে, সেদিন তো তেল 'চোক্' করছিল।

—ময়লা জমেছিল ভেতরে—আজ সকালে খুব ভাল করে সাফ করে দিয়েছি বিরজাদা—

—চলে আয়—চলে আয় ষ্টার্ট দেব—সুইচ্ টিপে স্টার্ট'রে চাপ দিল বিরজা। ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত গর্জন করে উঠল পথিক বন্ধুর ইঞ্জিন। যাত্রীরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—যাক বাবা বাঁচা গেল! এখন গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়।

মরিয়া হয়ে ছুটে এল ধীরেন্দ্রলাল ড্রাইভারের কাছে। ব্যাকুল গলায় বলল—বিরজা তুই আমাকে চিনতে পারলি না ভাই ?

—কে! আরে ধীরেন যে! তুই কেমন করে এলি এখানে ?

—সে ভাই অনেক কথা। তোর মোটরে আমাকে রামনগর নিয়ে যেতে পারবি ?

—আয় আয়—শীগ্‌গীর উঠে পড়—

লাফিয়ে এসে বিরজার পাশে বসল ধীরেন্দ্রলাল।

গর্জন করে ছুটে চলেছে যাত্রী বোঝাই বাস। স্পীডোমিটারের কাঁটা কাঁপছে থর থর করে ত্রিশের ঘরে। রোদজ্বলা কালো চকচকে পীচের রাস্তাটার ওপর চোখ রেখে গিয়ারের ওপর হাত দিয়ে বলল বিরজা—তুই কি সাংঘাতিক রোগা হয়ে গেছিস। দিনাজপুর জেলে তো দেখেছি, কী স্বাস্থ্য ছিল তোর!

—বিয়াল্লিশ সালে জেলে গিয়ে—দেশ সেবার নেশায় পাগল হয়েই তো জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছি ভাই।

—কেন? সাঁপাহারে তোর বাড়ী ছিল। ষাট-পঁয়ষট্টি বিঘে ধানী জমিও ছিল জানতাম—

—সাঁপাহার সে তো পাকিস্থান। সেখান আর থাকা চলে না। বুড়ী পিসিমাকে রেখে বেরিয়ে এসেছি—

—জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিস কবে?

—ঠিক দেশ ভাগ হওয়ার কিছু আগে। জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতায় গিয়ে কত চেষ্টা করলাম চাকরীর। দেখলাম আমরা যাদের কথায় ঝড় দুর্যোগের রাতে মাইলের পর মাইল হেঁটে গেছি। তারা অনেকেই হোমরা-চোমড়া হয়েছে। কিন্তু—

—তাদের সহকর্মীকে চিনতেই পারল না—তাই না? বিরজার মোটা মোটা বেগুনী ঠোঁটের রেখায় রেখায় ধারালো হাসি ফুটল। বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—আমি কাকেও তেল মাখাতে যাইনি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, রোগা বৌটা মরো মরো। ছেলেটার ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি! বাদুড়-চোষা চেহারা—

—তুই কি করলি?

—দেখতেই পাচ্ছিস। সোজা কলকাতায় গিয়ে ‘পাঞ্জাব মোটর ওয়ার্কস’ কোম্পানীতে নাম লিখিয়ে ছমাসে ‘হেভী’ আর ‘লাইট’ কার ড্রাইভিং—

দুটোরই লাইসেন্স নিয়ে বেরিয়ে এলাম। মাসের শেষে কোম্পানীর কাছ থেকে একশো টাকা পাচ্ছি, আর 'রোড সাইডেও' টু পাইস ইনকাম করছি—

—তুই দাঁড়িয়ে গেছিস তাহলে! ক্ষীণ গলায় যেন বহুদূর থেকে বলল ধীরেন্দ্রলাল। দূর বিসর্পিল রাস্তাটার দিকে স্থির লক্ষ্য রেখেই বিরজা প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করল, ঐ বেকার ধীরেন্দ্রলালের চোখেই তীব্র ঘৃণার পঙ্কিল ছায়া পড়েছে। ড্রাইভার! তুচ্ছ এই একটা শব্দ নিঃশেষে মুছে দিয়েছে উজ্জ্বল আদর্শে উদ্দীপ্ত, তার জীবনের সেই দিনগুলো। হ্যাঁ সে জানে। আজ শুধু 'ড্রাইভার' বললেই তার সব পরিচয় শেষ হয়ে যায়। বাসের ভেতরে যাত্রীদের টুকরো টুকরো কথার গুঞ্জন উঠেছে। একটা কালো 'সার্ভে টেপে'র মত যেন মোটরের ইঞ্জিনের নীচে জড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তাটা। দুদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু ধু ধু ধানের মাঠ। নীল দিগন্তের সীমায় সীমায় তরঙ্গায়িত সবুজের বিশাল সমুদ্র। আর তার বুকে শ্বেত শুভ্র হংসবলাকার মত জ্বলজ্বল করছে সারি দেওয়া সাঁওতাল ওরাঁওদের মেটে ঘর। ধীরেন্দ্রলালের রাত-জাগা জ্বালাধরা চোখে সজল উদ্দাম হাওয়া যেন শান্ত স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে দিল। বিরজা বলল—রামনগরে কোথায় যাবি?

—কোথাও না। নতুন মহকুমা সহর তো রামনগর। যাচ্ছি যদি কোন চাকরী-বাকরীর সুবিধা করতে পারি। একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল—চাকরীই বা দেবে কে, ক্লাস নাইন পর্য্যন্ত—

—সত্যিই ভীষণ সমস্যা—চিন্তার ছায়া পড়ল বিরজার মুখে। বলল—গঙ্গারামপুর 'রুটে' মোটরের ক্লিনার হবি?

—ক্লিনার! ছিঃ ছিঃ—তীব্র ঘৃণায় কঠিন হয়ে উঠল ধীরেন্দ্রলালের মুখখানা। উত্তপ্ত গলায় বলল—জল দিয়ে গাড়ী ধোয়া আর গাড়ী খারাপ হলেই একটা জন্তুর মত হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্জিনের নীচে ঢুকে নাটবল্ট ধোবার চাকরী! না ভাই, ও আমি পারবো না।

বিরজার চোয়াল দুটো খিলের মত এঁটে বসল তার গালে। তবুও নরম

গলায় বলল—ড্রাইভার মাত্রেই ক্লিনার, ধীরেন। মোটরের সব কাজই তাদের জানতে হয়—

—তুই যা পারিস। আমি তা নাও পারতে পারি।

তীব্র একটা ধিক্কার তাল-তাল কাদার মত জমে উঠল বিরজার মনের ভেতরে। মুহূর্তে তার ড্রাইভার জীবনের দৈন্যটা একটা ভয়ঙ্কর দৈত্যের মত ফুঁসে উঠল তার বুকের ভেতরে।

—তুই কি রাগ করলি বিরজা?

কিন্তু তার কথা যেন শুনতেই পেল না বিরজা। তীব্র ক্ষোভে, অপমানে দাবদাহের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে তার চেতনা। 'এ্যাক্সিলারেটরে' চাপ দিয়ে মুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে দিল। স্পীডোমিটারের কাঁটা ত্রিশ ছাড়িয়ে চল্লিশের ঘরে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

—আরে আরে ড্রাইভার করছো কি!

কলরব করে উঠল যাত্রীরা। দীর্ঘ পথ ধীরেন্দ্রলালের সঙ্গে আর ভাল করে কথা বলল না বিরজা। রামনগর শহরের বাস স্ট্যাণ্ডে 'পথিক বন্ধু' এসে থামল।

॥ দুই ॥

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাঁপিয়ে নেমে আসছে রামনগরের ওপরে। বড় রাস্তার দুইপাশে চকভবানীর প্রতিটি বাড়ী থেকে শঙ্খের ধ্বনি বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল। ধীরেন্দ্রলাল ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে, হাতে খবরের কাগজে জড়ানো মোড়কে ছোট পুঁটলী নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে চলেছে বস্তীর দিকে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার লম্বা হিলহিলে কালো সাপের মত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে কতগুলো রোঁয়াওঠা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে আপত্তি জানাল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে চীৎকার করে বলল ধীরেন্দ্রলাল—এই শালারা চুপ কর। আমাকে কি ভূত পেয়েছিস?

অসহ্য ক্লান্তিতে আর খিদের জ্বালায় তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। মুখে তেতো জল কাটছে। রাস্তার ধারে একটা বিশাল চকমিলানো দালান বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল ধীরেন্দ্রলাল। বাড়ীর মালিক মোক্তার কালীজীবন বাবু চোখদুটো আধবোজা করে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন।

—স্যার আপনার খোঁজে কোন চাকরী আছে? একদিন দেশের কাজ করে জেল খেটেছি—

গড়গড়ার একটানা গুড়ুক গুড়ুক শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। রক্ত চোখদুটো নাচিয়ে নিঃশব্দে দূরে অন্ধকারে তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে সদর রাস্তা দেখিয়ে দিলেন গৃহস্বামী। আবার গড়গড়ার গুঞ্জন ফুটল।

—স্যার বিশ্বাস করুন, আমি ভিখিরী নই। দেশটা ভাগ না হলে আপনার মত তেলজলে চকচকে হয়ে আমিও—

—আবার কথা? কড় কড় করে চোয়াল দুটো বেজে উঠল মোক্তার কালীজীবনের। গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে পড়ল। বিষাক্ত গলায় চীৎকার করে উঠল—দেশের কাজ করেছো তো একেবারে মাথা কিনেছো। আজকাল যত চোর গুণ্ডা বদমায়েশ আর তিনশো ছেষট্টি ধারার ক্রিমিন্যালদের হয়েছে ঐ এক ফ্যাশান। দেশের কাজ করেছি! যাও—বেরিয়ে যাও—

একটা বন্দুকের গুলীর মত বারান্দা থেকে ছিটকে নেমে গেল ধীরেন্দ্রলাল। অন্ধকার রাস্তার ওপর দিয়ে নড়বড়ে দেহটাকে কোনরকমে টেনে টেনে নিয়ে চলল বাজারের দিকে। পকেটের পাঁচ সিকে পয়সা দিয়ে দুপুরে হোটেলে ভাত খেয়েছে। দুপয়সার মুড়ি কেনারও পর্য্যন্ত পয়সা নেই। অনাহার। মজ্জায় মজ্জায় তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা তরঙ্গিত হয়ে গেল। রাস্তার দুধারে জোরালো আলোয় ঝলমলে জাহাজের মত সারি সারি বিশাল বাড়ী। বাড়ীগুলোর আলোকিত জানালায় জানালায় কত মেয়ে-পুরুষের সুখী হাস্যোচ্ছল মূর্ত্তি! এরা কি কেউ তাকে একবেলার জন্য দুমুঠো খেতে দিতে পারে না? ধীরেন্দ্রলাল জ্বালা-ধরা চোখে বাড়ীগুলোর সুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল।

—এই, কে এখানে? কি চাই তোমার? তার উস্কোখুস্কো চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা বাড়ীর দারোয়ান চীৎকার করে উঠল—এখানে কিছু সরাবার মতলবে এসেছো বুঝি?

ক্লান্ত করুণ গলায় ধীরেন্দ্রলাল চিঁ চিঁ করে বলল—এসব কথা বলো না বলছি। আমি—

—যাও ভাগো এখান থেকে—

অপমানের জ্বালায় ধীরেন্দ্রলালের চোখ ফেটে জল এল। ঢাকা কলোনীর কাছে এবড়ো-খেবড়ো খোয়া-ওঠা রাস্তাটার ওপরে বসে পড়ল। দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে ক্লান্ত একটা কুকুরের মত হাঁফাতে লাগল।

—এই, কি হয়েছে তোমার?

আঠারো-উনিশ বছরের এক ছোকরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করল তাকে।

—কিছু না ভাই। একটা চাকরীর খোঁজে এই নতুন মহকুমা সহরে এসেছিলাম। কিন্তু—

—লেখাপড়ার দৌড় কদ্দুর?

—নাইন পর্য্যন্ত। লেখাপড়া করার সময় পেলাম কোথায়। জেল খেটেই—

—বুঝেছি। আমারই মত অবস্থা আর কি—

—মানে?

—মানে স্রেফ ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়িয়েছেন। একটু থেমে ক্ষীণ আলোয় যেমন পুঁথি পড়ে, তেমনি করে ধীরেন্দ্রলালের উপোসী মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—সারাদিন খাওয়া হয় নি বুঝি?

কোন কথা বলল না ধীরেন্দ্রলাল। স্তিমিত চোখ দুটোর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঢাকা কলোনীর দিকে। অসহ্য একটা জ্বালা তার বুকের রক্তস্রোতে জ্বলছে ধিকি ধিকি।

—কি মশাই কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে?

—কি আর বলবো ভাই? পকেটে দুটো পয়সাও নেই—

—ওঃ বুঝেছি। আসুন আমার সঙ্গে—

—তোমার সঙ্গে কোথায় ?

—আরে চলেই আসুন না ! প্রেমে চোট খাওয়া হিরোর মত উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ?—ছোকরা মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা চুলগুলো পিছনের দিকে টেনে দিয়ে আবার বলল—চলুন, খাওয়ার ব্যবস্থা করছি—

—তোমার নাম কি ভাই ? কৃতজ্ঞতায় গাঢ় গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল—এত বড় বড় দালানের মালিক সব ঘেয়ো কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। আর তুমি—

—যারা তাড়িয়ে দিয়েছে, তারা স্থানীয় লোক। আড়াই বিঘে জুড়ে পেল্লাই সব বাড়ীর মালিক। নতুন লোক দেখলেই মনে করে রিফিউজি আর খেঁকিয়ে ওঠে—

—তোমার নামটা তো বললে না ? কোন জেলায় বাড়ী ছিল তোমাদের ?

—ও, আমার সম্বন্ধে খুব 'কিউরিওসিটি' হচ্ছে বুঝি ? চলতে চলতে সে ঘাড় বাঁকা করে ঘুরে দাঁড়াল। বলল—ঠিক আছে। বেশীক্ষণ 'সাসপেন্সে' রাখা ঠিক নয়। শুনুন—আমার নাম ন্যাদোন। যশোরে কালীগঙ্গা নদীর ধারে বোয়ালিয়া গ্রামে আমার বাড়ী ছিল। সেখানকার সব পাট চুকিয়ে দিয়ে এখানে এসেছি—

—তুমি কি কর ?

—কিচ্ছু না—তার হ্রস্ব দেহের তুলনায় দীর্ঘ হাত দুটো শূন্যে দুলিয়ে বলল—কনফারমড বেকার। দিদির পয়সায় খাই—ভাবছি কলকাতায় গিয়ে থিয়েটারে নামবো।

—থিয়েটারে ! বিস্মিত দৃষ্টি ফুটে উঠল ধীরেন্দ্রলালের চোখে।—ঐ চেহারায় থিয়েটারের এ্যাক্টার ?

নারকেলের দড়ির মত পাকানো ছিবড়ে চেহারা। হাড় বের করা গালের বাঁ দিকে মস্ত বড় একটা আঁচিল। ভ্রূ দুটো নাচিয়ে ন্যাদোন

বলল—কি দাদা? আমার এই চেহারায় ওসব চলবে না ভাবছেন তো? হুঁ—নাকের পাটা ফুলিয়ে হেসে বলল—আপনি তো জানেন না, 'আকাশ-কুসুম' নামে একটা সোশ্যাল বইতে কুচক্রী নায়েবের পার্ট যা করেছি। চোখের দৃষ্টি আর মুভমেণ্ট যা একখানা দিয়েছিলাম!—উত্তেজনায় জলজ্বল করছে ন্যাদোনের চোখদুটো। আকাশের দিকে একটা ঘুসি পাকিয়ে বলল—দিদি যতই গালমন্দ করুক! দেখবেন স্টেজে একটা কেরিয়ার আমি করবোই—

—আর কদ্দূরে তোমাদের বাড়ী ভাই?

—এই তো দাদা, এসে গেছি।

ঢাকা কলোনীর ভেতরে সরু একটা রাস্তার দুপাশে দরমার বেড়া আর চকচকে টিনের সারি সারি বাড়ী। কোনো বারান্দায় মাদুর পেতে কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয় দুলে দুলে পড়া মুখস্থ করছে ছেলে-মেয়েরা। কোথাও বৃদ্ধারা গোল হয়ে বসে মৃদু করুণ সুরে রামায়ণ পড়ছে। ছাতিম গাছের নীচে পেট্রোম্যাক্স ঝুলিয়ে যুবকরা নববর্ষের নাচ গানের মহড়া দিচ্ছে। সুখী সম্পন্ন জীবনের স্রোত যেন কলোনীর চারিদিকে খরধারায় বয়ে চলেছে। অবাক হয়ে গেল ধীরেন্দ্রলাল। মনেও হয় না, এরা পদ্মা মেঘনার ওপার থেকে স্বপ্নে ভরা, গানে মাখা সাত-পুরুষের বাস্তু ভিটে ছেড়ে, সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এই বরিন্দের মাঠে এসে আশ্রয় নিয়েছে! সব হারিয়ে এসেছে—কিন্তু নিয়ে এসেছে বিপুল প্রাণ শক্তি! একটা টিনের ঘরের সামনে দাঁড়ালো ন্যাদোন। ঝাঁপের জানালার গায়ে মৃদু টোকা দিয়ে ডাকল—দিদি—ও দিদি—তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস না কি?

—কে, ন্যাদোন, এতক্ষণে বাড়ী ফেরার সময় হলো তোর? ভাঙ্গা কাঁসরের মত তীব্র একটা গলার আওয়াজে শিউরে উঠল সন্ধ্যার বাতাস।

—রিহার্সেল দিতে গিয়েছিলাম দিদি। ওঠ রাগ করিস না।—এই পার্টটায় কিছু পাবো। একে বারে বিনাপয়সায় নয়—

—রাখ রাখ। প্রত্যেকবারই তো তোদের থিয়েটার ক্লাব ঐ কথা বলে।

অকম্মা ছোঁড়াগুলোর বিড়ি খাওয়ার পয়সা জোটে না। তোকে দেবে পয়সা— !

—ঝগড়া পরে করিস দিদি। ওঠ—সঙ্গে একজন অতিথি নিয়ে এসেছি।

—কাকে আবার নিয়ে এলি ? নিজে পায় না খেতে আবার শঙ্করাকে ডাকে—অসহ্য একটা জ্বালায় জ্বলে পুড়ে চীৎকার করে উঠল পদ্ম। তক্তা-পোষের মচ মচ শব্দ হলো। কেরসিনের ডিবেটা জ্বালিয়ে বাইরে এল পদ্ম।

—সারাদিন না খেয়ে আছেন দিদি—ইনি—একটু থেমে ন্যাদোন বলল—দেশের কাজ করতেন এককালে। জেলেও গিয়েছিলেন। এখন খাওয়ার পয়সা জোটে না।

—ঘরে তো কিছু নেই রে। শুধু তোর ভাত ঢাকা দেওয়া আছে। দোকানও তো বন্ধ—

—সেই ভাতই ওঁকে দে দিদি। আমি না হয় চিড়ে মুড়ি খেয়ে থাকবো—

উঠোনের পাতলা অন্ধকারে একটা ঘনকালো পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে ধীরেন্দ্রলাল। সেই গাঢ় অন্ধকারটাকেই যেন উদ্দেশ্য করে ন্যাদোন বলল—আসুন দাদা। ঘাড়ের ঐ ব্যাগটা উঠোনের বাঁশে ঝুলিয়ে রাখুন। হাতমুখ দিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় বসুন—নিজেই পিঁড়ি পেতে দিয়ে তাকে গ্লাসে ভরে জল দিল ন্যাদোন। থালাভর্ত্তি ভাত। এককোণে ভাতের গর্ত্তের মধ্যে সামান্য একটু মটরের ডাল আর পেঁপের তরকারীর ভেতরে ক্ষুধার্ত ধীরেন্দ্রলালের আঙলগুলো ছুটতে লাগল পাগলের মত। চোখের নিমেষে সাপ্টেসুপ্টে খেয়ে থালা খালি করে ফেলল। ঢকঢকিয়ে জল খেল।

—আপনার নিশ্চয়ই পেট ভরল না! উঠোনে দাঁড়িয়ে লজ্জিত গলায় বলল পদ্ম—ঘরে কিছুই নেই—

—না, না পেট খুব ভরেছে। আপনাদের কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে—বলেই তার দৃষ্টিটা তুলে ধরল পদ্মের মুখের দিকে। নিকষ কালো গায়ের রঙ। শীর্ণ দীঘল দেহের কোথাও যৌবনের দীপ্তি নেই। বড় বড় দুটো চোখে স্তিমিত দৃষ্টি। বিষন্ন গাম্ভীর্য্যে ছেয়ে আছে মুখখানা।

তেল নুন মাখা চিঁড়ে গালে ভরে দিয়ে বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল হ্যাদোন— রাত্তিরে কোথায় যাবেন দাদা? থেকে যান না আমার সঙ্গে বারান্দায়। গল্পোগুজব করা যাবে। তুই কি বলিস দিদি?

ঘরের ভেতর থেকে নির্বিকার গলায় বলল পদ্ম—উনি ইচ্ছে করলে, থাকতে পারেন—

মাঝরাত্তের প্রহর পার হয়ে যায়। বাড়ীর পাশে তেঁতুলগাছের ডালে খড়কুটোর বাসার ভেতর থেকে কোন রাত্রিচর পাখী ডেকে ওঠে। নিথর স্তব্ধতায় তলিয়ে গেছে ঢাকা কলোনী। হঠাৎ একটা বুকচাপা কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল ধীরেন্দ্রলালের। তার বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠল। পাশে অঘোরে ঘুমচ্ছে হ্যাদোন। ধীরেন্দ্রলাল কান পেতে শুনল কান্নাটা আসছে পদ্মের ঘর থেকে! হ্যাদোনের দিদি কাঁদছে কেন? নিঃশব্দে সে উঠে দাঁড়াল। এককালের দেশকর্মীর বুকের রক্তে পরোপকারের দুর্বার স্পৃহা জেগে উঠল। শুধু তাই নয়। তাকে পরম যত্নে খাইয়েছে এই অজানা মেয়েটি। পুরনো কোন দুঃখস্মৃতিই কি তার বুকের ভেতরে তুলেছে কান্নার ছলো ছলো ঢেউ, না কোন অসুখের যন্ত্রনায় ও কাতর হয়ে পড়েছে! তীব্র কৌতূহলে মনটা জ্বলে উঠল ধীরেন্দ্রলালের। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল—শুনছেন—শুনছেন, কি হযেছে আপনার?

মুহূর্তে স্তব্ধ হযে গেল চাপা কান্নার শব্দ। আবার গাঢ় নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারিদিক। ঝিঁঝিঁদের ঐক্যতান যেন ধীরেন্দ্রলালের মাথার ভেতরে বাজছে। দুহাতের বদ্ধ মুষ্টি তীব্র অস্থিরতায় থরথর করে কাঁপছে।—শুনছেন? আবার উত্তেজিত গলায় বলল ধীরেন্দ্রলাল। কিন্তু কোন উত্তর এল না। আকাশে অসংখ্য অপলক চোখের মত রাশি রাশি তারার দিকে সে অর্থহীন, শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। শোঁ শোঁ করা রাত্রির বাতাস অব্যক্ত একটা গোঙানির মত অদূরে শূন্য মাঠের বুকে আর্তনাদ করে চলল একটানা।

—হ্যাদোন—ও হ্যাদোন, গভীর ঘুমে অচেতন হ্যাদোনকে ধাক্কা দিল ধীরেন্দ্রলাল।

ন্যাদোন ধড়মড় করে উঠে বসেই বলল—কি হয়েছে? ডাকছেন কেন?

—তোমার দিদি কাঁদছেন কেন?

—ওঃ এইজন্যে আমার ঘুম ভাঙ্গালেন আপনি—উগ্র বিরক্তি ঝরে পড়ল ন্যাদোনের গলায়।

—নাঃ সব মাটি করে দিলেন দেখছি। দেড়শো নম্বরের পার্ট টেনে নিয়ে যেতে হবে কাল আমাকে। পাবলিক স্টেজে ভিলেনের পার্ট—শেষের দিকের কথাগুলো ঘুমের ঢেউয়ে তলিয়ে গেল।

উৎসুক হয়ে ধীরেন্দ্রলাল আবার বলল—কাঁদছে কেন তোমার দিদি বললে না?

গাঢ় ঘুমে এলিয়ে পড়া ন্যাদোনের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পকেট থেকে একটা আধপোড়া বিড়ির টুকরো বের করে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল ধীরেন্দ্রলাল।

॥ তিন ॥

ভোরের রেখা জাগল পুবের আকাশে। ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল ঢাকা কলোনী। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পদ্ম দেখল ধীরেন্দ্রলাল নেই। উঠোনে পায়চারী করছে ন্যাদোন। আর যেন অদৃশ্য কোন অভিনেতাকে উদ্দেশ্য করে পার্ট মুখস্থ বলছে। পদ্ম বলল,—ভদ্রলোক কোথায় গেল রে?

—কি জানি? আমিও সকালে উঠে তাকে দেখিনি।

আবার মত্ত আবেগে পার্ট বলে চলল ন্যাদোন। নিঃশব্দ পায়ে তার কাছে এসে বলল পদ্ম—ভদ্রলোকের ছেলে রে! কাল বেচারা কিছুই খেতে পারে নি। যা ডেকে নিয়ে আয়—

—যত পরের লোকের জন্য তোর দরদ দিদি। আমি তিনদিন আধ পেটা খেয়ে থাকলেও তো বলিস না তুই—ন্যাদোন তোর মুখটা শুকনো—

পদ্মের চোখে স্নিগ্ধ হাসির আভা জাগল। নরম গলায় বলল—তুই যে আমার মায়ের পেটের ভাই রে! তোর মুখ শুকনো বলি না, কিন্তু সত্যিই, শুকনো দেখলে আমার বুকটা ফেটে যায়।

পদ্মের মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যাদোনের বোকা-বোকা চোখের দৃষ্টিটা স্থির হয়ে গেল। বলল,—দেখি যাই, যদি খুঁজে পাই, নিয়ে আসবো—

সকালের সূর্য সাবালক হয়ে উঠেছে। ঢাকা কলোনীর পুবদিকে খাদিমপুরের প্রান্তরে অসুরমুণ্ডের মত ইতস্তত ছড়ানো টিবিগুলোর পাশ কাটিয়ে চলেছে ধীরেন্দ্রলাল। দূরে দুলিচাঁদ শেঠিয়ার হনুমান রাইস মিলের চিমনী থেকে কালো ধোঁয়া নির্মেঘ আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিল গেটের সামনে দাঁড়াতেই বন্দুকধারী দারোয়ান হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল—কেয়া? কাম মাংতা হ্যায়! মালিক কা কুঠিমে চলা যাও।

—কোনদিকে তোমার মালিকের বাসা?

—তামাম মুলুক কা আদমী ওই কুঠি চেনে। আপলোক নেহি পছন্‌তে হেঁ? হা রামজী!

—কপালে একটা চাপড় দিল দারোয়ান। তার মালিকের কুঠি না জেনে যেন কোন গর্হিত অপরাধ করেছে ধীরেন্দ্রলাল। বিরক্ত হয়ে দারোয়ান আবার বলল—যান, বাজারকা পুরব ধারমে একটা চার মহলা লাল দালান হ্যায়—ওইঠো হ্যায় হামারা মালিককা কোঠি, চলিয়ে যান।

—বহুত আচ্ছা ভাই।

বাজারের পুবদিকে বিশাল একটা চারতলা দালানের সামনে এসে দাঁড়াল ধীরেন্দ্রলাল। গেটের ভেতরে উঠোনের এক কোণে হাঁটুপর্যন্ত ঠেঁটি কাপড় পরা ফরসা মধ্যবয়সী লোক খাটিয়ায় বসে তামাক টানছে।

—দুলিচাঁদ বাবুর সঙ্গে একটু দেখা হতে পারে? বলল ধীরেন্দ্রলাল।

হুঁকো থেকে মুখটা সরিয়ে লোকটা বলল,—দুলিচাঁদকা পাস কোন কাম হ্যায়?

—তাঁর মিলে যদি একটা চাকরি হয়।

—হাম ঢুলিচাঁদ। কাম তো খালি নেহি হ্যায় বাবুজী। কাঁহা ঘর আপকা ?

—ঘর বাড়ী সব পাকিস্তানে পড়েছে। আপনি চাকরী না দিলে না খেয়ে মরতে হবে। ধীরেন্দ্রলালের চোখের দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ধীরেন্দ্রলালের মুখের দিকে তুলে ধরে ঢুলিচাঁদ বলল—আপলোক তো খদ্দর পরা লিখাপড়ি জানা খালিফ আদমী। আপনাকে নোকরী মে লিলেই ইউনান কোরবেন, স্ট্রাইক করবেন বহুত ঝুট ঝামেলা বাধাবেন—

—না বিশ্বাস করুন। ওসব কিছু করবো না।

—সব কোই ওরকম বলে বাবু। লেকিন একবার নোকরীতে এলেই আপনা মুর্ত্তি ধরে। দেখিয়ে বাবুজী, একঠো সাচ বাত বলি, লিখাপড়ি জানা আদমীকো দাবিয়ে রাখা কঠিন। ইস লিয়ে হামারা মিলমে খাঞ্জাঞ্চিবাবু বাদে আর একঠোও লিখাপড়া জানা আদমি নেহি। হিন্দুস্তানী আর সাঁওতাল ওঁরাও কুলিরা মাসকাবারে তলব মিলনেসে হাঁড়িয়া খায়। রোজ মাদল বাজিয়ে দেহাতী গানা গায়, না হলে, ঝগড়া করে। ওদের বেকুফী হামাদের মত মিল-মালিকদের কাছে মহাদেবকা আশীর্ব্বাদ বাবুজী !

—কথা দিচ্ছি, কোন দিন কুলী ব্যারাকে যাবো না, ওদের সঙ্গে মিশবো না।

—না বাবুজী। হাত জোড করে বলল ঢুলিচাঁদ, আপ দোসরা জায়গা দেখিয়ে।

আবার প্রখর রোদে জ্বলে যাওয়া অন্তহীন পথ। অনাহারের সেই দুঃসহ আশঙ্কাটা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। খাড়ির ব্রীজের ওপরে সে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। তার ইচ্ছে করতে লাগল, এই দুপুরের রোদেই সে কোথাও ছুটে বেরিয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় পৃথিবীটাকে। একটা অসহ্য অথচ অবাস্তব ধ্বংস-কল্পনায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত নিজের ভেতরে ধূমায়িত হতে লাগল ধীরেন্দ্রলাল। ঐ তো সাবট্রেজারী আর থানার সামনে দশ হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে এসে দৃপ্ত একটা সম্রাটের মত সে দাঁড়িয়েছিল। এই মহকুমায় বিয়াল্লিশের আন্দোলন

তার নেতৃত্বেই সার্থক হয়েছিল। জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করে সে দেওয়ানী-ফৌজদারী আদালত, পোষ্ট-অফিসে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে উত্তেজিত করেছিল জনতাকে। দেওয়ানী আদালতের সিন্দুক ভেঙ্গে রাশি রাশি কাঁচা টাকা জনতার জমাট ভিড়ের ভেতরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠেছিল সকলে। জয়! ধীরেন্দ্রলালের জয়! আজ তাকে মাত্র পঁচিশ টাকার একটা চাকরীর জন্য তাড়া খাওয়া জন্তর মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হচ্ছে! তার মুখের শুকনো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা আর অবসাদ যেন ঘর্মাক্ত হয়ে ফুটে ওঠে। দুপুরের রোদ চারদিকে আগুন ছড়াচ্ছে। ধূলোর গন্ধ বয়ে গরম বাতাস এসে তার মুখচোখে ঝট্‌কা মারে। টলতে টলতে সে উঠে দাঁড়ালো। বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, একদিন এই সহরের সকলের মনে তার নামটা অগ্নিলেখার মত জ্বল জ্বল করতো। আজ বিস্মৃতির অতলে কোন অন্ধকারে রাজ্যে সে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য মানুষের মন! নিজের স্বার্থের কেন্দ্রবিন্দুতে সবাই অহরহ তাঁতের মাকুর মত ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্ত্তমানের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু তারা ভাবতে পারে না, ভাবতে জানে না। অতীত, ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে হলে যে সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন তা এখনকার লোকের নেই।

ধীরেন দা! চমকে পিছন পিছন ফিরে তাকাল ধীরেন্দ্রলাল। কি রে খুসীলাল—তুই! অবাক হয়ে গেল ধীরেন্দ্রলাল। হিন্দুস্থানী ছেলে খুসীলাল। বিয়াল্লিশ সালে জেলে গিয়েছিল। তখনও সে বাদাম ভাজা বিক্রী করে সংসার চালাতো। আজও সে পুরনো দিনের মতই মাথায় বাদামভাজা আর ডালমুটের ঝাঁকা নিয়ে টিফিনের সময় স্কুলের ছেলেদের কাছে বিক্রি করতে চলেছে। ঝাঁকাটা রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে ধীরেন্দ্রলালের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল খুসীলাল, বলল—কি রোগা হয়ে গিয়েছো ধীরেন দা। কি করছো আজকাল?

—কিছুই না ভাই। চাকরীর চেষ্টা করছি।

—চাকরী পাবে না ধীরেন দা, টুকটাক কোন ব্যবসা-ট্যাবসা কর। আমি তো বাদামভাজা বিক্রি করেই সংসার চালাইছি।

—বেশ আছিস তাহলে তুই?

—হ্যাঁ ধীরেনদা। রামজীর কিরপায় বেশ ভালই আছি। ঢং ঢং করে স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ব্যস্ত হয়ে খুসীলাল বলল—টিফিন হয়ে গেল ধীরেনদা। তুমি সাঁজের সময় আমার ঘরে এসো। আমি যাই কেমন?

দুপুরের রোদ জ্বলা নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখল ধীরেন্দ্রলাল, একটা সুখী পরিতৃপ্ত মূর্ত্তির মত খুসীলালের শক্ত মজবুত দেহটা মাথায় বাদাম ভাজার ঝাঁকা নিয়ে চলেছে। কত অল্পে সন্তুষ্ট এরা! চোখে যাদের বড় স্বপ্ন থাকে ছোট সুখ ছোট স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে যারা মহৎ ও উদার কোন উপলব্ধির জন্য কষ্ট বরণ করে তারা দুঃখই পায়। আচমকা একটা ঝড়ের মত এই শহরে বিয়াল্লিশের আন্দোলন এসেছিল। সেই অস্থির উত্তেজিত উন্মাদনাময় আন্দোলনের বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খুসীলাল। দেশের কাজের জন্য কোন প্রেরণা কি কোন রকমের মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না। তাই রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত সেই দিনগুলো পার হয়ে গেলে, সে আবার নিজের ভেতরে শামুকের মত মুখ গুটিয়ে নিয়ে নিজেদের জাত ব্যবসায় নেমেছে। কি সে যে স্বাধীন হওয়ার পরে নতুন একটা উন্নততর সমাজব্যবস্থা, আর্থিক-সাম্যতা আশা করেছিল।

ন্যাদোন আর ফটা নিঃশব্দ পায়ে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। ন্যাদোন বলল,—কি দাদা খাড়ির পাড়ের দিকে তাকিয়ে অমন করে কি ভাবছেন?

—আরে তুমি আবার কখন এলে?

—চাকরী-বাকরীর কোনো আশা পেলেন? ন্যাদোন বলল।

—না ভাই। বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ধীরেন্দ্রলাল—দেশে একজনও মানুষ নেই। সহানুভূতি মায়া মমতা এসব যেন মানুষের মন থেকে কর্পূরের মত উবে গেছে।

—বুঝলে দাদা, উচ্ছ্বসিত হয়ে ন্যাদোন বলল, আকাশ কুসুম বইতে হিরো

শঙ্কর অবিকল আপনার এই কথা বলেছে। আশ্চর্য ক্যারেক্টার মাইরী শঙ্করের।

—থাম, থাম, কথায় কথায় তোর কেবল থিয়েটারের কথা। বিরক্ত হয়ে বলল ফটা।

ঘোড়ার ছবি ছাপা, ছেঁড়া বুশসার্টের কলারটা টেনে ধরে একটা হিংস্র নিশ্বাস চাপতে চাপতে চেঁচিয়ে উঠল ন্যাদোন,—তুই কি করতে বলিস?

—কেন তোকে বলিনি, তোদের বিড়ির দোকানটা আবার চালু কর। বঙ্গীর রাস্তার মোড়ে বিড়ির দোকান ভাল চলবে।

—তোর বুদ্ধিতে ঐ করি আর আমার আর্ট, এ্যাক্‌টিং, থিয়েটার মাথায় উঠুক। ছোঃ—

—দেখিস ঐ থিয়েটারের জন্যেই ভিটেতে একদিন ঘুঘু চরবে।—থ্যাবড়া নাকটা কুঁচকে বলল ফটা।

হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, ধীরেন্দ্রলাল বলল—আমি তাহলে যাই ন্যাদোন। এ শহরে তো কিছুই হলো না—

—সে কী! কোথায় যাবেন? সেই সকাল থেকে আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি যে—

—আমাকে! কেন?

—দিদি আপনাকে ডেকেছে। কাল রাতে শুধু ভাত আর পেঁপের তরকারী দিয়ে কষ্ট করে খেয়েছেন। দিদি খুব লজ্জিত হয়েছে—

—না, না—বেশ তো খেয়েছি, অনেক—

—আশ্চর্য! আপনি ঠিক আকাশ কুসুমের হিরো শঙ্করের মত। শালা এত কষ্ট পাচ্ছে, তবু কারো কাছে হাতটি পাতবে না।—একটু থেমে ফটাকে বলল—যা তো রে ফটা, দাদাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যা। আমি একবার নাট্য-সমিতিতে যাচ্ছি। আজ আমার 'প্লে' আছে—

॥ চার ॥

সন্ধ্যার ছায়া-ছায়া অন্ধকার নেমে আসছে ঢাকা কলোনীর চারিদিকে। বারান্দার এক কোণে একটা বাজপড়া ঠুঁটো তালগাছের মত বসে থাকা ধীরেন্দ্রলালের মুর্তির দিকে তাকিয়ে সসঙ্কোচে পদ্ম বলল—চাকরী তো কোথাও পেলেন না। কোথায় যাবেন এখন ?

আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল না পদ্ম, ধীরেন্দ্রলালের চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটল। ম্লান গলায় বলল—দেখি কাল একবার গঙ্গারামপুরের দিকে যাবো—

—গঙ্গারামপুরে ? কেন ?

—সেখানকার মোটরের ড্রাইভার আমার পুরনো বন্ধু, আমাকে ক্লীনারের চাকরী দিতে চেয়েছিল। সেই কাজই নেব ভাবছি।

—আমার একটা লোকের বড় প্রযোজন ছিল—পদ্ম বলল—আপনার যদি অসুবিধে না হয—

—কি রকম লোক প্রয়োজন আপনার ? বলুন, আমাকে দিয়ে যদি কোন কাজ হয আপনার—উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল ধীরেন্দ্রলাল।

—বঙ্গীর রাস্তার মোড়ে একটা বিড়ির দোকান করে দিয়েছিলাম হ্যাদোনকে। দেখছেন তো ওর কি রকম থিয়েটারের নেশা। তিনমাসে বিড়ির পাতার কারবারী মহাজনের কাছে ধার-দেনা করে দোকান ফেল করিয়ে দিল।

—আপনি যদি বলেন, তাহলে দোকান আবার চালু করা যেতে পারে। আমি দেখাশোনা করতে পারি অবশ্যি এ কারবারের কিছুই জানি না, তবে চেষ্টা করলে শিখ নিতে দেরি হবে না।

—আপনি রাজী ? পদ্মের স্তিমিত দুটো চোখ সন্ধ্যা প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। বলল—দেখুন, আপনাকে প্রথমে দেখেই মনে হয়েছিল, এ কাজ আপনাকে দিয়েই সবচেয়ে ভাল হবে—

—কেন বলুন তো? আমার চোখেমুখে কি বেশ পটু বিড়ি ব্যবসায়ীর কোন লক্ষণ আছে?

—না, না, জেলখাটা, স্বদেশী লোক খুব খাঁটি মানুষ হয়। আমার বাবা বলতেন, সৎ এবং নির্লোভ না হলে কি কেউ দেশের জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করতে পারে?—শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি।

—দোকান যে চালু করবেন, দোকানে খাটবে কে? বিড়ি বাঁধবে কে? সে সব কিছু ভেবেছেন?

—ন্যাদোনের দুটি বন্ধু আছে, ফটা আর লালু। ওরা আমার নিজের ভাইয়ের মত। ওদের একজন বিড়ি বাঁধবে আর একজন বিড়ি সেঁকবে, বাণ্ডিল বাঁধবে। আমার পুরানো দোকানে ওরা তাই করতো—

—দোকানের কি নাম ছিল?

পদ্মের কালো মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। কিন্তু স্নিগ্ধ একটা হাসির আভা জেগে উঠল তার চোখে। মুখ নীচু করে বলল—লালু, ফটারা আমাকে খুব ভালবাসে কি না, তাই আমার নামেই বিড়ির—পদ্ম বিডির দোকান!

—উঁহু, উঁহু, ও নাম চলবে না। কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে চিন্তা করল ধীরেন্দ্রলাল। বারান্দার বাঁশের খুঁটির ভেতর থেকে একটা পোকা চিঁ চিঁ করে ডেকে উঠল। মৃদু হাওয়ার সোহাগে মর্মরিত হয়ে উঠল উঠোনের এক কোণে মিছরীভোগ আমগাছের পাতা। হঠাৎ ধক করে জ্বলে উঠল ধীরেন্দ্রলালের চোখ দুটো। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—পেয়েছি। পেয়েছি!

—কি নাম?

—এর নাম হবে জিন্দাবাদ বিড়ি। চাপা যন্ত্রনায় কঠিন হয়ে উঠল ধীরেন্দ্রলালের মুখের রেখাগুলো—দুমুঠো ভাতের জন্য আমরা উদয়াস্ত খেটে খাওয়া মানুষ। কোনো মূলধন নেই আমাদের, সহায় নেই, সম্বল নেই। আছে শুধু দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে দুহাতে লড়াই করার মত একটা অনমনীয় দৃঢ় মন—

—বেশ সুন্দর নাম হয়েছে। চমৎকার নাম! আবেশ জড়ানো গলায় বলল পদ্ম—চকচকে সাদা সাইন বোর্ডের ওপরে মোটা মোটা অক্ষরে লাল

কালি দিয়ে লিখতে হবে জিন্দাবাদ বিড়ি। সোনার স্বপ্ন নেমে আসে তার চোখে। বলে,—দেখবেন, নামের চমকেই বিক্রী হবে খুব। কলকাতা থেকে বিড়ির মশলা আনাবো। মেসিনে কাটা পাতাও—

—আপনি আরও একটা কাজ করতে পারেন,—ধীরেন্দ্রলাল বলল—বস্তীর রাস্তার ওপরেই দেশী মদের দোকান আছে, লক্ষ্য করেছি। আপনি যদি বিড়ির দোকানের পাশেই তোলা উনুনে পেঁয়াজী ফুলুরির দোকান দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু—

—ঠিক বলেছেন—তর্জনী নাচিয়ে চোখটা বিস্ফারিত করে বলল পদ্ম—আপনার কিন্তু বেশ ব্যবসা বুদ্ধি আছে। আমি নিজেই পেঁয়াজী ভাজব। প্রচুর বিক্রী হবে—

—এত তো ভাবছেন? মূলধন কোথায় আপনার?

—আছে, আমার বিয়ের সময়কার ছয় ভরি সোনার আড়াই পেঁচী আছে, মা দিয়েছিল—

—বিয়ে! বিয়ে হয়েছিল আপনার? বিস্মিত দৃষ্টিতে পদ্মের ডুরে নীল শাড়ীপরা শীর্ণ মূর্ত্তি আর বিরল চুলের ভেতরে রুক্ষ শাদা সিঁথির দিকে তাকাল ধীরেন্দ্রলাল। আবার মৃদু অস্ফুট গলায় বলল—আপনি তাহলে বিধবা!

নিঃশব্দে ঘরের ভেতরে চলে গেল পদ্ম। যেন কোন ভয়াবহ, দুঃসহ অতীত দিনের স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভেতরে। শ্বাসরোধী অন্ধকারে ভরা ঘরটার দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল ধীরেন্দ্রলাল। হঠাৎ বিদ্যুতের মত চমকে উঠল তার চেতনা। তার কানের কাছে বেজে উঠল নিশিরাতের নিরালায়, নির্জন ঘরে ওর সেই বুকফাটা চাপা কান্নার আওয়াজ। তীব্র একটা অস্বস্তিতে যেন তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। বাইরে রাস্তার ওপরে চটুল হিন্দী গানের সুর ভেসে উঠল—

দিলসে মিলাকে দিল
পেয়ার কি জীয়ে···

হ্যাদোন বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়াল।

॥ পাঁচ ॥

কয়েকদিন পর। পদ্মের চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফটা আর লালু বলল—দিদি তোমার নতুন দোকানে কাজ পাবো তো ?

—নিশ্চয়ই। তোরা ছাড়া আমার দোকানে আর কে চাকরি করবে বল ? পদ্ম বলল,—তোদের মত বিশ্বাসী লোক পাবো কোথায় ?

ফটা বলল—দিদি আবার তাহলে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাবো ?

কাঁচা মাটির রাস্তার মত এবড়ো-খেবড়ো মুখখানায় হাসি ছড়িয়ে লালু বলল—দিদি এবার কিন্তু দোকানটা ভাল করে সাজাবো। মোটর স্ট্যাণ্ডের কাছে বগুড়া কলোনীর সুরেন যেমন কাঁচের আয়না বসিয়ে ছবি-টবি দিয়ে দোকান সাজিয়েছে ঠিক ঐরকম করে আমাদের জিন্দাবাদ বিড়ির দোকান সাজাবো—

—নিশ্চয়ই সাজাবি। বাজারের আর সব দোকানের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া চাই কিন্তু —বলল পদ্ম।

—সিনেমা তারকাদের ছবি কিন্তু টাঙানো চলবে না—বারান্দার এক কোণ থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলো ধীরেন্দ্রলাল।—আমাদের দোকানের নাম 'জিন্দাবাদ বিড়ি বিপনী'। খেয়াল থাকে যেন—

—ধীরেনবাবুই দোকানের তদারক করবেন।—বলল পদ্ম—উনি যে ভাবে বলবেন, দোকান সেইভাবে সাজাবি।

অন্ধকার নেমে এল লালুর মুখে। অসহায় করুণ গলায় বলল,—ধীরেন দা তো বড় বড় নেতাদের ছবি টাঙিয়ে দেবেন।

ধীরেন্দ্রলালের দুচোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল, সে বলল—দোকানের যে রকম নাম, তার সঙ্গে মানিয়ে ছবি টাঙাতে হবে তো! জিন্দাবাদ কথাটার মানে কি ?

—তাহলে কার ছবি থাকবে ? বলল ফটা।

ধীরেন্দ্রলাল চোখদুটো দূরে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—নেতাজীর একটা ছবি থাকবে। তাঁর সেই ছবিটা, ভারতের পূর্বপ্রান্তরে পাহাড়ী উঁচু নীচু পথের

ওপরে তিনি বিশাল একটা লাল ঘোড়ার ওপরে বসে আছেন। তাঁর প্রদীপ্ত দুটো চোখের দৃষ্টি সুদূর দিল্লীর দিকে। হাতে ঝকমক করছে ধারালো তলোয়ার।—ধীরেন্দ্রলালের মুখের দুপাশে থুথু জমে ওঠে। তীব্র আবেগে থর থর করে কেঁপে ওঠে তার শীর্ণ দেহ।

—বেশ তাই হবে। নেতাজীর ছবিই থাকবে, বলল—ফটা।

—লালু বলল,—কবে দোকান চালু হবে দিদি ?

—আসছে বিস্ম্যৎবার, লক্ষ্মীবার আছে। সেই দিনই দোকান খুলবো। বলল পদ্ম।

—ন্যাদোন কোথায় ? ফটা প্রশ্ন করে।

—কি জানি ? বিরক্তিতে মুখখানা বেঁকিয়ে পদ্ম বলল—ও আবার কবে এ সময়ে বাড়ীতে থাকে ?

—আমরা এখন কি করব ? বলল লালু।

—তোমাদের অনেক কাজ আছে। ধীরেন্দ্রলাল বিজ্ঞভাবে ব্যবসায়ের কথা কইতে শুরু করল—তোমাদের পুরণো দোকানটাকেই ঘসে মেজে চকচকে করে তুলতে হবে। টিনের দেয়ালে কালো আলকাতরা দিয়ে রঙ করতে হবে। তোমরা যাও পুরণো দোকানে।

—আর আপনি ?

—আমি যাচ্ছি সাইন-বোর্ড লেখাতে।

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ধীরেন্দ্রলাল।

সুতীব্র প্রেরণায় ফটার ধূসর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। থেমে থেমে স্পষ্ট গলায় বলল,—দেখো দিদি তোমার দোকানের বিড়ির কাটতি হবে খুব—

—কেন বল তো ?

—ধীরেন দা যা পাবলিসিটি দিচ্ছে এখুনি। ওঁর বক্তৃতার চোটেই দেখবে বিড়ি একেবারে হু হু করে বিক্রি হবে—লালু ঘাড় হেলিয়ে নিশ্চিতির ভঙ্গীতে বলল।

বেলা বাড়ে। দুপুরের রোদে খাদিমপুরের বিশাল প্রান্তর জ্বলে যাচ্ছে।

ঢাকা কলোনীর বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েরা কেউ কাগজের ঠোঙা তৈরী করছে, কেউ মণিমেলায় বিক্রীর জন্য লেবুর আচার, আমের মোরব্বা, উঠোনে রোদে শুকোতে দিয়েছে। আর প্রৌঢ়ারা ঢাকা কলোনী আর বগুড়া কলোনীর মাঝখানে একটা ঝাঁকড়া বেলগাছের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে বসে জটলা করছে। বগুড়া কলোনীর স্থরেনের মা কুসুম বলল হেমাঙ্গিনীকে—দিদি, তোমার ছেলে লালু তো পদ্মের বিড়ির দোকানে আবার চাকরী পেল—

—অমন চাকরীর মুখে আগুন! বিষাক্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল লালুর মা—এত করে ছোঁড়াটাকে বললাম, বাজারের শ্রীহরির সাইকেলের দোকানের চাকরীটা নে। তা না, কি সুখে যে ঐ মাগীর কাছে—

—পদ্ম তো একটা লোকও জুটিয়েছে, দেখছো দিদি। জেলখাটা স্বদেশী লোক—

হেমাঙ্গিনীর গর্তে ঢোকা চোখ দুটো সাপের জিভের মত চিকচিক করে উঠল। মিশি দেওয়া কালো দাঁতগুলো বের করে ঘেন্ডিয়ে হেসে বলল,—ওসব জেলখাটা লোকটোক রেখে দে। বল জোয়ান ব্যাটাছেলে একটা জুটিয়েছে। ওর স্বামী ওকে নেয় নি। তাই বলে তো আর ও উপসী হয়ে জীবনভোর থাকতে পারে না।

—সত্যি, কী বা ওর বয়েস—বলে কুসুম—আমাদের কলোনীতে থাকে ওদের গাঁয়ের হরির মা, বলছিল, ওর কোন দোষ নেই। ওর বিধবা মা-টা ছিল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরাও শুনেছি—ছোট ছোট চোখদুটো বিস্ফারিত ক'রে, হাত নেড়ে চাপা ফিস ফিস গলায় বলল হেমাঙ্গিনী,—ওর বিধবা মার একটা ছেলে হয়েছিল। ঐ তো ওই বাউণ্ডুলে ছোঁড়াটা হ্যাদোন—

—ও মা! বলো কী?—গালে হাত দিয়ে বিস্মিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল কুসুম।

পদ্ম তার শ্বাসরোধী অন্ধকার ঘরে একটা কঠিন সঙ্কল্পের মূর্তির মত

পায়চারী করছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভেবে ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে তক্তাপোষের নীচ থেকে রঙচটা টিনের ট্রাঙ্কটা খুলে ফেলল। তার বিয়ের সময়কার তিন চারটে রঙিন সিল্কের শাড়ীর নীচে খবরের কাগজের তলায় একটা বেগুনী কাগজের মোড়ক টেনে নিয়ে খুলতেই তার চোখের তারা দুটো ছটফট করে উঠল। ঘরের পাতলা অন্ধকারে একজোড়া সোনার আড়াই পেঁচী ঝকমকিয়ে উঠল। চকচকে আড়াই পেঁচী জোড়ার দিকে তীব্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এগারো বছর আগের আলো ঝলমলে এক উৎসব রাত্রির স্মৃতি তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল। মা দিয়েছিল এই গয়না। এই গয়না পরে তার মেয়ে বরের ঘর করবে! সে দিন সে পনের বছরের এক বেণী দোলানো কিশোরী। তার ডাগর চোখ দুটোও অন্তহীন স্বপ্নের উল্লাসে বিভোর হয়ে উঠেছিল। তিনশো পাওয়ারের পেট্রোম্যাক্সের জোরালো আলোয় তার মধুর লজ্জার আভায় স্নিগ্ধ চোখদুটোর সম্মুখে রাজপুত্রের মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক তরুণ যুবক। পশুপতি। দুচোখে তীব্র আগ্রহের দৃষ্টি ফুটিয়ে তার শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আঁকা মুখের দিকে সে তাকিয়ে ছিল। সেদিন তার সুডৌল মুখে, পুরন্ত গালদুটোয়, মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ কমনীয়তার আভা ছিল। পশুপতির মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। পদ্মের মনের ভেতরে স্বামীর আদর ভালোবাসায় টলোমলো কয়েকটি বিপুল আনন্দোচ্ছল রাত্রির স্মৃতিরা মিছিল করে চলল। পশুপতির বুকের ওপরে মাথা রেখে একদিন সে বলেছিল—তুমি আমাকে এমনি করে চিরকাল ভালবাসবে?

—নিশ্চয়ই। কেন বাসবো না পদ্ম?

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল শিশুর মত সেই সরল মানুষটি। কয়েকটা দিন, কয়েকটা মাস, যেন নীল আকাশে শরতের সাদা মেঘের মত খুসীর উচ্ছ্বাসে ভেসে ভেসে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সে জানতো না। আভাস পর্যন্ত পায় নি. যে তার সুখের জীবনের বিবরে একটা কুগ্রহ অভিশাপের বিষ ঢালবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, তাদেরই পাড়ার নিশি কবিরাজের ছেলে নিবারণ।

পদ্মর যৌবনের লাবণ্য আফিমের ফুলের মত একটা মধুর নেশা ছড়িয়ে দিয়েছিল নিবারণের চেতনায়। তার চোখে আদিম রক্ত-তরঙ্গের ভাষা দুলে উঠেছিল। কিন্তু—

কিন্তু পনের বছরের কুমারী পদ্মের বুকের ভেতর ফুঁসে উঠেছিল সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যটা! প্রেম, ভালবাসা! তার মায়ের মত তীব্র ঘৃণার ধিক্কার নিয়ে আর সকলের অবহেলা কুড়িয়ে তাকেও বেঁচে থাকতে হবে! নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ভাষায় অপমান করে নিবারণকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল পদ্ম। ভীষণ ক্রোধে জ্বলে-পুড়ে ক্ষিপ্ত জন্তুর মত চীৎকার করে উঠেছিল নিবারণ—তুই তো একটা বেশ্যার মেয়ে। দেখি, কেমন করে তোর বিয়ে হয়!···সেই বিষ সে ঢেলেছিল কালীগঙ্গার ওপারে হরিনারায়ণপুরে তার শ্বশুরবাড়ীতে এসে।

একটা চায়ের দোকানে বসে পশুপতির কানে কানে বলেছিল কতকগুলো গূঢ় কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে পশুপতির চোখের দৃষ্টি বদলে গিয়েছিল। মাতাল একটা ঝড়ের মতো বাড়িতে ছুটে এসে বলেছিল—বলো, সত্যি করে বলো, তোমার বাবার মৃত্যুর পর তোমার মা কেমন করে সংসার চালাতো?

—কেন? বাবার স্কুলের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কয়েকশো টাকা মা পেয়েছিলেন, আর কিছু ধানী জমি ছিল—শান্ত গলায় বলেছিল পদ্ম। যেমন করে আর সবাইয়ের চলে—

—তোমাদের পাশের বাড়ীর নিবারণ যে বলে গেল, তোমাদের গাঁয়ের জমিদার চৌধুরীদের ছোট ছেলের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশার ফলে তোমার মায়ের গর্ভে—

—নিবারণ!

চেঁচিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল পদ্ম। দুর্নিবার একটা তীব্র ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠে, পশুপতির পা জড়িয়ে ধরে অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল—বিশ্বাস কর, সব, সব মিথ্যা কথা। তুমি তো আমাকে ভালবাসো, বিশ্বাস কর—

—ছিঃ ছিঃ, কী ঘরের মেয়েই বিয়ে করেছি। না, না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বলেছিল পশুপতি,—জানো আমার ঠাকুরদা সন্ধ্যা করতে করতে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। আমার বাবা কাশীতে দেহ রেখেছেন, জানো। তোমার সঙ্গে যে কয়েক মাসের জন্যে ঘর করেছি, তারজন্যেই এখন কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

সেই দিনই অন্ধকার রাত্রির আড়ালে কালীগঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে তাকে নিয়ে রওনা হয়েছিল পশুপতি। শেষরাতের আঁধারে তাকে বোয়ালিযার ঘাটে নামিয়ে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল।

বাঁ-হাতে কপালটা টিপে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল পদ্ম। দুপুরের বাতাসে বাড়ীর পাশের কলাগাছের ছিন্নভিন্ন পাতার ঝালর একটানা শব্দ বাজিয়ে চলল ফর ফর করে। বিয়ের এই আড়াই পেঁচী জোড়া বিক্রি করে তাকে আজ আবার পেটের ভাতের জন্য দোকান খুলতে হবে। নাকছাবিটি গেছে বহুদিন আগে। সব যাবে—সব যাবে! গয়নার মোড়কটা বুকে চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পদ্ম নির্জন একক সেই ঘরের অন্ধকারে। বাইরের উঠোনের হাওযায় ভেসে উঠলো ন্যাদোনের গলার স্বর—দিদি, রান্না হয়েছে?

কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে আপন মনেই বলল—কী ব্যাপার! নেই না কি!

ধীর পায়ে বেরিয়ে এল পদ্ম। ন্যাদোন তীক্ষ্ণ চোখে পদ্মের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি তুই নিশ্চয়ই কাঁদছিলি, না? এত করে বলি পুরণো দিনের কথা ভেবে মিথ্যে মন খারাপ করিস না—

—থাক হয়েছে আর মাতব্বরি করতে হবে না।—পদ্ম বলল।—এখন রান্নাঘরে চল। খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর—

—ফটা আর লালুকে দেখলাম, খুব হৈ হৈ করে আমাদের পুরণো দোকান-ঘরটা মেরামত করছে—

—হ্যাঁ, আসছে বিস্যুৎবার থেকে দোকান আবার চালু করবো।

—দোকান দেখাশোনা করবে বুঝি ধীরেনবাবু, না ?

—হ্যাঁ, তুই তো থিয়েটারের নেশা ছেড়ে এদিকে নজর দিবি না।

পদ্মের পিঠে আলতোভাবে হাত দিয়ে নরম গলায় বলল ন্যাদোন—দিদি তুই রাগ করিস না। দেখিস একদিন এই থিয়েটার করেই দুপয়স' পাবো !

স্থির বিশ্বাসের আলোয় জ্বল জ্বল করে তার চোখদুটো।

—থিয়েটারে চাকরবাকরের পার্ট, কি শয়তান লোকের পার্ট যারা করে তারা কোনোকালে পয়সা পায় না—

—শয়তানের পার্ট করা কি সহজ রে দিদি। তুই কিছু জানিস না—একটু থেমে পদ্মের হাত দুটো ধরে বলল—দিদি দুটো টাকা দিবি ?

—দুটো টাকা, কেন ?

—পুঁটিকে দেব। আমাদের থিয়েটারে জনচাবেক মেয়ে নিয়েছে। ও তাদের একজন। ওর খুব জ্বর হয়েছে। হাতে একটা পয়সা নেই—

—তোর তাতে কি ? তোর অত দরদ কেন শুনি ? এক পয়সা উপার্জন করবার মুরোদ নেই, দান খয়রাতির বেলায় তো খুব—

—ও ওষুধের অভাবে মরে যাবে দিদি।

—ও, বুঝেছি। তোর সাথে বুঝি পুঁটির ভালবাসা হয়েছে, না ?

ন্যাদোনের ফাটা ফাটা দাগধরা কপালে সিঁদুরের ছিঁটে পড়ল। চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। বলল—ভাবটাব বুঝি না বাপু ! আমার হাতদুটো ধরে কেঁদে বলল, ন্যাদোনদা, তুমি দুটো টাকা ধার দাও। জ্বর হয়ে মরে গেলেও আমার মামা-মামী এককৌটা ওষুধ দেবে না। থিয়েটারের ম্যানেজার পাঁচটা টাকা দিয়েছিল—তাও ফুরিয়ে গেছে।

—দেব টাকা—পদ্ম বলল—কিন্তু দেখ, আর কোনদিন ওকে ফস্ করে কোনো কথা দিস না।

—দিবি ! রুদ্ধশ্বাসে বলল ন্যাদোন। চোখের তারা দুটো ধিকি ধিকি জ্বলে উঠল। বিপুল উচ্ছ্বাসে পদ্মের কোলে মাথা গুঁজে ছোট ছেলের মত

বলে উঠল—দিদি! মা-কে আমার মনেই পড়ে না। কিন্তু তুই আমার মায়ের মত। তোর মনটা এত উদার!

—হয়েছে, হয়েছে। আর থিয়েটারী বক্তৃতা করতে হবে না।—দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল পদ্ম, বলল—তাড়াতাড়ি এসে খেয়ে নে।

॥ ছয় ॥

দিন কাটে। বৈশাখের সোনালী রোদঝরা দিন শেষ হয়ে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত পাড়ি দিয়ে তীব্র শীতের দাপটে কুয়াশার চাদর জড়িয়ে পৌষ মাস আসে। মাত্র আটমাসে জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের আয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা থেকে বাড়তে বাড়তে দেড়শো টাকায় দাঁড়ায়। পদ্মের দুঃখী অবয়বহীন অন্ধকার জীবনের দূর কোণে-কোণে রামধনুর ঝিলিমিলি ফুটে ওঠে। অদ্ভুত একটা অদৃশ্য শক্তির প্রলেপ যেন তার শীর্ণ দেহটাকে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দুপুরে রান্নাঘরে ছুটোছুটি করে কাজ করে পদ্ম। ডাল সম্বরা দিয়ে গুনগুন গান করে। ব্যস্ত হাতের টানাটানিতে ঠুং ঠাং শব্দ ওঠে—হাতের চুড়ি বাজে। রুক্ষ চুলের ছোটো খোঁপা ভেঙ্গে বাতাসে ফুর ফুর করে চুল ওড়ে। ফটফটে সাদা ব্লাউজ-টার ওপরে পিঠের শিরদাঁড়াটা ফুটে ওঠে। দূরে মিছরীভোগ আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ধীরেন্দ্রলাল অপলক-চোখে পদ্মের মরানদীর মত শীর্ণ যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে ওঠে। বলে—গানও তুমি গাও পদ্ম?

—ওমা! আপনি কখন এলেন? ছিঃ ছিঃ আমাকে বলতে হয়।

—আজ কত বিক্রী হয়েছে জানো পদ্ম?

—কয় বাণ্ডিল?

—এই বেলাতেই চল্লিশ বাণ্ডিল। আর সত্যি, লালু, ফটার হাতের বাহাদুরি বলতে হয়। কেমন মেশিনের মত দ্রুত হাত চলে ওদের—

—ওরা অনেকদিন থেকে ঐ করছে। আগে ছিল শরতের বিড়ির দোকানে। মাইনে পেত বড্ড কম—

—ওরা কি পাকিস্থানেও ঐ বিড়ির কাজ করতো নাকি ?

—না, না, ফটার বাবা ছিলেন পুরোহিত।

—ওরা ব্রাহ্মণ ?

—হ্যাঁ ঢাকায় ওদের গাঁয়ের স্কুলে পড়তো।

—আর লালু ?

—ওর বাবা ছিলেন ওদের গাঁয়ের ইউনিযন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। জমিটমিও ছিল অনেক। দেশ ভাগের আগেই ওর বাবা মারা গিয়েছিল—

—এখানে এসে বিড়ি-বাঁধার কাজ করছে!—হঠাৎ গম্ভীর, বিষন্ন হয়ে উঠল ধীরেন্দ্রলালের চোখের দৃষ্টি। ছাড়া ছাড়া গলায় বলল—দেশ ভাগ হয়ে আমাদের সকলের অতীতটা একেবারে মুছে দিযেছে—

ডাল পুড়ে যাবে। আমি যাই—ব্যস্ত হযে বলল পদ্ম। রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

হলুদ বাটার ছোপধরা শাড়ী-পরা তার দীঘল দেহটাব দিকে তাকিযে ধীরেন্দ্রলাল বলল—কাজের কথা ছাড়া অন্যকোনো কথা তুমি শুনতেই চাও না পদ্ম।

কাঁপা হাতে ডাল ঘুঁটছে পদ্ম, আর তার বুকের ওপব দিযে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলে যাচ্ছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। অদ্ভুত একটা শিহরণ যেন তার রক্তেরই ভেতরে শির শির করে। তবুও মৃদু গলায় বলে—কি কথা বলতে চান ?

—এই সুখ-দুঃখেব কথা, আমাদের ঘা খাওযা জীবনের কথা, আবার কী!

হাওয়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে দিযে ধীরেন্দ্রলাল আবার বলে—জানো পদ্ম, মানুষের আত্মা অপরাজিত। দারিদ্র্যে, দুঃখে অবক্ষয়ী জীবনের বোঝা পিঠে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছি আমরা। তবুও রাস্তার পাশে ফুটে

থাকা সুগন্ধী ফুলের দিকে আমরা তাকাই। মিষ্টি সুরের গান আমাদের আনমনা করে দেয়—

—ফুল দেখা, গান শোনার সময় কোথায় আমাদের?

ধীরেন্দ্রলাল দেখতে পায় না। কৌতুকের হাসিতে পদ্মের চোখদুটো জোনাকীর মত জ্বলছে।

—আহা না, তোমাকে আমি তা বলছি না—অস্থির হয়ে মাথা নেড়ে ধীরেন্দ্রলাল বলে—আমি বলতে চাইছি, হাজার দুঃখ কষ্টেও মানুষের প্রাণ, মানুষের আত্মা—ধেৎ, না, তুমি বুঝবে না।—নিজের মনের চাপা বেদনাকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যই যেন উঠোনের বাঁশ থেকে গামছা নিয়ে নদীতে স্নান করতে চলে যায় ধীরেন্দ্রলাল।

জ্বলন্ত উনুনের লেলিহান শিখার আঁচে জ্বলে যায় পদ্মের মুখখানা। তার চেতনায় একটা অশুভ সঙ্কেতের ছায়া পড়ে। অনেক—অনেক ঝড় দুর্যোগের দিন পেরিয়ে যে প্রসন্ন আলোয় ভরা প্রভাত এ জীবনে এসেছে। দুর্বার নিয়তি বোধহয় তাকেও নিঃশেষে মুছে দেবে। তার রক্তের ভেতরে সেই পাপের বিষ যে খরধারায় বয়ে চলেছে! অগ্নি সাক্ষী করে সপ্তপদী কুশণ্ডিকা করে যে পুরুষের জীবনে সে বধূ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে তাকে তীব্র ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সেদিন তার মাথার ওপরে আকাশ ভেঙ্গে পড়েছিল। মা-র বুকে মাথা রেখে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেছিল—বলো মা—তুমি বলো, কেন তিনি আমাকে তোমার কাছে দিয়ে গেলেন? পদ্মের মা, রাধার ছানিপড়া পিচুটিমাখা চোখে চাপা কান্না থমকে গিয়েছিল। হু হু করে উঠেছিল তার বুকের ভেতরটা। মা হয়ে নিজের মুখে তার সেই ভুল ভালবাসার পাপের কথা কেমন করে বলবে সে। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার হৃৎপিণ্ডটা। কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথা ফুটল না। হঠাৎ ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়াল রাধা। কান্নাটান্না কোথায় উড়ে গেছে। তার চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত চকচক করে উঠেছিল। উন্মাদিনীর মত পদ্মের সিঁথির সিঁদুর

ঘসে ঘসে তুলে ফেলেছিল। বলেছিল—কোন সময় ভাববি না—তোর বিয়ে হয়েছে। আমি আবার বিয়ে দেব তোর—

খর চোখে মার দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল—তবে তোমার সম্বন্ধে যা শোনা যায় তা-ই ঠিক ?

—ওরে, তুই মেয়ে হয়ে এই কথা বললি ?—দুহাতে বুক চেপে ধরে প্রহৃত শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠেছিল রাধা। মেয়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরে মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলেছিল কপালটা। যেন তার জীবনের সব দুষ্কৃতির বিষাক্ত অনুভূতিগুলোকে আছড়ে আছড়ে সেই বুকের বেদনাকে সে লাঘব করতে চায়। সজল চোখ দুটোর করুণ দৃষ্টি তুলে ধরে মেয়েকে বলেছিল রাধা—তুই আমাকে ক্ষমা করিস মা। জেনে রাখিস, তুই বোয়ালিয়ার স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতের মেয়ে ! তার মত অত বড় মনের মানুষ আর ছিল না ও তল্লাটে। তুই তার মেয়ে—

—আমি জানি, ধনঞ্জয় মাষ্টারের মেয়ে আমি। কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে মা, তোমার কি পাপে আমার জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ শেষ হযে গেল।

—পাপ !—কান্না থরোথরো রাধার জীর্ণ মূর্তিটা হেলে সাপের মত দুলে উঠেছিল। স্থির দৃষ্টিতে পদ্মের রোষদীপ্ত মুখের দিকে তাকিযে সে বলেছিল, —তোর বাবা যখন মারা গেল তখন তোরা দুই ভাইবোন একেবারে শিশু। ঘরে কতকগুলো ছেঁড়া পুঁথি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি চিরকাল পরমার্থের চিন্তা করেছেন—অর্থের চিন্তা তো করেন নি ! অভাবের সঙ্গে দুহাতে লড়াই করে তোদের বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু এটা ঠিক চৌধুরীদের ছোট ছেলে বিকাশ আমাকে সেই দুর্দিনে সাহায্য না করলে—

—সেই বিকাশের সঙ্গেই না কি ?

—হ্যাঁ। আমার বয়স তখন চৌত্রিশ তার ছিল আঠাশ। তোর বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র ছিল সে। বয়সে ছোট বলেই অবাধে মেলামেশা করতাম। উনি কেন, পাড়ার কেউই কিছু মনে করতো না—

—বাবার মৃত্যুর পরে তোমাদের মেলামেশা নিশ্চয়ই বেড়েছিল?

—হ্যাঁ, বিকাশ আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতো। আমাকে দিদি বলে ডাকতো।—যেন বহুদূর থেকে রাধা বলছে কথাগুলো। মধুর অথচ তীব্র বিষাক্ত দুঃস্মৃতির পীড়নে এঁকে বেঁকে দুমড়ে কেমন হয়ে উঠেছিল তার মুখখানা। রাধা বলল—পদ্ম তুই মেয়ে হয়ে জন্মেছিস। কোনদিন কাউকে নিবিড় করে ভালবাসলে দেখবি, সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়, মেলামেশার মাত্রা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না।—হঠাৎ থেমে গেল রাধা। টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে দড়াম করে খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। সারারাত সাধ্য-সাধনা করেও পদ্ম তাকে জল পর্যন্ত খাওয়াতে পারে নি। তিনদিন পরে ঘরের বাইরে এসেছিল রাধা। অনাহারশীর্ণ মুখের শিরায় শিরায় তীব্র একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটেছে। কোটরে-বসা চোখদুটো ধক ধক করে জ্বলছে। সেই রাতেই কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল রাধার। শেষরাতের আকাশে যখন শুকতারার আলো মিটি মিটি জ্বলছিল, ফিকে হয়ে আসছিল অন্ধকার, প্রবল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল রাধা—না, না, তোর কোন দোষ নেই পদ্ম। ভগবান যেন আমাকে নরক বাস করায়। হ্যাঁ রে পদ্ম?

—কি মা?—তার হাড় জিরজিরে বুকটা ডলে দিতে লাগল পদ্ম।

—আমাদের ঘরে ক্যালেণ্ডারে নরকের একটা ছবি ছিল না? অসতী হলে তাকে পচাকাদায় ভরা কুয়োর ভেতরে ফেলে দেয়?

হা হা করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠেছিল বিকারগ্রস্ত রাধা। পদ্মের বুকের হাড়ে হাড়ে জমাট ভয় বাসা বেঁধেছিল। বাইরে ভোরের আবছায়া অন্ধকার ছাতিম গাছের পাতায় পাতায় দুলছিল। পাপ-পুণ্যেভরা জটিল এই মানুষের পৃথিবীটার দিকে তখনো পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল মুঠো মুঠো যুঁই ফুলের মত রাশি রাশি তারা। অসহায় চোখে সে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। কতক্ষণে সকালের আলো ফুটবে, আর জীবন ডাক্তারকে নিয়ে এসে মাকে দেখাবে। কিন্তু—

কিন্তু রক্তহীন ফ্যাকাশে হাত বাড়িয়ে চি চিঁ করে ডাকল রাধা—

পদ্ম এদিকে আয় আমার বুকে মাথা রাখ মা।—তার ঘন কালো চুলেভরা মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল রাধা—দেখ পদ্ম, তোকে কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না! শুধু আমার কলঙ্কের জন্য তোর জীবন—

বাদবাকী কথাগুলো তীব্র কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল। মেটে প্রদীপের আলোয় আবছায়া সেই অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে কিশোরী পদ্মের চোখহুটোও জলে ভরে এসেছিল। আবার যেন বহুদূর-দিগন্ত থেকে সে বলেছিল—শোন পদ্ম, বিয়ের চেয়ে বড মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই। ভাল ছেলে পেলে তুই বিযে করিস। ঘর সংসার করিস—

—না, মা, বিয়ে আমি করবো না।

পদ্মের কথাটা যেন শুনতে পেল না রাধা। তাব মৃত্যু-পাণ্ডুব চোখহুটোর দৃষ্টি সুদূর হয়ে উঠল। বলল—যার জন্য আমি কলঙ্কেব বোঝা মাথায নিযে ওপার যাচ্ছি, তাকে আমি সব দিযে ভালবেসে ছিলাম। কিন্তু আমি তখনো জানতাম না, সব দিয়ে পুরুষ মানুষকে ভালবাসতে নেই। ছোট ছেলের হাতের মোযার মত অবস্থা হয। দিলেই টুপ করে খেয়ে ফেলবে। আর শেষ হওয়ার পর কিছুই মনে থাকবে না। পরে ঐ বিকাশই আমাকে ঘৃণা করতো, লোকেব কাছে বলতো, আমিই ওকে খারাপ করেছি।—আর্ত গোঙানির মত তীব্র কান্নায অস্থির হয়ে উঠেছিল রাধা। পদ্মকে বুকের ভেতরে আঁকড়ে ধরে বলেছিল—তোর জন্য আমি মরেও শান্তি পাবো না পদ্ম—

—তুমি ঘুমোও মা।

প্রহরে প্রহরে রাত গভীর হযেছিল। আকাশেব উত্তর-পশ্চিম কোণে গিন্নি শকুনের ঠোঁটের মত এক টুকরো কালো মেঘ দেখা গিয়েছিল। একটু পরেই সারা আকাশে মেঘে মেঘে বিদ্যুতের দীপ্তিতে বিশাল চক্রান্তের ঘোষণা ঘন-ঘোর হয়ে উঠেছিল। হুরন্ত ঝড়ো বাতাস আর ধারালো বর্শার মত বৃষ্টির বেগে কেঁপে উঠেছিল দিক-দিগন্ত।

—উঃ ভগবান! আমাকে তুমি মেরে ফেল—মেরে ফেল—তীব্র একটা

বুকফাটা আর্তনাদে শিউরে উঠেছিল দুর্যোগের রাত্রি। ঘুম ভেঙ্গে ছুটে এসেছিল পদ্ম তার মায়ের ঘরে। প্রদীপটা জ্বালিয়ে সারা বাড়ী কাঁপিয়ে আতঙ্কে সে চীৎকার করে উঠেছিল। তক্তাপোষ থেকে মুখ থুবড়ে মেঝেয় পড়ে গিয়েছে রাধা। আর মৃত্যু যন্ত্রণায় কুঞ্চিত একরাশ হুকের মত আঙুল দিয়ে ধরে আছে তক্তাপোষের একটা পায়া। কপাল কেটে দরদরিয়ে রক্ত ঝরছে। নোনা ইটের মেঝেয় জমাট সেই রক্ত চেটে চেটে খাচ্ছে আরশোলার ঝাঁক। রাধার দেহে প্রাণ নেই।…

কালের স্রোত ঘুমপাড়ানিয়া গানের মত পদ্মের মন থেকে এই গভীর শোকের ক্ষত মুছিয়ে দিয়েছিল। পাঁচ বছরের ছেলে রোগা প্যাঁকাটির মত ন্যাদোনের দিকে তাকিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বুকের ভেতরে বলিষ্ঠ একটা বাসনা স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে দাঁড়াল।

না, বাঁচতেই হবে! ন্যাদোনকে বাঁচাতে হবে—বাঁচার জন্য দুহাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছে সে। ন্যাদোন একটু বড় হতে-না-হতে দেশ ভাগ হলো। তার এক পিসীমার ভরসায় সেখানকার বাড়ীঘর ছেড়ে চলে এল এই পশ্চিম দিনাজপুরে। তারপর একটানা চলেছে এই জীবন সংগ্রাম। তার নারকেলের দড়ির মত ছিবড়ে পাকানো শরীরে যৌবনের ছিঁটেফোটা এখনো যা রয়েছে, তারই লোভে গন্ধমাতাল মৌমাছির মত তার আশেপাশে কেউ গুনগুন করতে এলেই তার মনে পড়ে যায় মায়ের সেই মর্মান্তিক খেদোক্তি—'আমি যে ভুল করেছিলাম, সে ভুল তুই করিস না,—তার সেই সুতীব্র অনুশোচনা পদ্মের চেতনায় আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দেয়। মুহূর্তে নিষ্করুণ কঠোর হয়ে ওঠে সে। তার ব্যর্থ যৌবনের দুর্বার কামনা দেহের রক্তে রক্তে ঝড়ের তাণ্ডব জাগিয়ে তোলে। কিন্তু মন বলে—না, না, নিশ্চয়ই মায়ের মত পরিণতি হবে। এমনি সভয়ে সে লোভের হাতছানির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। শুধু তীব্র কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে হিংস্র লড়াইয়ের এক আগ্নেয় অনুভূতিতে ছেয়ে থাকে তার মন। সে মন কোন স্বপ্নের জাল বোনে না; কোন মধুর কল্পনায় বিভোর হয় না। যেন যৌবনের সব

বাসনা কামনাকে নির্বাসন দিয়ে তার মন এক নির্বেদ লোকে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ধীরেন্দ্রলালের চোখের দৃষ্টি দেখে তার মনে হয় অভিশপ্ত জীবনের আকাশে আবার হয়তো একটা কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তার জন্মলগ্নে কী দুর্গ্রহই যে ছিল!

॥ সাত ॥

বিকেলের ছায়া নেমেছে বণ্ডীর বাজারের চারিদিকে। ইলেকট্রিকের আলোয় উজ্জ্বল বড় রাস্তার ওপর দিয়ে জনতার স্রোত বয়ে চলেছে। জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের পাশে কয়েকটা লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পেঁয়াজী, আলুর চপ কিনছে। বাতাসে ভাসছে ভাজা পেঁয়াজীর তীব্র গন্ধ। তোলা উনানের গনগনে আগুনের আভায় পদ্মের কপাল জ্বালা করছে। কড়াই থেকে ভাজা হয়ে পেঁয়াজী আর আলুর চপ নামাতে না নামাতেই খরিদ্দারেরা লোলুপ উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শালপাতার ঠোঙা এগিয়ে দিচ্ছে।

—আমাকে—আমাকে আগে দাও। কত আগে পয়সা দিয়েছি—

—একটু সবুর কর বাপু—অধৈর্য্য হয়ে পদ্ম বলে, ভেজে নামাবো তবে তো দেব—মোটর গ্যারেজের মালিক পাবনা কলোনীর মণ্ডপ হরনাথ দেশী মদের দোকানে যাওয়ার রাস্তায় পেঁয়াজীর দোকানের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কেরাসিনের ডিবের ছায়া-কাঁপা আলোয় ময়লা সাদা শাড়ী জড়ানো পদ্মের শীর্ণ দেহের দিকে রক্তচোখে অপলক দৃষ্টি ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসেও হরনাথের মরা রক্তে উদগ্র একটা লালসার আগুন ধিক ধিক জ্বলে উঠল। সরীসৃপের মত নিঃশব্দ গতিতে ভিড়ের ভেতরে এগিয়ে এল হরনাথ। পদ্ম তখন কোমরে আঁচল জড়িয়ে তপ্ত কড়ায় হাতার ঠুং ঠাং শব্দ তুলে পেঁয়াজী-আলুর চপ ভেজে চলেছে; আর খুসী খুসী গলায় চীৎকার করে বলছে—কে নেবেন, আসুন—দুপয়সার ছয়টা পেঁয়াজী—

—দেখি আমাকে চার পয়সার পেঁয়াজী দাও তো!

শকুনের ঘোলা চোখের মত দুচোখে হাসির আলো জ্বালিয়ে বলল হরনাথ—এই যে পয়সা। বলেই, পদ্মের পেঁয়াজীর ডাল ব্যসনমাখা ডান হাতের তালুতে একটা মৃদু চাপ দিল।—এই শয়তান! কি হচ্ছে? তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল পদ্ম। দ্রুত নিশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে তার বুক। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে হিংস্র সাপিনীর মত ফুঁসে উঠে বলল—ঘরে মা-বোন নেই তোমার? তুমি ভদ্রলোকের ছেলে নও!

—কি হয়েছে—কি হয়েছে? একটা ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে এল ফটা, লালু আর ধীরেন্দ্রলাল। হরনাথ তখন তীরের মত ছুটছে দূরে অন্ধকারে দেশী মদের দোকানের দিকে। চেঁচিয়ে উঠল লালু—ধর-ধর শালা মদো মাতালটা পালাচ্ছে—লালু ছুটে যেতেই খপ করে ধীরেন্দ্রলাল তার হাত ধরে ফেলল। বলল,—লালু, হৈ চৈ করিস না। ছেড়ে দে। একটা গোলমাল হলে পদ্মরই বেশী অপমান হবে—

—কেন দাদা আপনি একথা বলছেন কেন, বলল ফটা, আপনি তো বলেন, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—

তার কথা শেষ না হতেই ধীরেন্দ্রলাল পদ্মকে বলল—তোমাকে তো বলেছি পদ্ম, দোকানে এখন কম করে দুশো টাকা লাভ হচ্ছে। এখন ফুলুরি বিক্রী বন্ধ করে দিলেই পারো—

কোন কথা বলল না পদ্ম। কারবাইডের গ্যাসের আলোয় দেখা গেল তার গালের ঠেলে ওঠা হাড়ের ওপরে অশ্রুর বিন্দু চিকচিক করছে। দৃঢ় গলায় সে বলল, মেয়েরা পেটের দায়ে বাইরে পা দিয়েছে। এখনও কি পুরুষরা তাদের সঙ্গে সহজ ব্যবহার করবে না।

ধীরেন্দ্রলাল বলল, যত পরিবর্তনই হোক, পুরুষের লালসার দৃষ্টির খোঁচা তোমাদের খেতেই হবে পদ্ম!

পদ্মের উত্তেজিত মনটা আবার শামুকের খোলার মত নিজের ভেতরে গুটিয়ে গিয়েছে। তপ্ত কড়ার ওপরে ডাল গোলা পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—আসুন, দুপয়সায় ছয়টা পেঁয়াজী—

রাত্রি নামল ঘন হয়ে। দূরে ট্রেজারীর পেটা ঘড়িতে ঠং ঠং করে নয়টা বাজল। ধাতব শব্দটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল। কেরাসিনের ডিবের মৃদু আলোয় আনি সিকি দুয়ানীর খুচরো পয়সা গুণে গুণে আঁচলে বেঁধে নিল পদ্ম। কড়াই আর হাতাটা হাতে নিয়ে অদূরে জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বলল পদ্ম,—লালু ফটা আমি বাড়ী গেলাম। তোরা দোকান বন্ধ করে আসিস। আজ তোরা আমার ওখানেই খাবি—

—পদ্মদি, তুমি ওবেলায় খাইয়েছো, আবার এবেলাও কষ্ট করবে।—চেঁচিয়ে বলল ফটা। দূর থেকে ভেসে এল পদ্মের তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলার স্বর—পাকামো করতে হবে না। দোকান বন্ধ করে এসে খেয়ে যেও—

—আশ্চর্য লোক মাইরী!—মুগ্ধ অপলক চোখে দূরে অন্ধকারে পদ্মের অপসৃয়মান মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে বলল লালু,—আমার নিজের মায়ের কাছেও অত আদর পাই নি!

—আমি তো পদ্মদির একটা মুখের কথায় বুকের কলিজা উপড়ে দিতে পারি।—তীব্র আবেগে কেঁপে উঠল ফটার গলার স্বর—অথচ দেখ পদ্মদির দুঃখ কত! স্বামী ওকে নেয় নি। কত মেয়েছেলে স্বামীর ভালবাসা আদর পেয়েও দিনরাত খিটখিট করছে—

—আরও কত দেখেছি—কাঁচি দিয়ে বিড়ির পাতা কাটতে কাটতে লালু হঠাৎ বলল, স্বামীর কাছে থেকেও কত মেয়েছেলে নষ্ট হয়ে যায়—

—কিন্তু পদ্মদির কাছে কোন লোক ঘুরঘুর করুক তো দেখি? ও হচ্ছে বাঘা মেয়ে।

পদ্মের প্রশংসায় আর তার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধায় বড় বড় হয়ে ওঠে ফটার চোখদুটো। লালু গুন গুন করে গান ধরল—

জাগো দরদী ইসকি জাগো
দিলকো বেকারার হ্যায়

পাশের ঘরে লম্বা লাল খাতায় হিসাব লিখতে লিখতে ধীরেন্দ্রলালের কলম

থেমে গেল। কপালের ওপরে হিজিবিজি রেখা ফুটে উঠল। ঝড়ের বেগে কারখানা ঘরে ছুটে এসে চেঁচিয়ে বলল—আবার সিনেমার গান আরম্ভ করেছিস! কতদিন না তোকে বলেছি, এই জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানে এসব গান চলবে না।

—মনে থাকে না দাদা। ভয়ে ভয়ে বলল লালু, মাঝে মাঝে ফিলিংস এসে যায়।

—তোরা তো সিনেমার গান গেয়ে আর বিড়ি বেঁধে দিন কাটাচ্ছিস।

—আব কি করার থাকতে পারে দাদা? বিস্মিত হয়ে ফটা বলল।

দোকানের সম্মুখে ধোয়া ওঠা রাস্তার ওপরে কুয়াশা ঢাকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ধীরেন্দ্রলাল কেটে কেটে অভিশাপ উচ্চারণ করার মত করে বলল—কখনো নিজেরা ভেবে দেখেছিস তোরা একদিন কত ভাল ঘরের ছেলে ছিলি। দেশ ভাগ না হলে তোরা আর পাঁচজনের মত বি, এ, এম, এ পড়তিস। আমিও চোখে বড় স্বপ্ন নিয়ে একদিন দেশের জন্য দুঃখ বরণ করেছিলাম। কিন্তু আমরা ছোট কাজ করি, বিড়ি বাঁধি বলেই আমাদের কোন সামাজিক মর্যাদা নেই। লোকে আমাদের ভদ্রলোক বলে স্বীকারও করতে চায় না। তাই—

—দাদা আমাদের ছয় সাত হাজার টাকা করে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স থাকলে আর তখন বিড়ি বাধলেও লোকে আমাদেব সম্মান করতো।—বেশ ভারিক্কি গলায় জবাব দিল ফটা।

—ছয় সাতহাজার টাকা থাকলে তুমি কি আর বিড়ি বাঁধতে আসতে চাঁদু?—লালু বলল,—মোটা চৌধুরী সাহেবের মত বাস কিনে গঙ্গারামপুরের রুট-লাইসেন্স নিতে।

—বাজে কথা ছেড়ে দে, শোন—ধীরেন্দ্রলালের চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কল্প ঘনিয়ে এল।—বলল, দেখ আমি এমন একটা কিছু করতে চাচ্ছি যাতে শহরের সবাই বুঝতে পারে আমরা যারা বিড়ি বাঁধি তারাও মানুষ।

—কি রে তোরা এখনও দোকান বন্ধ করিস নি?—দোকানের ভেতরে এসে দাঁড়াল ন্যাদোন। বুক পকেটে রঙীন সিল্কের রুমালের ইসারা।

পরনে হাফ প্যাণ্টের এখানে সেখানে সিঁদুর মাখানো সবেদার ছিটে ফোঁটা রয়েছে। তাচ্ছিল্যের হাসিতে মুখটা বেঁকিয়ে বলল,—ও ধীরেনদা বুঝি বিপ্লব আওড়াচ্ছে। আরে চল চল, অনেক রাত হয়েছে—

—বিপ্লব আওড়াচ্ছে মানে!—ভীষণ ক্রোধে জ্বলে উঠল ধীরেন্দ্রলাল,—বিড়ির দোকানে বসে এই সব কথা যে বলছি, এই তোমাদের ভাগ্যি।—একটু থেমে বলল,—তোমার আর কি, দিদির পয়সায় খাচ্ছো, আর থিয়েটার যাত্রা করছো—

—চলরে ওঠা যাক। বলল লালু,—ওদিকে পদ্মদি আবার ভাত নিয়ে বসে থেকে রেগে আগুন হয়ে যাবে—

—কি একটা বলতে চাইছিলেন ধীরেনদা, বলল ফটা।

—আমি তোদের পরে বলবো।

—আপনি খেতে যাবেন না ধীরেনদা? বলল লালু।

—পরে যাবো। আমার এখানে স্পেশাল মতি বিড়ি, বাঁদর ব্র্যাণ্ড আর চ্যাপার বিড়ির কর্মচারীরা আসবে কথা আছে।

—আমরা তাহলে যাচ্ছি—

শীতার্ত রাত্রির বাতাস তাদের গায়ে স্থঁচের মত বিঁধছে। বৃন্দাবনী ছাপ আঁকা চাদরটা ভাল করে গাযে জড়িয়ে নিয়ে বিড়ি ধরিযে বলল ফটা,—স্বদেশী লোকগুলোর ঐ এক মুস্কিল। কোন অবস্থাতেই ওরা সুখী নয়। সব সময় খাঁচায় বন্ধকরা পাখীর মত ছটফট করবে—

—ওদের মনে অনেক বড় আশা থাকে কিনা—লালু বলল—সেই আশা ওদের মনটাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে।—বিড়িতে টান দিতে দিতে হেঁটে চলেছে ন্যাদোন। অন্ধকারে কেউ দেখতে পেল না, ন্যাদোনের ফাটা ফাটা বেগুনী ঠোঁটের রেখায় ধারালো এক টুকরো হাসি ফুটেছে। দূরে কোথায় একটা রাত্রিচর পাখীর কর্কশ স্বরে শিউরে উঠল রাত্রিটা।

॥ আট ॥

ধূপছায়া রঙের সন্ধ্যা নামছে খাদিমপুরের আদিগন্তপ্রসার প্রান্তরে। দূরে ফরিদপুর কলোনীর আলোগুলো কুয়াশামাখা অন্ধকারে আগুনের ফুলের মত ফুটে আছে। ডাঙ্গীর কালভার্টের ওপরে প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বসে আছে পুঁটি। ন্যাদোনদা কথা দিয়েও আসে না কেন! দূরে কলোনীর সম্মুখে আমবাগানের ভেতর থেকে গান ভেসে এল—

বনের আগুন সবাই দেখে
মনের আগুন কেউ না দেখে

কঠিন গলায় পুঁটি বলল—তুমি আসতে দেরী করলে কেন ন্যাদোন দা? সেই কখন থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। অভিমানে তার ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপতে লাগল। বাতাসে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ল ন্যাদোন—তুই রাগ করছিস কেন পুঁটি? তোর জন্যই তো রিহার্সেল ছেড়ে ছুটে এলাম।

—ন্যাদোন দা, বাড়িতে আর তো থাকা চলে না। করুণ হয়ে উঠল পুটির গলার স্বর—'পাবলিক স্টেজে' ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে থিয়েটারে নেমেছি বলে মামা-মামী আমার ওপরে ভীষণ অত্যাচার করছে। দুদিন খেতেই দেয়নি—

—এঁ্যা! বলিস কি রে?—যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল ন্যাদোনের চোখে।—তোর তাহলে জ্বর নয়, খেতে না পাওয়ার অসুখ—

—তবুও দেখ, থিয়েটার করে যে পাঁচ টাকা পেয়েছিলাম তা মামীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম—

—কি বলল তোর মামী?

—খেঁকিয়ে উঠে বলল,—নটীর অলানি-ঢলানি করে রোজগার করা পয়সা আমি ছোঁব ভেবেছ!—কিন্তু একটু পরেই পাঁচ টাকার নোটটা দিব্যি আঁচলে বাঁধল।

হো হো করে হেসে উঠল ন্যাদোন। বলল—শালা, দুনিয়াটা একটা চিড়িয়াখানা!

—ন্যাদোনদা, তুমি একটা রোজগারের উপায়-টুপায় কর—

—কেন? নাট্য-সমিতি কি আমাকে কোনদিনই পয়সা দেবে না ভেবেছিস?

—থিয়েটার করে পেটের ভাত যোগাড় করতে এদেশে এখনো অনেক দেরী আছে ন্যাদোন দা। ঐ আশায় বসে থাকলে, তুমি যা বলেছিলে—

—আহা, হবে হবে—বুক চিতিয়ে বলল ন্যাদোন—তোরা মেয়েমানুষ, সত্যি বড় অবুঝ! সবদিক ভেবে, তবে তোকে—

—তুমি জানো, অনেকদিনই আমাকে না খেয়ে থাকতে হয়! মণি-মেলায় বড়ি বিক্রি করে, ন্যাকড়ার পুতুল বিক্রি করে যা দু'এক পয়সা পাই, তাই দিয়ে মুড়ি মুড়কী আনিয়ে খাই। কিন্তু যেদিন বিনা কারণে মামী চুলের মুঠি ধরে মারে—চোখের কোল বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামল পুঁটির।

—না, না, একটা কিছু—একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়—ব্যগ্র হাতের আঙ্‌লগুলো মুঠো করে কি যেন ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে চায় ন্যাদোন। কান্নার ইঙ্গিতে থমথম করে তার মুখখানা।

দিক্‌বিদিক প্রান্তরে ঝিঁঝিঁর নূপুর বাজছে। পুঁটির জল চকচক চোখদুটো দুখণ্ড নীলার মত জ্বলছে। কাঠের হাতল লাগানো ব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল পুঁটি। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে মুখটা বিকৃত করে বলল, —উপায় আর তুমি করেছো। তোমাদের বিড়ির দোকানেই বসো না। তবু তো কিছু রোজগার করতে পারবে—

—বিড়ি বাঁধার কাজ! তুই কি চাস এ্যাক্টিংয়ের লাইন ছেড়ে দিয়ে শেষে বিড়ি বাঁধার কাজ নিলেই ভাল হবে?

—যা হয় করো—চারিদিকে অবারিত মাঠের হু হু করা হাওয়ায় কথাগুলো ভাসিয়ে দিয়ে জোর পায়ে হাঁটতে সুরু করল পুঁটি। চাপা অস্ফুট গলায় বলল—আমি জানি, আমার জীবনটা দুঃখে দুঃখেই কেটে যাবে।

—একটু দাঁড়া পুঁটি। চেঁচিয়ে উঠল ন্যাদোন।

—না আর দেরী করতে পারবো না ন্যাদোনদা—

পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ন্যাদোন কয়েকমুহূর্ত। খাদিমপুরের

মাঠের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে ঢাকা কলোনীর দিকে অগ্রসর হলো। তীক্ষ্ণ স্থচীমুখ যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছে তার মনের ভেতরটা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল নাট্যসমিতির মালিকের গোলাকার মাংসল মুখখানা। লোকটার হাড়ে হাড়ে শয়তানী। তার চেয়েও কম নম্বরের পার্ট করে ঐ কল্যাণ, তাকেও মাস ফুরুলে পাঁচটা টাকা দেয়। আর তাকে হাত উপুড় করার নাম নেই! না, কালকেই বলতে হবে ম্যানেজারকে। রাতের বাতাসকে শিউরে দিয়ে কতগুলো কুকুর চিৎকার করে ডেকে উঠল। ঢাকা কলোনীর ভেতরে সরু রাস্তার দুধারে বাড়ীতে বাড়ীতে খেটে খাওয়া মানুষগুলো পরম আরামের গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে। তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। কতদিনই বা আর দিদির গলগ্রহ হয়ে পরগাছার মত থাকবে। নিদারুণ একটা হীনমন্যতায় ছেয়ে গেল তার মন। সঙ্কল্পে কঠিন হয়ে উঠল তার চোখদুটো। পুঁটির কথা দিদিকে বলতে হবে। পুঁটির কৃশকরুণ, কান্নাভরা মুখচ্ছবি তার চেতনাকে আজ বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে। কিন্তু—

কিন্তু বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই চমকে উঠল ন্যাদোন। গাঢ় অন্ধকার ভরা উঠোনের ওপরে এক চিলতি আলোর রেখা ছিটকে এসে পড়েছে পদ্মের ঘর থেকে। কিন্তু এত মৃদু গলায় দিদি কার সঙ্গে কথা বলছে! এত নীচু গলায় তো কথা বলে না দিদি! ঢিপ ঢিপ করে উঠল ন্যাদোনের বুকের ভেতরটা। ঘরের ভেতরে একবার উঁকি দিয়েই চোখের পলকে ছায়ার মত কালো অন্ধকারে একাকার হয়ে নিজেকে মিশিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল মিছরীভোগ আমগাছের নীচে। কতদিন সে ভেবেছে নিশ্চয়ই ওদের ভেতরে একটা কোন সম্বন্ধ আছে। আজ নিজের কানে শুনতে হবে। কুটিল সন্দেহে তার চোখদুটো দপ দপ করে উঠল।

ঘরের ভেতরে কেরোসিন কাঠের একটা বাক্সের ওপরে বসে ধীরেন্দ্রলাল বলছে,—বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে একটা বিড়ি ইউনিয়ন গড়ে তুললেই দেখবে, সেই ইউনিয়নই আমাকে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসানে সাপোর্ট করবে। রিফিউজিরা তো নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবে।

পদ্মের মুখে চিন্তার ছায়া নেমে এল। উৎসুক হয়ে ধীরেন্দ্রলাল তাকালো তার মুখের দিকে। আবার বলল—তুমি কি বলছো পদ্ম?

মৃদু গলায় পদ্ম বলল—আজকাল গুণী এবং সত্যিকারের কর্মীর দিন নেই ধীরেনবাবু। যারা দল পাকাতে পারে, চক্রান্ত করতে পারে তাদেরই দিন। মাত্র চার আনা পয়সা দিয়ে মানুষের চরিত্র, নীতি, ধর্ম, সব কিনে নিতে পারা যায়। দেখবেন, পয়সা ছিটিয়ে ঐ সুনীল মোক্তার, নান্টু সেনের মত পয়সাওয়ালা স্থানীয় লোকেরাই ভোট পেয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।—

—লড়তে হবে! ধীরেন্দ্রলালের চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল। বলল—সমাজের ঐ দুষ্ট কীটগুলোকে টিপে মারতে হবে। একটু থেমে আবার নরম গলায় বলল—সারা জীবন শুধু কষ্টই পেয়েছি পদ্ম—এবার হঠাৎ সে থেমে গেল। উল্লাসে ছটফট করে উঠল চোখের তারা দুটো। মনের ভেতরে হাজারো আশার মৌমাছিরা গুণ গুণ করে উঠল। নিস্তেজ দুটো চোখের দৃষ্টি ধীরেন্দ্রলালের গর্ব্বোদ্দীপ্ত মুখের দিকে তুলে ধরে বলল পদ্ম, আগে বিড়ি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করুন। সব বিড়ি কর্মচারীরা যদি আপনার পাশে এসে দাঁড়ায়, তাহলে আপত্তি নেই। আপনি মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে দাঁড়ান। আপনি জয়ী হলে সবচেয়ে বেশী খুসী হবো আমি—

তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পডল ধীরেন্দ্রলালের মুখে। স্থির পলকহীন চোখে মেটে প্রদীপের ছায়াকাঁপা আলোয় পদ্মের চকচকে কালো মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, পদ্মের রঙ কালো, কিন্তু কি সুন্দর ওর চোখদুটো! মুহূর্তে বিচিত্র একটা আবেগের ঢেউ তার বুকের রক্তে তোলপাড় করে উঠল। পদ্মের শীর্ণ হাত দুটো নিজের হাতেব ভেতর নিয়ে বলল,—পদ্ম তুমি আমার জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছো, অনেক কটু কথাও শুনছো, কিন্তু বাজে লোকের কথায় তুমি নিজের মাথা নীচু করনি। পদ্ম তোমার মত মেয়ে আমি—

—দিদি! আমি ভেতরে আসবো? কঠিন শীতল গলায় বলল গ্যাদোন।

—ওমা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আয়। ব্যস্ত হয়ে বলল পদ্ম। দ্রুত

পায়ে বাইরে এল। অন্ধকার বারান্দার এক কোণে তুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে ন্যাদোন। তার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে সস্নেহ গলায় বলল—ন্যাদোন, তুই এখানে কেন রে।

—তোরা কি সব প্রাণের কথা বলছিস—চাপা গলায় ন্যাদোন বলল—তাই আর আমি ভেতরে যাই নি।

পদ্মের বুকে যেন তীব্র একটা তীর বিঁধে গেল। হিংস্র সাপিনীর মত হিসিয়ে উঠে বলল—কি সব বলছিস তুই—

—পদ্ম, তোমার এই ভাই থিয়েটারের দলের সঙ্গে মিশে মিশে একেবারে ডেঁপো হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর থেকে হেঁকে বলল ধীরেন্দ্রলাল। যেন তীব্র কোন যন্ত্রণায় জ্বলেপুড়ে উঠল।—ছিঃ ছিঃ কি সব কথা! না পদ্ম, তোমার বাড়ীতে আমার আর থাকা চলবে না—

—না, না, আপনি ওর কথায় রাগ করবেন না। আমার সঙ্গে ও ঐরকমই কথাবার্ত্তা বলে।

—দিদি ঘরে তুই দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছিস। স্পষ্ট গলায় ন্যাদোন বলল—দেখিস ওর জন্য তোকে একদিন ভয়ানক দুঃখ পেতে হবে।

—চুপ কর। চীৎকার করে উঠল পদ্ম—আর একটা কথা বলবি তো, আমার মরা মুখ দেখবি।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে রোষে ক্ষোভে থর থর করে কাঁপছে ধীরেন্দ্রলাল। তার চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত চক চক করছে।

॥ নয় ॥

জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানে সভা বসেছে। শহরের সমস্ত বিড়ি কর্মীরা এসেছে। বাঁদর ব্র্যাণ্ড বিড়ির কর্মচারী নরেন বলল—সবাই তো এসেছে, এবার ধীরেন দা, আপনার বক্তব্য বলুন—সত্যি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা খুব দরকার ছিল।

স্পেশাল মতি বিড়ির বিশু বলল—আমি বহু দিন থেকে এর প্রয়োজন বোধ করছিলাম—

ধীর ও গম্ভীর গলায় বলতে সুরু করল ধীরেন্দ্রলাল—আমার প্রথম ও প্রধান বক্তব্য হচ্ছে, যে আমরা লোকের কাছে চিরকাল অবহেলিত। শুধু বিড়ি বাঁধি বলেই আমাদের কোন স্ট্যাটাস কেউ স্বীকার করতে চায় না। অথচ দেশে এখন হু হু করে বেকারী বাড়ছে। আমার মনে হয় দেশের বহু শিক্ষিত ছেলেকেই বাধ্য হয়ে আমাদের এই ব্যবসার লাইনে আসতে হবে—

থেমে থেমে যথাস্থানে স্বরাঘাত করে মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় বলে চলল ধীরেন্দ্রলাল—আমরা প্রায় সাড়ে চারশো বিড়ি কর্মী আছি এ শহরে। আমরা সকলে যদি এখানে ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করি তাহলে আমাদের দাবী-দাওয়া সুখ-দুঃখের কথা জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করতে পারবো। আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে মালিকরাও ভয় করবে। জনসাধারণও আমাদের শ্রদ্ধা করবে। কেউ পারবে না আমাদের অবহেলা করতে। বাড়তি মজুরী না দিয়ে মালিকরাও আমাদের অতিরিক্ত খাটতে বলতে পারবে না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ ধীরেনদার কথা ঠিক—চ্যাপা বিড়ির নিবারণ বলল—ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন দ্বিধা নেই। আজকালকার দিনে ইউনিয়ন না করলে কি কেউ পাত্তা দিতে চায়?

—আরে আলু-পটল মাছ বেচে যারা তাদেরও একটা ইউনিয়ন আছে। নেই শুধু বিড়ির—বলল বাঁদর ব্র্যাণ্ডের নরেন—কিন্তু, ভালো করে তলিয়ে ভেবে দেখলে মানতেই .হবে দরিদ্র মধ্যবিত্ত এবং দেশের জনসাধারণের বিশাল একটা অংশকে আমাদের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

—না, ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার আরও সার্থকতা আছে—বলল স্পেশাল মতির বিশু—ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হযে গেলেই লোকে আমাদের মর্য্যাদাকে স্বীকার করে নেবে। যেমন সেদিন মুদির দোকান কর্মচারী সমিতির সভাপতি নরহরি দাস ইউনিয়ন বোর্ডের ইলেকসানে জিতে গেলেন। লোকে তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে দিল। সবাই ভুলে গেল যে তিনি অত্যন্ত সাধারণ একটা মুদী—

—তুমি ঠিকই বলেছ বিশু।—বলল ধীরেন্দ্রলাল, বর্ত্তমান কালের দলীয় রাজনীতির একটা প্রধান 'ট্যাক্‌টিস' হচ্ছে ঐ ইউনিয়ন তৈরী করে শহরের প্রতিটি জনপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের লোক ঢোকাতে হবে।

—হ্যাঁ, তখন আর কেউ 'বিড়ি বাঁধা' বলতে সাহস করবে না।—বলল ঢ্যাপার নিবারণ—সবই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলবে,—কে?—না, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

নরেন বলল—ঐ ক্লাস এইট পড়া নাম্বু সেন, সেদিন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর হয়ে গেল স্রেফ গ্রুপের জোরে। আর আমরা দাঁড়াবো শুনলে লোকে হেসেই উড়িয়ে দেয়—

—ইউনিয়ন কর। নিজের গ্রুপ নিয়ে দাঁড়াও। কেউ হাসবে না। শ্রদ্ধা করবে—ভয়ও করবে। গম্ভীর হয়ে বলল ধীরেন্দ্রলাল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাহলে আমাদের ইউনিয়নের অফিস বেয়ারারস সব ঠিক হয়ে যাক—বলল নিবারন—ধীরেনদা আপনিই তাহলে সভাপতি হবেন তো প্রথমবার?

—না, না উনি সম্পাদক হবেন, বলল বিশু। আমাদের ওয়েল উইশার কোন একজন সম্ভ্রান্ত জনপ্রিয় লোককে সভাপতি করতে হবে।

—কেউ কি রাজী হবে?—বলল নরেন,—সবাই যে আমাদের ঘৃণা করে!

—কেন কামিনী গোঁসাইকে সভাপতি করা যাক না?—বলল ধীরেন্দ্রলাল—তোমাদের যদি কারো আপত্তি না থাকে। প্রথমতঃ তিনি বাস্তুত্যাগী এবং পাবনা কলোনীর বাস্তুত্যাগী সমিতির সভাপতি। দেশের জন্য বহুবার জেল খেটেছেন।

—বেশ—বেশ। ধীরেনদা যখন বলছেন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

—সম্পাদক আমি হবো না। মুখ নীচু করে বলল ধীরেন্দ্রলাল—ঢ্যাপার একনম্বর কারিগর নিবারণই হবে সম্পাদক। ও খুব পরিশ্রমী ও সৎ প্রকৃতির ছেলে। একটা গঠনমূলক কাজ করতে হলেই সব চেয়ে বড় প্রয়োজন সংযমী মন, কর্ত্তব্যে অফুরন্ত নিষ্ঠা। এসব গুণ নিবারণের আছে।

নিবারণের মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। লেখা হলো, কামিনী গোস্বামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি এবং প্রথম সম্পাদক চ্যাপার বিড়ির এক নম্বর কারিগর নিবারণ সরকার। উপস্থিত জনতার ভেতরে মৃদু গুঞ্জন উঠল। ধীরেন্দ্রলাল গম্ভীর গলায় হেঁকে বলল,—তোমরা কেউ কিছু বলবে?

চ্যাপার দুইনম্বর কারিগর শম্ভু কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—দেখ, দেখ, মুখফোঁড় ফাজিলটা উঠেছে। ফিস ফিসিয়ে বলল বিড়ি কারিগররা।

শম্ভু জ্বলন্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল—চুপ করে থাক সব। আগে শোন আমি কি বলছি—ধীরেন্দ্রলালকে লক্ষ্য করে বলল ধীরেনদা, আমরা মাস কাবারে মাইনের বদলে হাজার বিড়ি তৈরীর জন্য আড়াই টাকা করে চাই—

—লাও ঠ্যালা! ছেলে পেটের থেকে পডতেই তাঁর গোঁফ কামানোব জন্যে ব্লেড কেনা!—টিপ্পনী ছাড়ল লালু। ফটা তাকে ধমকে বলল—চুপ কর বাজে বকিস না।

বাঁদর ব্র্যাণ্ডের দুই নম্বর কারিগর টুলু বলল—মেলার বাজারে আমাদের বাড়তি পরিশ্রমের জন্য মজুরী চাই ধীরেনদা। স্পেশাল মতির শিবু বলল,—আরো একটা কথা আছে, আগুনের আঁচে বিড়ি স্যাঁকা আবাব বিড়িব পাতা কাটা, মশলা ভরে সুতো দিয়ে বাঁধা, লেবেল লাগানো, যাবতীয কাজ একজনকে দিযে করানো চলবে না। যে কোন ছোট দোকানের মালিকেব কাছে আমাদের দাবী, অন্তত দুটো কারিগর রাখতেই হবে—

—হবে—সব হবে। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ধীরেন্দ্রলাল—তোমরা তো আচ্ছা হে, এই তো কেবল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হলো। এখনও এক ঘন্টাই বয়স হয় নি। এখনই কি মুভমেণ্ট করতে সুরু করবে না কি?

সম্পাদক নিবারণ বলল—ছেলেমানুষ কি না, রক্ত গরম। আবে তোরা জানিস এক একটা দাবী আদায় করার জন্যে ইউনিয়নকে কতদিন এক নাগাড়ে লড়াই করতে হয়।

—আমাদের ইউনিয়ন তোমাদের মালিককে বলবে এই দাবীগুলোর কথা, বলল ধীরেন্দ্রলাল। ফটা, লালুর দিকে তাকিয়ে আবার বলল—কিরে এতগুলো সহকর্মী এল। বিড়ি ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হলো। তোরা এদের একটু মিষ্টি-মুখ করাবি না? যা তোদের দিদিকে বল—

ফটা দ্রুত পায়ে বাইরে যেতেই দেখল, আবছায়া অন্ধকার রাস্তার ওপর দিয়ে সাদা শাড়ী পরে কে যেন আসছে।

—কে ওখানে? হেঁকে উঠল ফটা।

তীক্ষ্ণ মিষ্টি গলার স্বর ভেসে এল—এই যে রে আমি! তুই শীগ্‌গীর আয় ফটা। আমি একা পারছি না—

ছুটে এল ফটা। পদ্মের হাতে চায়ের কেটলী, আরেক হাতে বিরাট একটা থালায় আলুর চপ্, ফুলুরি আর নারকেলের নাড়ু। নরম গলায় বলল—তুই এগুলো নিয়ে যা ফটা। আমি আর যাবো না—

—তুমি এত সব করতে গেলে কেন পদ্মদি?—শুধু চা করলেই পারতে—

—বলিস কি রে। শহরের সমস্ত বিড়ি কর্মচারীরা এসেছে আমার দোকানে। পদ্ম মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বলল—আমার এইখানেই প্রথম ইউনিয়নের মিটিং হলো। আজ আমার কত আনন্দের দিন—

ফটার চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল। বলল—দেখ পদ্মদি, আমার তো মনে হচ্ছে এই ইউনিয়ন তৈরীর আড়ালে ধীরেনদার কোন মতলব আছে। হয়তো ইলেকশনের জন্য একটা দলকে—

নির্জন রাস্তাটা কাঁপিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল পদ্ম—ইলেকশানের দল কি রে? বিড়ি কর্মচারীদের সুখদুঃখ আখের নিয়ে আলোচনা করার জন্যই তো ইউনিয়ন করা হলো—

—তুমি দেখ, ঠিক ধীরেনদা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে দাঁড়াবে আর আমাদের প্রত্যেকটি বিড়ি-শ্রমিককে তার জন্য ভোট ক্যানভ্যাস করতে হবে—

—তা-ই যদি হয়, সেটাও ত ভাল। আমাদের ভেতর থেকে উনি যদি

উন্নতি করতে পারেন, মিউনিসিপ্যালিটির একটা হোমরাচোমরা হতে পারেন, তাহলে আমাদের অনেক উপকারও হবে ফটা। তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা আনন্দের বিদ্যুৎ পদ্মের সারা মুখে ঝকমক করে উঠল।

—দেখ, তুমি যা ভাল বুঝবে, করবে। আমার ত মনে হয, দোকানের ক্ষতি হবে—

ফটা চা আর খাবার নিযে দোকানে চলে গেল।

ন্যাদোন এসে দাঁড়াল। বলল—দিদি, বাজারে জোর গুজব শুনে এলাম, ধীরেনদা না কি মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে দাঁড়াচ্ছেন। প্রচুর টাকা খরচ করতে হয় এসব ইলেকশানে। আগে থেকে তোকে হুঁশিযাষ ক'রে দিচ্ছি, তুই কিন্তু একপয়সা খরচ করতে পারবি না—

—আমার টাকা আছে কোথায় বল? তিনি যদি দাঁড়ান, তাহলে তাঁর জনপ্রিযতার জোরেই ইলেকশানে জযী হবেন।

—তুই জানিস না দিদি, কী সাংঘাতিক লোক ঐ ধীরেনদা। চারিদিকে জাল মেলে দিযে চলেছেন। প্রত্যেকটা কলোনীর সব বিফিউজিকে হাত করেছেন। বিড়ি কর্মচারীদেব তো কথাই নেই—

কিন্তু ন্যাদোনের কথা যেন শুনতেই পেল না পদ্ম। সে বলল—বাড়ীতে চল। তোর সঙ্গে কথা আছে—

দুজনে নিঃশব্দে ঢাকা কলোনীব দিকে চলল। রাস্তার পাশে ফাঁকা মাঠে বাতাস আর্তনাদ করছে। তীক্ষ্ণ অস্বস্তিতে ছিঁড়ে যাচ্ছে ন্যাদোনের হৃৎপিণ্ডটা। মনের ভেতরের গূঢ়কথা তার বুকের ভেতবে মাথা কুটতে লাগল। বলল—দিদি, পুঁটিকে নিয়ে যে কি করবো, ভেবে পাচ্ছি না—

—কেন, টাকা পযসা দিয়ে তাকে সাহায্য তো কবছিস!—বিরক্ত হয়ে বলল পদ্ম—আবার তার সম্বন্ধে কি ভাবছিস?

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে ন্যাদোনের। চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে। চাপা গলায় সে বলল—পুঁটির মামা-মামী ওর ওপরে খুব অত্যাচার করছে দিদি। এত কষ্ট দেয় ওকে!

—কি করবি বল? অনুশোচনায় মেদুর হয়ে ওঠে পদ্মের চোখের দৃষ্টি, বলে—মেয়েমানুষের দুঃখের শেষ নেই। মেয়ে হয়ে জন্মালেই—

—আমি ওকে বিয়ে করবো দিদি।—ভীতগলায় ন্যাদোন বলল—তুই আপত্তি করিস না। আমি তাকে কথা দিয়েছি—

—কথা দিয়েছিস!

চমকে উঠল পদ্মের চোখের দৃষ্টি! তুই একটা অপদার্থ! একবারও ভাবলি না, নিজে একপয়সা রোজগার করিস না—

—রোজগার ঠিক করতে পারবো—

—কিন্তু তুই যে একটা বেকার! পেটের চিন্তা না করে তোর মনের ভেতরে ভালবাসার কথা এল কি করে?—মৃদু গলায় পদ্ম বলল—একটা গরীব বিয়ে না হওয়া মেয়েকে ঘর-বর-বিয়ের কথা বললে তার কি মনের অবস্থা হয়, চিন্তা করে কখনো দেখেছিস?

—ওর কষ্ট দেখলে যে আমার মাথাটা কেমন হয়ে যায় দিদি।

হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া এল। হাওয়ার ঝাপটে মর্মরিত হয়ে উঠল রাস্তার পাশে যজ্ঞিডুমুর গাছের লম্বা লম্বা পাতাগুলো। রাস্তার মুখে উঁচু হয়ে ওঠা রাশি রাশি খোয়ার ওপরে যেন একটা অলৌকিক ছায়া কেঁপে উঠল থরথরিয়ে। কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতই পদ্ম বলল—দেখি, দোকানটা যদি একটু ভাল করে দাঁড়ায়, তাহলে কোন ব্যবস্থা করবো—

দশ ॥

ঢাকা কলোনী আর পাবনা কলোনীর মাঝখানে ঝাপড়া বেলগাছের ডালে ডালে ঝলমল করছে রাশি রাশি নতুন পাতা। দূরে ইসলামপুরের রাস্তার ধারে শিমূল পলাশের বনে যেন আগুন ধরে গেছে। বেলগাছটার উঁচু ডালে বসে উল্লাসে ডাকছে কোন বসন্ত পাখী।

আত্রাই নদীর খাল থেকে স্নান করে কলসীতে জল ভরে নিয়ে সুধা

বাড়ী ফিরল। তার কোঁকড়ানো চুল বেয়ে মুক্তো বিন্দুর মত জল ঝরছে। ভিজে শাড়ির আড়ালে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাইশ বছরের নিটোল স্বাস্থ্যপুষ্ট যৌবন। বড় ঘরের বারান্দায় বসে বেতো পায়ে তেল মালিশ করতে করতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল। দুবেলা আধপেটা খেয়ে-না-খেয়েও এত অপর্য্যাপ্ত স্বাস্থ্যের লাবণ্য ওর দেহে আসে কি করে। গরীবের ঘরের অন্ধকার কোণে দীপালির মত এই যৌবন দুঃখ দুর্দিনেব ঝড়ের সঙ্গে দিনের পর দিন পাল্লা দিয়ে একসময়ে নিভে যাবে। কোনদিনই সংসারের স্নেহ মায়া মমতার স্নিগ্ধ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠবে না। বুকটা ভারী হয়ে ওঠে হেমাঙ্গিনীর। রোদ-জ্বলা ধূসর আকাশটাব কোথায় কোন কোণে ক্ষ্যাপাটে ঐ বিধাতাটা বাস করছে তাকে তাব বলতে ইচ্ছে করে—ভগবান, দুবেলা ত পেট ভরে খেতে দাও না। টাকা পয়সা সম্মান—কিছুই তুমি দাও না। তবুও কাঙালের ঘরের মেযেব শরীর ছাপিয়ে যৌবন কেন দাও?

—মা, আমি আজ বিকেলে মণিমেলায় যাবো।—প্রসাধন সেরে সদ্যধোয়া একটা অপরাজিতার মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুধা।

—না। আজ বিকেলে রণু আসবে। তুই গেলে চলবে কেমন করে? বিস্মিত হযে হেমাঙ্গিনী প্রতিবাদ জানাল।

—আমি তিনরাত জেগে ন্যাকড়ার পুতুল তৈরী করেছি মা। বিক্রী হবে নিশ্চয়ই। মেলায় আমি যাবই।—কঠিন গলায় সুধা বলল।

হেমাঙ্গিনীর ডান-পায়ের বাতের ব্যথাটা কন কন করে উঠল। তীব্র যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত করে বলল—এই যে পরশুদিন রণু আমাকে এক জোড়া থান কাপড দিয়ে গেল। বড একটা ইলিশ মাছ কিনে আনল। এসব কি সে আমার মত একটা বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে করে?

—তুমি আবাব ওর কাছে থেকে কাপড় নিয়েছো!

মায়ের মুখের দিকে ভৎর্সনাতীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল সুধা। ফাল্গুনের রোদে স্নান করা রক্তপদ্মের মত মুখখানায় কে যেন কালি

মেড়ে দিল। তার দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ যেন থেমে গেছে। চাপা গলায় বলল,—একটা মাতালকে তুমি এত প্রশ্রয় দিচ্ছ মা। তুমি যা ভাবছো, আমার প্রাণ থাকতে তা হতে দেব না। ঝড়ের বেগে তার ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ল বিছানার ওপরে। দুপুরের বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে গেল তার চাপা কান্নার বিলীয়মান শব্দ।

হেমাঙ্গিনী চেঁচিয়ে বলল,—যত পারিস, কেঁদে নে। তুই কি ভেবেছিস ওই হা-ঘরে হাভাতে ফটা তোকে বিয়ে করবে? হারামজাদী প্রেম করে বিয়ে করবে!

বেতো পা নিয়ে হেমাঙ্গিনী টলতে টলতে রান্না ঘরের দিকে গেল। আজ বিকেলে গঙ্গারামপুর রুটের মোটর ড্রাইভার রণু আসবে। ছেলেটার মাথার ওপরে কেউ নেই, সুধার সঙ্গে মানাবেও বেশ। কিন্তু হঠাৎ একটা আশঙ্কা তার বুকে চেপে বসল। ভালো করে বললে অবশ্য রণু ওকে এখুনি বিয়ে করবে। আর বিয়ে দিলেই তো মেয়ে-জামাই তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। লালু তো একটা পয়সা দেয় না। সুধাকে বিয়ে করার আশায় রণু তাকে দুহাতে দিচ্ছে। টাকা, কাপড়—আরও কত কি! সে জানে পাবনা কলোনীর সকলের মন হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে। ফিসফাস কথা আর চাপা হাসির গুঞ্জনও সুরু হয়েছে। হোক। তার জানতে বাকী নেই কারো হাঁড়ীর খবর। ঐ তো সুরেনের বোন দুলির সঙ্গে সন্ধ্যের সময় ডাঙীর কালভার্টের ওপর বসে আড্ডা দেয় ঢাকা কলোনীর তিন-চারটে ছোঁড়া। আর দুলির পরনে নিত্যি নতুন শাড়ি ঝলমল করে। কানে দুল দোলে। আর সে মেয়ে কথা বলার আগেই হেসে হেসে ভেঙ্গে পড়ে। অথচ ওর বাবা পুলিন মুখুয্যে ত কাছারীর বটতলায় বসে দলিল লেখে। দুলির ছোট ভাইগুলো ছেঁড়া প্যান্ট পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। আর হরির মা-র গোটা সংসারই তো চলছে হরির তিনটে ভরা বয়সের বোন আছে বলেই।…বেলা বাড়ল। চঞ্চল হয়ে উঠল হেমাঙ্গিনী, রণুর জন্য ভাল করে রান্না করতে হবে। গলদা চিংড়ি আনাতে হবে। বাজারে লোক পাঠাতে হয়।

বেলাশেষের রোদের রঙ গেরুয়া হলো। জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের কোণে কোণে বিকেলের বিষণ্ণ কোমল অন্ধকার জমেছে। বিচিত্র একটা বাজনার ঐক্যতান শোনা গেল দোকানের দিক থেকে। আর ভাঙ্গা রেকর্ডের ঘ্যাসঘেসে আওয়াজের মত একটা গানের শব্দের রেশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গত করছে তবলার তেরে-কেটে। গান আর বাজনার ঐক্যতান আরো প্রবল হয়ে উঠল। হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সেই উচ্চণ্ড সঙ্গীত। ফটা বলল—সেই নতুন গানটা ধর।

লালু খসখসে গলায গান ধরল—

এ্যায় দুনিয়া দেবে দোহাই ঝুটা পাওন্দী শোর
আপনে দিলতোঁ পুছকে রোখ কোন নহীও চোর।

ঠোঁটে আর জিভে বিচিত্র একটা শব্দ করে তাল রেখে তবলা বাজিযে চলল লালু। দোকানের পাশেই বসে পদ্ম পেঁয়াজী বিক্রী করতে করতে চেঁচিয়ে বলল—এই কি হচ্ছে রে! কাজ ফাঁকি দিযে গান বাজনা কবছিস। সে এসে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে—

লালু আর ফটা যেন তার কথা শুনতেই পেল না।

ফ্যাক্টরী ঘরের দেয়ালে টাঙানো সিনেমা অভিনেত্রীর রঙীন ছবির দিকে তাকিয়ে কানে হাত দিয়ে আবেশে চোখদুটো আধবোঁজা করে গেযে চলল লালু। হঠাৎ তার গান থেমে গেল। মুগ্ধ, অপলক দুটো চোখে ছবির সেই সুন্দরী চিত্রতারকার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পাতলা ডালিমের দানার মত দুটো ঠোঁটে আর ঘন কালো টো চোখে হাসি হাসি সরলতা। লালুর চোখে বিষন্ন বেদনার ছায়া নামল। বলল—এত সুন্দরী মেযে মাইরী, এ শহরে আমি তো দেখিনি—

সে চোখ দুটো পুঞ্জিত করে তাকিয়ে বইল ছায়াছবির জগতেব সেই মেয়েটির মুখের দিকে। বলল—ফটা এরকম একটা মেয়ে বিযে করতে পারলে—

—ছেঁড়া কাঁথায় শুযে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা আর কি! মুখ বিকৃত করে

গোঁফটা খুটে খুঁটে বলল ফটা—আরে ঐ সুন্দরী মেয়ের কথা ছেড়ে দে। একটা বুঁচী কি খোঁড়া মেয়েই বিয়ে কর না দেখি, তোর মুরোদ।

—হ্যাঁ, ঘরে আছে বাইশ বছরের ধাড়ী বোন। তার গা গতরে বয়সের ঢল নেমেছে—চিন্তার কালো ছায়া নেমে এল লালুর চোখে।

—অতবড় বোনকে জীইয়ে রেখে তুমি তো নয়ালী যৌবনী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারো না—

—কত খোঁজা যে খুঁজছি সুধার জন্যে একটা যেমন-তেমন রোজগেরে ছেলে।

—কেন? গঙ্গারামপুরের মোটর ড্রাইভার রণুর সঙ্গে না কি তোর বোনের বিয়ে দিবি ঠিক করেছিস?

—মা-র তাই ইচ্ছে। কিন্তু শালা যে বেজায় মদ খায়। কালকেই রাত্রে দেখি পুলের নীচে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আর গ্যাঙড়ানো গলায় গান গাইছে, দে মা আমায় তবিলদারী…

হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ল ফটা। বলল,—শালা আচ্ছা গান ধরেছিল তো? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বেদনাছোঁয়া নরম গলায় বলল ফটা—না-না লালু, বিয়ে না হয়, না হবে। মাতালের সঙ্গে সুধার বিয়ে দিস না। ও বড় কষ্ট পাবে রে!

—আমার আর বিয়ে করতে হবে না।—কাতর কান্নার মত শোনালো লালুর গলা।—শুধুই কি একটা বোন। ছোট ছোট দুটো ভাই, বুড়ী মা, সমস্ত সংসারটা যেন ভারী পাথরের মত বুকে চেপে বসে থাকে মাইরী—

—আমারও তোরই মত অবস্থা! অনুর বিয়ে যে কেমন করে দেব? কারবাইডের গ্যাসের আলোয় ভরা ফ্যাক্টরী ঘরের বাঁশের মাচার ওপরে দুটো দারিদ্র্যজীর্ণ যুবকের চারটে অসহায় চোখে বিবর্ণ একটা ব্যথার ছায়া নামল। বাঁশের খুঁটিটার ফোকর থেকে বেরিয়ে একটা ভোমরা ভ-র-র—শব্দে উড়ে চলল। অদূরে সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে এল পদ্মের তীক্ষ্ণ গলার স্বর—আসুন—গরম পেঁয়াজী, দুপয়সায় ছয়টা—

দেশী মদের দোকানের দিক থেকে উৎকট হল্লার আওয়াজ আর বাজারের হিন্দুস্থানী ডালওয়ালাদের গানের এক বিচিত্র শব্দের তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগল বস্তীর রাস্তার চারিদিকে। কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত। দুটো জোয়ান বুকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা যেন তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলেছে। নীচু গলায় লালু বলল—ফটা, পদ্মদিকে বল না, আমাদের মাইনে কি বাড়াবে না? এখন তো দোকানে লাভ হচ্ছে প্রচুর—

—আমি ভাই বলতে পারবো না। তুই বলিস। এমনি প্রায়ই তো খাওয়ায়। নিজের মায়ের পেটের দিদির মত ব্যবহার করে—

—আহা, মিষ্টি ব্যবহার দিয়ে তো আর পেট ভরবে না। ওদিকে যে দেখছি, আমাদের ঐ জেলখাটা কর্মকর্তাটির জন্যে দিদির দরদ উথলে উঠছে—

—এই এত গল্প হচ্ছে কেন রে? হেঁড়ে গলার তীব্র একটা চিৎকার আছড়ে পড়ল ফ্যাক্টরী ঘরের দরজায়। বাঁক খাওয়া নদীর মতই ধীরেন্দ্রলালের দোমড়ানো মুখখানা রাগে কঠিন হয়ে উঠেছে। গলা চিরে আবার চেঁচিয়ে উঠল সে—সারা দুপুরে কয় বাণ্ডিল বিড়ি তৈরী হয়েছে শুনি?

—চল্লিশ বাণ্ডিল—ফটা বলল।

ধীরেন্দ্রলালের মুখের রেখাগুলো আরো কুটিল হয়ে উঠল। কর্কশ গলাটা আরো এক পর্দায় উঠিয়ে বলল—আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। তোরা কি নেমকহারাম বল তো। যার নুন খাচ্ছিস, তার কাজেই ফাঁকি দিচ্ছিস!

—মাটির ঘরের মেঝেয় বিড়ির পাতা ছিল বলে স্যাঁত সেঁতে হয়ে গিয়েছিল ধীরেনদা। আগুনে সেঁকে নিতে হয়েছিল—

—কৈফিয়ৎ ইচ্ছে করলে অনেক দেওয়া যায়।—মেঝের ওপরে, স্তূপীকৃত কাঁচা বিড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ধীরেন্দ্রলাল—গঙ্গারামপুরের পাইকার এসেছিল?

—হ্যাঁ। দুশো বাণ্ডিল নিয়ে গেছে।

—হিলির?

—হ্যাঁ। দেড়শো বাণ্ডিল নিয়ে গেছে।

—আর পতিরামের পাইকার নালিশ জানিয়েছে কেন, যে বেশীর ভাগ বিড়িতে মশলা নেই, কোনটা ভাল করে বাঁধা নেই—

—তা হতে পারে না ধীরেনদা। আমরা খুব যত্ন করে—

—ফের মুখে মুখে কথা। ধীরেন্দ্রলালের চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে বলল—আমি তোমাদের শেষবারের মত জানিয়ে দিচ্ছি, ফাঁকি দিলে এখানে চাকরী করা চলবে না।

কোন কথা বলল না ফটা আর লালু—দুটো অসহায় জানোয়ারের মত তাকিয়ে রইল ধীরেন্দ্রলালের জ্বলন্ত চোখদুটোর দিকে। চেঁচিয়ে উঠল ধীরেন্দ্রলাল—হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিস কি? কাজ কর।

সঙ্গে সঙ্গে দুজোড়া হাতের আঙুলে চঞ্চলতা জাগল। মাথা নীচু করে কাঁচির কুচ কুচ শব্দ তুলে বিড়ির পাতা কেটে চলল ফটা। আর লালু বিড়ির পাতায় মশলা ছড়িয়ে সেটাকে পেঁচিয়ে কাঁচির মুখ দিয়ে ঠেসে-ঠেসে মশলা ভরিয়ে দিতে লাগল। ধীরেন্দ্রলাল তীব্র মনোযোগে ভ্রূ কুঞ্চিত করে খেরো বাঁধা লম্বা লাল খাতায় হিসেব লিখতে শুরু করল।

হঠাৎ বাঁদর ব্র্যাণ্ড বিড়ির কর্মচারী টুলু এল। বলল—আমাদের দোকানে নিবারণদা, নরেনদা, বিশুদা সবাই এসেছে, আপনাকে ডাকছে—

—সবাই এসে পড়েছে! আচ্ছা আমি যাচ্ছি। ফটার বিষণ্ন গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ধীরেন্দ্রলাল—কি রে ফটা তুই রাগ করলি না কি?

কোন কথা বলল না ফটা। নরম মৃদু গলায় আবার বলল ধীরেন্দ্রলাল—দেখ তোদের একান্ত নিজের মত ভাবি বলেই এত কথা বলি!

তার চোখের দৃষ্টি গম্ভীর হয়ে উঠল। পবিত্র কোন মন্ত্রোচ্চারণের মত করে বলল—জীবনে উন্নতি করতে হলে সংযম আর নিষ্ঠা চাই বুঝলি! যত ছোট কাজই করি না কেন, নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে—

—না, না ধীরেনদা আমরা কিছু মনে করি নি—। বলল ফটা—গাল মন্দ খাওয়া আমাদের অভ্যেস আছে।

—তোদের সুখবর দিচ্ছি একটা। কাল থেকে দোকান সাত দিন বন্ধ থাকবে।

—বন্ধ থাকবে! কেন?

—বন্ধের সময়ের পুরো মাইনেই পাবি তোরা। মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে তোদের ক্যানভ্যাস করতে হবে—

—কার জন্যে ক্যানভ্যাস করতে হবে?

—আমার জন্যে।—নিজের বুকের দিকে তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে হাসি হাসি মুখে বলল ধীরেন্দ্রলাল—বিড়ি ইউনিয়নের সকলের অনুরোধেই আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। পদ্ম আর মহিলা সমিতির নীরদা, আমাদের দেশের মেয়ে। এই দুজনকে পাঠাবো বিভিন্ন কলোনীর মেয়েদের ভেতর। সমস্ত বিড়ি কর্মচারীদের পাঠাবো শহরের নানা দিকে। আমি নিজে ঘুরবো সহরের বাড়ীতে বাড়ীতে। কি বলিস, পারবো না?—আবেগে উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ধীরেন্দ্রলাল,—বিড়ি কর্মীরা গা দিয়ে খাটবে। সমস্ত রিফিউজিরা সমর্থন করবে—

—আপনি নিশ্চয়ই পারবেন ধীরেনদা। বলল ফটা।

—দেখা যাক। দূরে অন্ধকারে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল ধীরেন্দ্রলাল। আলোকোজ্জ্বল একটা ভবিষ্যতের স্বপ্ন তার চোখে ঝকমক করে উঠল। হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে বলল—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, ইলেকশনেরই মিটিং, বুঝলি। ক্যাশ মিলিয়ে রেখেছি। তোরা চাবী বন্ধ করে চলে যাস—

চোখের পলকে রাত্রির অতলান্ত অন্ধকারে মিশে গেল ধীরেন্দ্রলাল। ফটা এবার টুলুর চকচকে জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে বলল—নতুন জুতো কবে কিনলি রে? গায়েও হাওয়াই শার্ট দেখছি। কী ব্যাপার?

—বাঁদর ব্র্যাণ্ড কোম্পানী মাইনে বাড়িয়েছে না কি রে তোদের। লালু বলল।

—কিসের মাইনে বাড়িয়েছে? লম্বা লম্বা চুলগুলো এক ঝাঁকি দিয়ে পেছনে নিয়ে বলল টুলু—তোরাও যেমন! ফটার কানে কানে ফিসফিসিয়ে

বলল কতগুলো কথা। ফটার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। বলল—বলিস কি রে! তোর মালিক টের পায় না?

বাজপাখীর মত ঝাঁপিয়ে এল লালু। বলল—টুলু আমাকে বলবি না ভাই! ফটার কানে কানে তুই কি বললি?

—উঁহু, তুই ছেলেমানুষ। তোর পেটে কথা থাকবে না।

ফটা বলল—প্রতি রাতে কত লাভ হয়?

—একেবারে ডবল লাভ।

—ওঃ বুঝতে পেরেছি! লালুর চোখদুটো উত্তেজনায় আবেগে জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল—টুলু তুই নিশ্চয়ই পাকিস্থানে বিড়ির পাতা চালান করছিস!

—চুপ! ঠোঁটে আঙল ঠেকিয়ে চোখদুটো বিস্ফারিত করে টুলু বলল—একথা যেন পাঁচ কান না হয়! ফটার দিকে তাকিয়ে বলল—তোরা যাবি আজ রাতে?

—না, না ভাই, পদ্মদির সঙ্গে অধর্ম করতে পারবো না—

—দেখ, মালিকরা আমাদের মাইনে কোনদিনই বাড়াবে না—চিবিয়ে চিবিয়ে বলল টুলু—আমাদের বাঁচতে হবে তো। কত সহজে আর কম সময়ে রোজগার করা যায়।

—পকেটে করে কিছু বিড়ির পাতা নিয়ে এক দৌড়ে মরা শকুনীর খালের ওপারে পাকিস্থানের মহাজনের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই ব্যস। চলে এল হাতে করকরে নোট!

কথা বলতে বলতে বিপুল উল্লাসে টুলুর চোখের তারাদুটো ছটফট করে উঠল।

—আমি যাবো টুলু। তুই কখন যাবি বল?

—না, পদ্মদির দোকানের বিড়ির পাতা নিয়ে তোমাকে যেতে দেব না। কঠোর গলায় ফটা বলল—যেতে হয় বিড়ির পাতা জোগাড় করে নিয়ে স্মাগলিং কর—

হতাশ হয়ে গেল টুলু ও লালু। তীব্র বিরক্তিতে জ্বলে উঠে লালু বলল—

তুই শালা, কেবল শ্মশানের ঐ পাগলা সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে হাতই দেখা। তাহলেই টাকা আসবে। আহাম্মক কোথাকার! ওদিকে ধীরেন্দ্রলাল যে—

ফটা বলল—যে যা খুসী করুক লালু—আমাদের ধর্ম, আমাদের কাছে।

টুলু বলল—তোরা তাহলে যাবি না?

—না। দাঁতের ফাঁকে কঠিন শপথ উচ্চারণ করল ফটা। বাইরের তরঙ্গায়িত অন্ধকারে একটা সরীসৃপের মত মিলিয়ে গেল টুলু।

—লালু, ফটা, তোরা একটু শীগগীর বাইরে আয় ভাই!

ন্যাদোনের আর্ত্ত চীৎকারে শিউরে উঠল রাত্রিটা। ছুটে বাইরে এল ফটা। লালু চেঁচিয়ে বলল—কি হয়েছে রে ন্যাদোন, থিয়েটারে মেডেল পেয়েছিস না কী?

ন্যাদোনের আড়ালে তরল অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট সাদা মূর্তির মত একজনের দিকে তাকিয়ে তারা চমকে উঠল। বলল—কে রে তোর সঙ্গে? ফরিদপুর কলোনীর পুঁটি না কী!

উত্তেজিত ভীত ন্যাদোন লালুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে আকুল গলায় বলল—ভাই, তোরা একটু সাহায্য কর। আমি তো সাহস পাচ্ছি না—

—তুই ওকে এত রাত্রে নিয়ে এসেছিস কেন?

—তাই তো বলছি। হাঁফাতে হাঁফাতে ন্যাদোন বলল—রিহার্সেল শেষ করে ওদের বাড়ীর পাশ দিয়ে আসছিলাম। পুঁটির চীৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালাম। পাগলের মত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গেলাম ওদের বাড়ীর ভেতরে। গিয়ে দেখি, ওর মামা ওর একটা হাত ধরেছে শক্ত করে, আর ওর আফিংখোর মামীটা একটা চেলা দিয়ে বেদম মারছে। কাটা পাঁঠার মত উঠোনের ধুলোয় শুয়ে কাতরাচ্ছে পুঁটি—

—তুই কি করলি?

—আমার ভাই মাথার ভেতরটা যেন কেমন হয়ে গেল। আমি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ দুটোর হাত থেকে পুঁটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম,—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। ওকে বিয়ে করবো—

—বাঃ রে বাহাত্বর ছোকরা! বলল ফটা—পদ্মদির কাছে নিয়ে যা ওকে। খুব ভাল করেছিস তুই।

—তোরা একটু চল না ভাই আমার সঙ্গে। পুঁটির কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। কি করবো বল?

—বিড়ি বাঁধলে তোর মানের হানি হয়। লালু বলল—তুই যে বিয়ে করবি, খাওয়াবি কি ওকে?

হ্যাদোনের চোখে জলের ছায়া পড়ল। বলল—বিয়ে, বৌকে খাওয়ানো, ওসব পরের কথা। রাতের মত একটা আশ্রয় তো চাই!

—তুই যখন নিয়ে এলি পুঁটিকে। ওর মামা-মামী কি বলল?

—কি আর বলবে? ওর ডাইনী মামীটার চোখত্বটো জ্বলে উঠল। বলল—নিয়ে যাও। আর এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় যেন ঐ হারামজাদীকে না দেখি।

—আর ওর মামা?

—ওর মামা বিড়িতে একটা টান দিয়ে বলল—তুমি না নিলে কে নেবে? ডাঙ্গীর রাস্তার কালভার্টের ওপরে বসে কম ঢলাঢলি করেছো তোমরা? তুমি ছাড়া ওর কোন গতি আছে?

—বেশ, তাহলে এখন পদ্মদির কাছে চল। বলল ফটা।

—আমার ভাই ভীষণ ভয় করছে! অসহায় করুণ গলায় বলল হ্যাদোন। —আমার দিদি এসব মোটেই ত্বচোখে দেখতে পারে না—

—খুব ছেলে তো তুই!—বলল লালু—বীরপুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে ত্বটো ত্বযমনের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারলি আর নিজের দিদির কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারছিস না?

—চল। আমরা যাচ্ছি—বলেই উত্তেজিত কম্পিত হ্যাদোনের পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে বসল ফটা।

তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট গলায় পুঁটি বলল—ও ভয় পাচ্ছে, আমি ওদের বাড়ী যাবো না। আমার নিজের পথ আমি নিজে দেখে নিতে পারবো।

দূরে রাস্তার আলোগুলোর দিকে শূন্য, নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল। হ্যাদোনের মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। দৃঢ়, নিশ্চিত গলায় ফটা বলল—না, না, রাগ করো না পুঁটি। হ্যাদোন ওর দিদিকে চেনে না। আমরা তাঁকে জানি। তুমি আমার সঙ্গে এস। আয় হ্যাদোন—

মাঝখানে পুঁটিকে নিয়ে ফটা হ্যাদোন আর লালু আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে ঢাকা কলোনীর দিকে চলল।

॥ এগারো ॥

পদ্ম রান্নাঘরের উনানে ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিয়ে গুন গুন করে গান করছিল। ফুটন্ত ভাতের দিকে তাকিয়ে তার মন একটা মোহন বাসনায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল। ধীরেন্দ্রলালের প্রদীপ্ত চোখদুটো তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল। তার কানের কাছে সারেঙ্গীর সুরের মত বেজে উঠল তার গম্‌গমে গলার স্বর—পদ্ম, জীবনে মর্য্যাদা চাই, প্রতিষ্ঠা চাই।···কত নির্জন দুপুরে, ঘুম না আসা রাতে সে ভেবেছে, চারিদিকে দুর্ভেদ্য একটা প্রাচীর তুলে ঘিরে রাখবে নিজেকে। ধীরেন্দ্রলালের মিষ্টি হাসি মাখা স্নিগ্ধ কথাগুলোকে নিদারুণ উপেক্ষায় কান দেয় নি সে। মনে পড়েছে মুমূর্ষু মায়ের সেই করুণ কাতরোক্তি। সেই ভয়াবহ দুঃস্মৃতি আড়ষ্ট করে দিয়েছে তার হৃদস্পন্দন। তার যৌবনের রক্তে নেমেছে তীব্র হিমপ্রবাহ। মন বলেছে,—না, না, বিশ্বাস করো না পুরুষের ভালবাসায়। কিন্তু এক একটা করে পাপড়ি ঝরার মত দিন কেটেছে। মাসের পর মাস কেটে গিয়ে, বছরও প্রায় ঘুরে এল। কুড়ি টাকা লাভের বিড়ির দোকানে বসে মাসে দুশো টাকা লাভ করে টাকা গুনে গুনে হাতে তুলে দিয়েছে ধীরেন্দ্রলাল প্রতি মাসে।

বর্ষা নেই শীত নেই। একটা বুনো ঘোড়ার মত জেলার গঞ্জে গঞ্জে, হাটে

হাটে ঘুরে 'জিন্দাবাদ' বিড়ির চাহিদা বাড়িয়েছে। তার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না, ধীরেন্দ্রলালের রক্তে রক্তে এই অনুপ্রেরণা দাবদাহের মত জ্বলছে কেন? কেন তার এই পোড়া কালো চেহারার দিকে তাকিয়ে ওর চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে আসে! না, তার আঠাশ বছরের রক্তে সেই চিরন্তন কামনার বন্যাকে সে কেমন করে বাধা দেবে! তার ধু ধু নিস্তৃন জীবনে স্নিগ্ধ সবুজের আঁচড় ফেলেছে ধীরেন্দ্রলালের নিবিড় কবোষ্ণ প্রেম। তার জীবনের প্রথম প্রেম। অপরূপ এক নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার চেতনা। অজস্র আশা আর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, প্রেম আর প্রীতির পত্রসম্ভারে পরিপাটি একটা নীড়, অভাব অনটন ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি স্বামীর ভালবাসা, শিশুদের কলকণ্ঠ—নিটোল, নিভাঁজ একটা ছবির মোহ ঘনিয়ে আসছে তার রক্তে। ধীরেন্দ্রলাল। মধুর একটা সুরের অপরূপ মূর্চ্ছনার মত কানের কাছে বাজতে থাকে নামটা। কিন্তু—কিন্তু সেই নিদারুণ তীব্র আশঙ্কাটা তার সেই মধুর স্বপ্নের ছবির ওপরে কালি মেড়ে দেয়। পোড়া ভাতের উৎকট গন্ধ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। চমকে ওঠে পদ্ম। দ্রুত হাতে খুন্তি দিয়ে ভাত ঘাঁটতে সুরু করে।

—পদ্মদি। শীগগীর বাইরে এস—বাইরে হাওয়ায় ভেসে উঠল একটা তীব্র চীৎকার। গনগনে উনান থেকে সশব্দে ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পদ্ম—কে রে ফটা না কি? ভেতরে আয় না?

ফটা, লালু আর ন্যাদোন উঠোনে এসে দাঁড়াল। চারটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ছে। পদ্ম বিস্মিত হয়ে বলল—তোদের পিছনে ও কে রে! কেরাসিনের ডিবে হাতে নিয়ে ত্রস্ত, উত্তেজিত পায়ে ছুটে এল পদ্ম। কেরাসিনের ধোঁয়াওঠা আলোটা পুটির মুখের কাছে ধরতেই সে চমকে উঠল। হিম হয়ে গেল তার বুকের রক্ত।—এ কী পুটি যে! নিশ্চয়ই ন্যাদোনের হাত ধরে চিরকালের মত বেরিয়ে এসেছিস!

—পদ্মদি, তুমি ওকে আশ্রয় দাও, ফটা বলল।

ম্লান আলোয় পুঁটির জলভরা চোখদুটো চিক চিক করে উঠল। যেন অসহ্য একটা তীব্র আগুনের হলকায় জ্বলে পুড়ে চিৎকার করে উঠল পদ্ম—এ কী রে

তুই কি করেছিস! এমনিই তিনটে মানুষের খোরাকী জোটাতে পারি না। তার ওপরে গুণধর বেকার ভাই ঘাড়ে করে বৌ নিয়ে এল!

রেগে দুপদাপ করে পা ফেলে পদ্ম বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অপমানের জ্বালায় চোখ ফেটে জল এল পুঁটির। আর তিনটে জোয়ান বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলেছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। দূর থেকে একটা দমকা হাওয়া এল। উঠোনের মিছরী ভোগ আমগাছের পাতায় পাতায় বাতাসের কান্না বাজল। প্রতিটি মুহূর্তকে যেন এক একটা দীর্ঘ যুগ মনে হচ্ছে ন্যাদোনের। তার মনে হল, হয়তো দিদি ধীরেনদাকে ডাকতে গেছে, হয়তো তাকে ঘাড় ধরে রাস্তায় নামিয়ে দেবে। উঠোনের এক কোণ থেকে একটা ঘন থকথকে অন্ধকারই যেন বলে উঠল—এদিকে আয় ন্যাদোন।—কেরাসিনের ডিবের ছায়াকাঁপা আলোয় দেখা গেল, পদ্মের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। পদ্মের সঙ্গে এসেছে, তাদের পাশের বাড়ীর রবির মা, তার বিধবা ননদ, বুড়ী।

রবির মা চাপা গলায় বলল—হয়তো অনেক জ্বালা যন্ত্রণা সয়েই পুঁটি, ন্যাদোনের হাত ধরে বেরিয়েছে। পদ্ম, তুই ওকে পায়ে ঠেলিস না ভাই।

বুড়ী বলল—আজকাল তো এরকম হচ্ছে অনেক। তুই অত অস্থির হয়ে উঠেছিস কেন পদ্ম? এখন পুঁটি বাড়ীতেই থাক। পরে রেজিষ্ট্রি করে. একদিন বিয়েটা চুকিয়ে ফেলবি।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট গলায় পদ্ম বলল—না রবির মা, তোমরা বুঝছো না, এমনিতেই তো কলোনীর লোক আমার কত নিন্দে করে। আর ন্যাদোনের এই কেচ্ছায় তো সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে।

পুঁটি এগিয়ে এসে কি যেন অস্ফুট গলায় বলতে যেতেই উগ্র একটা আবেগে পদ্ম তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরল। বলল—এসব বলছি বলে তুই কিছু মনে করিস না ভাই। আমিও তো মেয়ে—আমি জানি, কত দুঃখ কষ্ট পেলে কুমারী মেয়ে এভাবে ঘর ছাড়ে।

ন্যাদোন মৃদু গলায় বলল—ওর মামা-মামী যেরকম অত্যাচার করে তা তুই চোখে দেখলে সহ্য করতে পারতিস না দিদি।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছাড়া-ছাড়া গলায় পদ্ম বলল—ভগবান, আমার কোন বাসনাই পূরণ করলেন না। কত ভেবেছিলাম, বুঝলে রবির মা, ন্যাদোন চাকরী করবে তারপর ওর বিয়ে দেব। আমার একটা মাত্র ভাইয়ের বিয়েতে খুব ধুমধাম করবো সাধ ছিল।

—ধুমধাম করতে হবে না দিদি। ওকে তোর পায়ের কাছে ঠাঁই দে, আকুল গলায় ন্যাদোন বলল।

—চুপ কর।—চেঁচিয়ে উঠল পদ্ম—আমার বুঝি কোন সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই?

—দিদি, আমার মা নেই, বাবা নেই। সংসারে আপনার বলতে কেউ নেই আমার—করুণার কুয়াশায় সহানুভূতির স্পর্শে পুঁটির চোখে জল এল। বলল—তুমি আমাকে নাও দিদি।

গর্বোদ্দীপ্ত দৃষ্টিতে ন্যাদোনের দিকে তাকিয়ে লালু বলল,—পদ্মদি, ন্যাদোন পুরুষের মত কাজ করেছে। তুমি রাজী না হলে বড্ড কষ্ট পেত ন্যাদোন—

—চুপ কর,—চেঁচিয়ে উঠল পদ্ম। বলল—মা-র চেয়ে মাসীর দরদ বেশী দেখছি। যা তোদের দোকানের ম্যানেজারকে ডেকে নিয়ে আয়।

লালু বাইরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুড়ী বলল—আমরা তাহলে যাই পদ্ম। বিয়ের দিন ডাকিস কিন্তু। রবির মা বলল—শঙ্খটঙ্খ বাজিয়ে বরণ করতে পারলাম না পদ্ম। সেইদিন এসে হৈ হৈ করবো—কিন্তু।

ন্যাদোনের বুকের রক্তে আনন্দের শিহরণ বয়ে চলল তরঙ্গিত হয়ে। পদ্ম বলল—নিশ্চয়ই তোমাদের সবাইকে ডাকবো রবির মা।

পুঁটির মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরণা নামল। সেই সঙ্গে আচমকা চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার।

শান্ত, নরম গলায় বলল পদ্ম—এই ভাল হলো। আমি থাকবো তেলে-

ভাজা আর বিড়ির দোকান নিয়ে। আর তুই দেখবি ঘব-গেরস্থালীর কাজ। একা আব পেবেও উঠছিলাম না।

—তুমি যে আমাকে কত বড় অপমান থেকে বাঁচিয়েছ দিদি—বলল পুঁটি—ভগবান তোমাকে সুখী করবেন।

—সুখী। ম্লান, নির্জীব হাসির রেখা ফুটল পদ্মেব শীর্ণ ঠোঁটের কোণায কোণায়। হু হু কবে উঠল তার বুকের ভেতবটা। বলল—সুখ আমাব কপালে নেই ভাই। লোকে বলে, শাস্ত্রেও ভবসা দেয, দুঃখেব পব সুখেব না কি মুখ দেখা যায়। কিন্তু আমি ভাবি, এত বড মিথ্যেকথা মানুষ কেমন কবে মেনে নিয়েছে?

—কেন দিদি?

—দুঃখী হযে যে জন্মায়, জীবনটা তাব দুহাতে দুঃখেব সাথে লডাই কবতে কবতেই শেষ হয়ে যায়—

—আমি একটু আসছি দিদি—বলল ন্যাদোন—দেখি, লালু এত দেবী করছে কেন?

বাইবে অন্ধকাবে একটা ছাযাব মত মিলিয়ে গেল ন্যাদোন। তাব ধমনীব ভেতরে বক্তেব কলধ্বনি বাজছে।

পদ্ম বলল—পুঁটি তুই নিশ্চযই আমাব ভাইকে চিনতে পেবেছিস। অভাব আব কষ্টেব আঁচ ওকে কোনদিন পেতে দিই নি। তাই হযতো ওব মনটা বয়সের আন্দাজে বাডেনি। তুই কিন্তু ওকে বোজগাব কবতে বলবি—

—নিশ্চযই বলবো দিদি।

একটা উল্লসিত জনতাব বন্যা যেন উঠোনে ঝাঁপিযে পডল। বাঁদবব্র্যাণ্ড বিডিব দোকান বন্ধ কবে, ইউনিযনেব মিটিং শেষ কবে চলে এল ধীবেন্দ্রলাল। তার সঙ্গে এল নিবাবণ, নবেন, বিশু আরও অন্যান্য বিডি কর্মচাবীবা। লালু, ফটাও এল। ধীবেন্দ্রলাল বলল—কি পদ্ম, ন্যাদোন বুঝি একেবাবে বৌ নিযে বাড়ী ঢুকেছে! বেশ বেশ—ছোকরার কিন্তু 'লাইফ' আছে—

বিশু বলল, দেখুন ওদিকে আবাব মেযের মামা মামী পুলিশে খবব না দেয।

—মেয়ে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছে। তাদের কিচ্ছু করার নেই।

—ঠিক—ঠিক, করতে পারবে না কিচ্ছু—বলল ধীরেন্দ্রলাল—তবুও রেজিষ্ট্রির হাঙ্গামাগুলো মিটিয়ে ফেলা দরকার।

শম্ভু, টুলু কলকল করে বলে উঠল—পদ্মদি খুব ধুমধাম করতে হবে কিন্তু! শহরের সমস্ত বিড়ি কারিগরদের খাওয়াতে হবে—

—নিশ্চয়ই খাওয়াবো ভাই! সামনে একটা ভাল দিন দেখে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করবো। আমার একটা মাত্র ভাই!

—বিশু, নরেন, তোমরা কিন্তু কাল সকালে আসবে ভাই—ধীরেন্দ্রলাল বলল।

বিড়ি কর্মীদের কলরব মিলিয়ে গেল। শোনা গেল শম্ভুর উচ্ছ্বসিত গলার স্বর—হ্যাদোন একটা কাণ্ডই করল রে!

অস্তমান চাঁদের আলো বাঁকা হয়ে পড়েছে খাদিমপুরের প্রান্তরে। ঢাকা কলোনীর চকচকে টিনের চালের বাড়ীগুলোকে ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নায় তরঙ্গায়িত একটা নদীর মত দেখাচ্ছে। অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর নূপুর বাজছে।

পদ্মের বাড়ীর বড ঘরের বারান্দায় একটা ছেঁড়া চটের ওপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে হ্যাদোন। আর ঘরের ভেতরে পদ্মের তক্তাপোষের ওপরে ক্লান্ত, শীর্ণ দেহটা এলিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে পুঁটি। নিঃশ্বাসের তালে তালে তার পাতলা ব্লাউজের আড়ালে সুডৌল বুকটা ওঠানামা করছে। আবছায়া অন্ধকার বারান্দার দূর কোণে দুটো মূর্ত্তির মত পাশাপাশি বসে আছে পদ্ম আর ধীরেন্দ্রলাল। নরম, মৃদু গলায় বলল ধীরেন্দ্রলাল—তুমি মাঝে মাঝে আমাকে অবিশ্বাস করো কেন পদ্ম? আমার ভালবাসায় কি কোন আন্তরিকতা পাও না?

—তোমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করতে গেলেই কেন জানি আমার কেবলই মা-র কথা মনে পড়ে—

—তাঁর চরিত্রে তোমার মত দৃঢ়তা ছিল না পদ্ম।

—ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক দৃঢ়তা সব কিছুই মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছল্যে ওপরে নির্ভর করে। বাবা বলতেন, দারিদ্র্য সব গুণ নষ্ট করে। আমার তো মনে হয়, মেয়েমানুষ স্বভাবের চেয়ে অভাবেই বেশী নষ্ট হয়—

—তা হয়তো হয়। কিন্তু তুমিও জেনে রেখ, মেয়েমানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার রমণীয় তনুদেহ। যখন সে কাউকে ভালবাসে নিবিড়ভাবে, সমস্ত উজাড় করে তখুনি সে তার শ্রেষ্ঠ উপহার দিযেই তাকে অঞ্জলি দেয়—

—ভালবাসা! সে কী আবার গরীব-দুঃখী মেয়ে-পুরুষের ভেতরে আছে! কিছু স্বার্থের নেশা আর কিছু লোভ ছাড়া ভালবাসা আবার আছে না কী?

যেন মনে হল, ছায়া ছায়া অন্ধকারে ধীরেন্দ্রলালের মূর্ত্তিটা শিউরে উঠল। সে একটা কথা বলল না। উঠোনের অন্ধকার কোণে কোণে জ্বলছে জোনাকীর দীপ্তি। মাঝরাতের সেই প্রহরে দুটো মানব-মানবীর হৃদয়ে অনেক অব্যক্ত কথার গুঞ্জন ফুটে উঠল।

ধীরেন্দ্রলালকে স্থির নিষ্কম্প হাতদুটো দিযে পরম মমতায জড়িযে ধরে পদ্ম বলল—তুমি রাগ করলে? কি করবো বল? পুরুষ মানুষ নিঃস্বার্থে ভালবাসতে পারে নির্লোভ হয়ে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না—

—না পদ্ম রাগ করিনি। তোমার মাযের জীবনেব পবিণতি তোমাব মনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে—

ধীরেন্দ্রলালের বুকে মাথা রেখে মৃদু মৃদু অস্ফুট গলায কিশোরী মেযের মত আদুরে সুরে বলল পদ্ম—তবুও একটা কথা জেনে রেখ, স্বামীর ঘর করেছিলাম মাত্র একমাস। স্বামী কি বস্তু বুঝবার আগেই বাপের বাড়ীতে ছেঁড়া জুতোর সুকতলার মত সে ফেলে দিযে চলে গেল। প্রেমই বলো, আর স্নেহই বলো—সব—সব পেয়েছি তোমার কাছে। তুমি আমাকে— উচ্ছ্বাসে কদম ফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে ধীরেন্দ্রলালের বুকে মাথাটা

ঘসতে ঘসতে বহুদূর থেকে যেন ক্ষীণ গলায় পদ্ম বলল—তুমি বলো, আজকের এই মুহূর্তটা চিরসত্য হয়ে থাকবে আমাদের জীবনে?

—চিরসত্য! খুব অশুভ কথা পদ্ম। বর্ত্তমানের এই মুহূর্তটিকে চিরন্তন সত্য করতে পারে একমাত্র মৃত্যু।

—হ্যাঁ, তুমি আর আমি যদি এখুনি মরে যাই, তাহলে সত্য হয়ে থাকবে আশ্চর্য এই মুক্তোর মত সময়টা—আহ্লাদে ভিজে গলায় বলল পদ্ম।

ধীরেন্দ্রলাল নিবিড় বাহুবন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল—খড়কুটোর মত ভেসে ভেসে চলেছিলাম জীবনের স্রোতে। হয়তো ভেসেই যেতাম। তুমি আমাকে সেই দুর্দিনে আশ্রয় না দিলে পায়ের নীচে আজ আর শক্ত মাটিটুকু পেতাম না। আমার সব দিয়ে তোমাকে সুখী করবো পদ্ম।

প্রহরে প্রহরে রাত বেড়ে চলল। অনেক কথা, অনেক গুঞ্জন, অনেক হাসির দোলায় দুলতে দুলতে দুটো মুগ্ধ হৃদয়ের নিবিড় অতল প্রেমে ছন্দসুরভিত হয়ে উঠল রাত্রিটা। ক্ষয়িত চাঁদের আলো আর অন্ধকার বুকে নিয়ে উতলা হাওয়ায় উঠোনের আমগাছের পাতাগুলো মাথা কুটতে লাগল। আর আকাশে ঋষিবধূ নক্ষত্র অতন্দ্র অপলক চোখে তাকিয়ে রইল চাঁদের আলোয় ধোয়া পাপ-পুণ্যেভরা মানুষের এই জটিল পৃথিবীটার দিকে।

॥ বারো ॥

গুরু গুরু ঝড়ো মেঘের ডাকের মত সহরের দিকে দিকে গর্জন তুলে মিউনিসি-প্যালিটির ইলেকশন এগিয়ে এল। মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারের পদপ্রার্থী সুনীল মোক্তার, নান্টু সেন, হরিদাস ও বিশুরঞ্জন ইত্যাদি রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে সাইকেল রিক্সার ওপরে লাউড স্পীকার ফিট করে নিজেদের গুণপনার বক্তৃতা করতে সুরু করল। স্কুলের উঠোনের একপাশে বাঁধানো ইঁদারার ওপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে উদ্দীপ্ত ভাষায় বক্তৃতা করছে বিড়ি ইউনিয়নের সেক্রেটারী নিবারণ—আজীবন দেশকর্মী ধীরেন্দ্রলালকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত

করুন। তিনি সামান্য একজন বিড়ি কর্মচারী। কিন্তু এই নগণ্য, অবহেলিত পরিচয়ই তাঁর সবটুকু নয়। তিনি বিয়াল্লিশ সালে জেলে গিয়েছিলেন। একহাতে বারোটা সরকারী অফিস পুড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল গভর্ণমেণ্ট পাঁচ হাজার টাকা। বনে-বাদাড়ে নিঃশব্দচর বন্যজন্তুর মত তিনি আত্মগোপন করে বেড়িয়েছিলেন। অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকে তাঁর দেহ কৃশ হয়েছিল, তবুও—তবুও—

—কিন্তু সে তো বিড়ি বাঁধে। আপনি কি বলতে চান, একটা বিড়িবাঁধা লোক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হবে?—জনতার ভেতর থেকে কে একজন টিপ্পনী কাটল।

—হ্যাঁ। তিনি বিড়ির দোকানে কাজ করেন।—গর্জে উঠল নিবারণ—এই অর্থ নৈতিক দুর্দিনে অনেক শিক্ষিত ছেলেকেই বিড়ি বাঁধার কাজ করতে হচ্ছে। এইকাজ করেন বলেই কি তাঁর শিক্ষা দীক্ষা চারিত্রিক দৃঢতার কোনো দাম নেই? ত্রিশ টাকার মাইনের একটা কাজের জন্যে জুতো না খয়িয়ে. এই লাইনে এসে তিনি বেকার যুবকদের সম্মুখে একটা জ্বলন্ত আদর্শ তুলে ধরেছেন।

—দেব—দেব আমরা তাঁকেই ভোট দেব,—জনতার সম্মিলিত গলার স্বর দূর আকাশে মিলিয়ে গেল।

নান্থ সেনের দলের এক ভলাণ্টিয়ার চেঁচিয়ে উঠল,—মশাই আপনি অনেকক্ষণ ইঁদারার ওপরে এই উঁচু জায়গাটা আটকে রেখেছেন, এবার নামুন তো?

নিবারণ নেমে এল। সেই ছোকরা ইঁদারার ওপরে তড়াক করে লাফিযে উঠে বলতে স্বরু করল, আত্রাইয়ের সেই ভয়াবহ দুর্ব্বার বন্যায় নবপল্লীতে যখন কলোনীর হাজার হাজার বাস্তত্যাগী আবার সর্ব্বহারা হয়ে গিযেছিল, কে তাদের সেই দুঃসময়ে সিভিল কোর্টের বারান্দায় নিয়ে এসেছিল? কে দুহাতে ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে নৌকো চালিয়ে জলে ডুবু ডুবু সেই কলোনীতে গিয়ে তাদের সবাইকে নৌকোয় উঠিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিল? কে তাদের—

—নাম্বু সেনের কথা আর ফলাও করে বলতে হবে না! নন্দন কলোনীতে তার বাস্তু-ত্যাগী স্কুলের তবিল তছরুপের ইতিহাস কারো অজানা নেই—পাবনা কলোনীর দুঃখবিনাশ তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল।

—শালাকে পিটিয়ে বার করে দাও।—নাম্বু সেনের দলের কয়েক জন রক্ত-খেকো বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দুঃখবিনাশের ওপরে। এলোপাথাড়ি কিলচড় পড়তে লাগল তার পিঠের ওপরে বৃষ্টির মত। আহত জন্তুর মত তীব্র চীৎকারে চারিদিক শিউরে দিয়ে দুঃখবিনাশ ছুটে এল রাস্তায়। কালশিটে পড়া কপালটা বাঁহাতে চেপে ধরে হেঁকে বলল সে—দেখি শালা নাম্বু সেন কেমন করে জেতে।

শান বাঁধানো ইঁদারার প্ল্যাটফরমের ওপরে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা প্রার্থীর ভলান্টিয়ার বক্তৃতা করে চলল।

সারা শহরে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, চায়ের দোকানে, মাছের হাটে, মোটর ষ্ট্যাণ্ডে জনতার জটলা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের ভেতরে মৃদু গুঞ্জনের তরঙ্গ বয়ে চলেছে।

—আরে যুধিষ্ঠির ঠাকুরের হোটেলে না কি ভাত-মাংস ফ্রি খাওয়াচ্ছে কালীনাথ রায় তাদের ভলান্টিয়ারদের—

—চল। শালা কালীনাথের পয়সায় ভাত মাংস খাবো। আর ভোট ক্যানভ্যাস করবো স্থনীল মোক্তারের হয়ে—

রাধাকান্ত ঠাকুরের পানের দোকানে বসে আছে কালীসাধক নিশিনাথ। চক্রাকারে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য লোক। আধ-বোজা চোখদুটো মিটি মিটি করে নিশিনাথ বলল—আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, বিশুরঞ্জন দাশগুপ্ত শুধু ইলেকসানে দাঁড়াবে না, সে চেয়ারম্যানও হবে—

—শালা নিশ্চয়ই, বিশুরঞ্জনের মদের দোকান থেকে বিনা পয়সায় পাঁইট খানেক টেনেছে।

—কে এ কথা বললে? ধক করে জ্বলে উঠল নিশিনাথের রক্তাভ চোখদুটো। বলল—আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব—

—যাও যাও, গেরুয়া পরে শ্মশানে বসে মদ খেলেই তান্ত্রিক হাওয়া যায় না। নিশিকে ঘিরে জনতার ভীড় পাতলা হয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির ঠাকুরের হোটেলের সামনে 'কিউ' দিয়ে সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে গেল, সবাই চেঁচিয়ে বলছে—আমি কালীনাথ রায়ের ভলান্টিয়ার। আমাকে খেতে দাও—

—ঠিক হ্যায়! এই স্লিপমে সব নাম লিখিয়ে দেন বাবু সাহেবরা।—কটা গোঁফটা চুমরে বলল যুধিষ্ঠির,—জলদি নাম লিখিয়ে দিন। হামাকে ঘোষ মশাইকে আবার এ্যাকাউণ্টস দিতে হোবে তো!

ওদিকে সমস্ত শহর খুঁজে দুঃখবিনাশ ধীরেন্দ্রলালকে পেল চককাশী-পাড়ার আরও উত্তরে জেলে পাড়ায়। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল দুঃখবিনাশ, ভাই তোমার খুব বিপদ দেখছি। কিছু টাকা খসাও। তা নাহলে ইলেকসনের সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবেনা—

—কেন? কি হলো?

—তোমার ভলান্টিয়াররা মন দিয়ে কাজ করছে না। কালীনাথ, যুধিষ্ঠির ঠাকুরের হোটেলে ভাত মাংস ফ্রি খাওয়াচ্ছে। বিশুরঞ্জন দিচ্ছে মদ আর মাংস। সুবিনয় দাস খাওয়াচ্ছে লুচি বোঁদে—

—কি করতে হবে বলো? আমার সহকর্মী সব বিড়ি কারিগররা কি খেতে চাচ্ছে?

—হ্যাঁ। আমি কি এমনি ছুটে এসেছি—এই দুপুরের রোদে! শ খানেক টাকা দাও। তোমার ভলান্টিয়ারদের ফ্রি খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করি। তোমার জন্য একটা মাইক্রোফোনও জোগাড় করি—

—নিবারণ যে বলেছিল মাইক্রোফোন যোগাড করবে?

—না। সে খালি গলায় বক্তৃতা করছে।

—তাই নাকী?

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা বের করে দুঃখবিনাশের হাতে দিয়ে বলল—ভাই, তোমার ওপর সব ভার থাকলো, তুমি দেখ।—একটু থেমে

চিন্তিত হয়ে বলল—রিফিউজিরা সবাই আমার ভোট ক্যানভ্যাস করছে। খুব আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করছে, কৈ তারা আমার কাছে খেতে চায় নি তো ?

—আর সব প্রার্থীরাই খাওয়াচ্ছে কি না, তাই ওরাও—

—আচ্ছা, আচ্ছা—তুমি যাও—

দ্রুত পায়ে চলে এল দুঃখবিনাশ তার নিজের বাড়ীতে। উল্লাসে চেঁচিয়ে বলল স্ত্রীকে—শোন এই পঞ্চাশ টাকা রাখো। তুমি রোজই গয়নার কথা বলো। এই নাও—

—একী! তুমি কোথায় পেলে টাকা ?

—আরে ইলেকশান, ইলেকশান মানেই টাকার খেলা। রাশি রাশি ঝরাপাতার মত টাকার নোট উড়ে বেড়ায় চারিদিকের বাতাসে। ধরতে পারলেই হলো—ঘেঁডিয়ে হেসে বলল দুঃখবিনাশ। একটা গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ধরিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান-মত্ত শহরের দিকে।

ঘন হয়ে রাত্রি নামল। রাতের অন্ধকারের আড়ালে একটা সরীসৃপের মত নিঃশব্দ পায়ে সে হাঁটতে সুরু করল কালীনাথ রায়ের বাড়ীর দিকে। বুনো আহত একটা বাঘের মত উত্তেজিত পায়ে বারান্দায় পায়চারী করছিল কালীনাথ। দূর থেকে ইলেকশনের বক্তৃতায় মাইক্রোফোনের আওয়াজ আর অসংখ্য ভলান্টিয়ারের তীব্র চীৎকারের বিচিত্র একটা শব্দের তরঙ্গ চাবুকের মত তার কানের পর্দায় ঘা দিচ্ছে। নীচের ঠোঁটটা এমন করে কামড়ে ধরেছিল, যেন তার মনে হচ্ছে, ঠোঁটটা কেটে রক্ত পড়বে। তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তি তার বুকের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এখনো—এখনো, দুঃখবিনাশ আসছে না কেন ? বারান্দার সম্মুখে তরঙ্গিত অন্ধকারের দিকে জ্বালা ধরা চোখে তাকিয়ে রইল কালীনাথ রায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল—কে ওখানে ?

—আমি দুঃখবিনাশ। কালো চাদরে আপাদ মস্তক ঢেকে এসে দাঁড়াল। বাতাসে ভাসছে উগ্র দেশীমদের গন্ধ।

কালীনাথ বলল—কি বলল ডক্টর দাস ?

—বিলেত ফেরত ডাক্তার, বুঝলেন—চাপা ফিস ফিস গলায় বলল দুঃখবিনাশ—দর একটু বেশী। দেড়শো টাকা চায়।

—দেড়শো! কাজটা তো বাপু কিছুই না। তার ক্লিনিকের আটটা ফিমেল পেসাণ্টকে সিদুঁর দিয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে পোলিং বুথে নিয়ে আসতে হবে—

—বলতে সোজা স্যার। গাঁয়ের মেয়ে, অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। মিথ্যা স্বামীর নাম মুখস্থ করাতে হবে—

—বেশ দেব টাকা। আটটা সলিড ভোট আমার চাই।—দেরাজ থেকে নোট বের করে দুঃখবিনাশের হাতে কালীনাথ দিল।

—আমার কমিশন?

—কত দিতে হবে?

—দেখুন কাজটা খুবই কঠিন। আমার অন্তত পঁচিশটা টাকা চাই—

—আচ্ছা দেব।

—নমস্কার স্যার।—একটা রাতচরা জন্তুর মত পলকে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল দুঃখবিনাশ। তার রক্ত-চোখে হাসির আভা চক চক করছে। রাশি রাশি রঙীন প্রজাপতির মত হাজারো আশার ঝাঁক মনের ভেতরে গুন গুন করে উঠল। এই ইলেকশনের আয় দিয়ে সে ভেঙ্গে পড়া ঘরটা মেরামত করবে। মেয়ের বিয়ের ধারও শোধ করবে।

পরদিন আরও প্রবল হয়ে উঠল মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনের প্রচার। বরিশাল ফরিদপুর কলোনীর বাড়ীতে বাড়ীতে মেয়েদের ভেতরে ধীরেন্দ্রলালের হয়ে ভোট ক্যানভ্যাস করছে নীরদাবালা ও পদ্ম। প্রখর রোদের ঝিলিমিলি কাঁপছে টাউন ক্লাব মাঠের ওপরে। মাটির ভেতর থেকে তাপ উঠছে। পদ্মের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। প্রত্যেক বাড়ীতে যেয়ে হাতজোড় করে মেয়েদের বলছে—আপনারা অনুগ্রহ করে ধীরেনবাবুকে ভোট দেবেন। তিনি আদর্শ বাদী—সত্যনিষ্ঠ মানুষ। দেশের জন্য দুঃখবরণ করেছেন অনেক। তাঁকে একবার ভোট দিয়েই দেখুন—

হঠাৎ সাইকেল চালিয়ে শম্ভু এল। ছোট একটা চিরকুট গুঁজে দিল পদ্মের হাতে। ধীরেন্দ্রলাল জানিয়েছে—শহরের উত্তর দিকে নিউটাউনে প্রচার করতে যেতে হবে। নীরদা, ঐ পল্লীর প্রভাবশালী মহিলা কর্মী। তাঁকে যেন সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—

নীরদাবালা। দলমলে চেহারায় বয়সের টান ধরেছে, মাজা-মাজা গায়ের রঙ। মহিলা সমিতির একজন উৎসাহী কর্মী। ধীরেন্দ্রলালের আদি বাড়ী সাঁপাহারেই বিয়ে হয়েছিল তার। নীরদার স্বামী মারা গেল যে বছর, সেই বছরেই দেশ ভাগ হলো। নীরদা সাঁপাহারের বাড়ীঘর জমি সব এক্সচেঞ্জ করিয়ে রামনগরের নিউটাউনে ছোট্ট একটা একতালা দালান করেছে। ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাট নেই। দিনরাত হাতল লাগানো একটা কাঠের ব্যাগ হাতে নিয়ে অদ্ভুত একটা গর্ব্বের গৌরবে মনটাকে জ্বালিয়ে মহিলা সমিতির কাজ করে বেড়ায়। তার স্বামী বরেণ বসুও ছিলেন দেশকর্মী। তাঁর সান্নিধ্যে থেকেই নীরদার মনেও দেশসেবার প্রেরণা এসেছিল। ধীরেন্দ্রলালের সঙ্গে তার প্রথম আলাপ বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের সময়। রাত্রি জেগে ঘরে বসে গোটা গোটা অক্ষরে জ্বালাময়ী ভাষায় পোষ্টার, প্যাম্ফ্লেট লিখে দিত নীরদা। ধীরেন্দ্রলাল দুচোখে নিবিড় শ্রদ্ধা ফুটিয়ে বলতো আপনি তুর্কীর মাদাম হালিদা এদিবের মত—

—থাক হয়েছে—পাতলা দুটো গোলাপী ঠোঁটে ঝিকিমিকি হাসির আলো জ্বালিয়ে নীরদা বলতো, আগুনের কাছে থাকলে মনটাও তেতে ওঠে। আপনাদের মত আদর্শবাদী ও দেশকর্মীদের যে একটু সাহায্য করতে পারছি, এই আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ, ধীরেনবাবু।

তার চোখের দৃষ্টি অনুরাগের রঙে স্নিগ্ধ হয়ে উঠতো। আর যুবক ধীরেন্দ্রলালের বুকে গুরু গুরু ঝড়ো মেঘের ডাক উঠতো। লণ্ঠনের আলোয় রাত্রির নিরালায় আচ্ছন্ন সেই ঘরের তক্তাপোষের ওপরে নীরদাবালার লালপেড়ে ঢাকাই শাড়ীপরা সেই বিজুরী রেখার মত তনুদেহ। শুভ্র কপালে জলজ্বলে সিঁদুরের টিপ সব মিলিয়ে ধীরেন্দ্রলালের মনে হতো তাকে একটা

স্বপ্নের মূর্ত্তির মত। রাত্রির এই অন্ধকারে হুহু-করা বাতাসের হাহাকারে যেন আর অসংখ্য অপলক চোখের মত রাশি রাশি নক্ষত্রের ভেতরে সে এখুনি মিলিয়ে যাবে।

সেই নীরদাবালা! রামনগরের বাজারে অসংখ্য বাড়ীর দেয়ালে মোটা লাল কালিতে লেখা ধীরেন্দ্রলালের নামে পোষ্টার দেখে সে নিজেই এসে মেয়েদের ভেতরে প্রচারের ভার নিয়েছে।

ধীরেন্দ্রলালের জরুরী আহ্বান পেয়ে নীরদাবালার পাউডারের প্রলেপে উজ্জ্বল মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল। খুসী উচ্ছল গলায় বলল পদ্মকে,—আমি তাহলে যাই ভাই এই ছেলেটির সঙ্গে?

পদ্ম বলল—নিউটাউনে আপনি থাকেন। সেখানে প্রচারের কাজে আপনারই থাকা দরকার। আপনি যান।

নীরদা শম্ভুর সঙ্গে চলে গেল। দূর থেকে হেঁকে বলল পদ্ম,—যেমন করেই হোক ধীরেনবাবুকে রিটার্ণ করাতে হবে।

—দেখুন আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করবো না।—বলল নীরদা—আমার বিশ্বাস জনসাধারণ ধীরেনবাবুর মত উদার ও মহৎ মানুষকে মর্যাদা দেবেই—

বরিশাল, ফরিদপুর কলোনীর সম্মুখের ধু ধু মাঠে দুপুরের রোদ ছোরার মত ঝলসে উঠছে। সেই রোদ মাথায় করে কোমরে আঁচল পেঁচানো পদ্মের মূর্ত্তিটা যেন দ্বিগুন উৎসাহে কলোনীর বাড়ীগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। আকুল হয়ে বলে—ধীরেনবাবুকে ভোট দিন।

মিউনিসিপ্যালিটির ভোটের উত্তেজনায় থরো থরো কম্পিত শহরের সকলের ভীষণ অস্থিরতা নিয়ে দিন কাটতে লাগল। নিশিরাতে কোন সুদূর দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে মাইক্রোফোন, কোন ওয়ার্ডের কমিশনারের আশ্চর্য কর্মতৎপরতার কথা। শোনা যায় কোনো প্রার্থীর উদ্যোগে নাচগানের উৎসবে নটীর নূপুর নিক্কনের ধ্বনি। বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রার্থীরা এক একটি হিংস্র জন্তুর মত ক্ষিপ্ত, হয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। পদমর্যাদার উগ্র দুর্বার লোভ বিশাল কোন দৈত্যের মত প্রার্থীগুলোর মাথার ওপরে চেপে

বসে যেন রক্ত শুষে খাচ্ছে। ঘুম নেই ধীরেন্দ্রলালের চোখে। নিদারুন পরিশ্রমের স্বাক্ষর ফুটেছে নীরদার মুখের রেখায়।

—দিদি তুই যে সব সম্বলই একে একে ধীরেন্দ্রলালের জন্য দান করছিস শ্লেষ মিশিয়ে ন্যাদোন বলল—তোর বিয়ের সময়ের বালাও বিক্রি করলি দেখলাম। খেটে খেটে শরীরও—

—একটা সৎ লোক যদি মিউনিসিপ্যালিটিতে যেতে পারে তাহলে বিড়ি কর্মচারীদের আর এবং বাস্তুত্যাগীদের অনেক উপকার হবে।

—হবেই যে, কেমন করে বলছিস দিদি? চেয়ারে বসলেই দেখি সবাই অতীতটাকে ভুলে যায়। ভানুমতীর মত কোন অদ্ভুত মন্ত্রে তাদের বিবেক পাল্টে যায়।

—চুপ কর। থিয়েটারী বক্তৃতা রাখ। বিরক্ত হয়ে পদ্ম বলল—তোর আবার অত কথা কি রে! এক পয়সা রোজগার ত করিস না তুই। একটা বেকারের মুখে—

—কি বললি তুই?—খরশান তপ্ত দৃষ্টিতে চোখের কোণা দিয়ে ন্যাদোন তাকালো পদ্মের রোষদীপ্ত মুখখানার দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—আমি রোজগার করতে পারি না বলে খাওয়ার খোঁটা দিলি? এক মাসের ভেতরে যদি তোর বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে না পারি, তাহলে আমার নাম ন্যাদোনই নয়—

হন হন করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল ন্যাদোন। শিলিভূত একটা মূর্ত্তির মত বসে রইল পদ্ম। আর রান্নাঘরের একটা অন্ধকার কোণে দীপশিখার মত কেঁপে উঠল পুঁটি।

দুইদিন পর। হাইস্কুলের উঠোনের আমগাছের পাতায় পাতায় ঝিকমিক করছে বেলা শেষের রোদ। দলে দলে লোক আসছে বিভিন্ন প্রার্থীকে ভোট দিতে। কালীনাথ, ধীরেন্দ্রলাল সবাই আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে খোয়া ওঠা রাস্তার দিকে। দুঃখবিনাশ আসছে না কেন! ধীরেন্দ্রলাল ও কালীনাথ পরস্পরকে না জানিয়ে গোপনে তাদের ভলান্টিয়ারদের পাঠিয়েছে

দুঃখবিনাশের বাসায়। কিছুক্ষণ পরেই সাইকেল ছুটিয়ে ফটা এল। বলল,—দুঃখবিনাশ কাল শেষ রাতে ফ্যামিলি নিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ বলতে পারে না।

—সে কী!—কালীনাথ ও ধীরেন্দ্রলালের মাথায় যেন বাজ পড়ল। গলা চিরে অবক্ত্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল কালীনাথ—স্কাউণ্ডেলটা আমার কাছে দেড়শো টাকা নিয়েছে যে—

—আমিও তাকে পঞ্চাশ টাকা দিযেছি যে।—বিদীর্ণ গলায় বলল ধীরেন্দ্রলাল। দুজনেই হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। তাদের করুণ কাতরোক্তি ভলাণ্টিয়ারদের অবিশ্রান্ত চীৎকার আর বক্তৃতার কলরোলে তলিয়ে গেল।

ধূপের ধোঁয়ার মত সন্ধ্যা নামল আমগাছের মাথায়। জনতা, ভোটের ফলাফলের আশায় রুদ্ধশ্বাসপ্রতীক্ষায, শান্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িযে আছে। প্রতিটি প্রার্থীর বুক নিদারুণ আশঙ্কায ভেঙে পড়ছে। স্কুলের একটা কোণে কাঁঠাল গাছের নীচে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে লালু, ফটা আর পদ্ম। উৎকণ্ঠায় জ্বলে যাচ্ছে পদ্মের মাথার ভেতরটা। চোখের দৃষ্টিতে আশঙ্কার কালো ছায়া।

সিনিয়র সাবডেপুটি মিঃ ব্যানার্জি, প্রিজাইডিং অফিসাব স্কুলের বারান্দায এসে দাঁড়ালেন। বিশাল দেহটি, পরিশ্রমে ক্লান্তিতে নির্জীব বোযাল মাছের মত মনে হচ্ছে। তিনি মাইক্রোফোনে ঘোষণা কবলেন—ধীরেন্দ্রলাল জোয়ারদার সর্বাধিক ভোটে জয়লাভ করেছেন, তিনি পেযেছেন আটষট্টি হাজার ছয়শো সত্তর আর নান্টু সেন ষাট হাজার আশি ইত্যাদি। জয়! ধীরেন্দ্রলালের জয়! জনতার জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠল আকাশ। বিড়ি কারিগররা, উপস্থিত রিফিউজিরা রাশি রাশি মালা পরিয়ে দিল ধীরেন্দ্রলালের গলায়। বিপুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত জনতা ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ধীরেন্দ্রলালের চারিদিকে। নীরদার চোখ দুটো প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে উল্লাসে থর থর করে কাঁপছে পদ্ম। অজস্র বাস্তুত্যাগী আর বিড়ি কর্মীদের ভীড়ে ভাসতে ভাসতে

রাজার মহিমা নিয়ে ধীরেন্দ্রলাল বাঁদর ব্র্যাণ্ড বিড়ির দোকানে ইউনিয়নের অফিসে চলল। জমাট ভীড়ের ভেতরে লালু ও ফটা চেষ্টা করল ধীরেন্দ্রলালের কাছে এগিয়ে যেতে। কিন্তু অসংখ্য মানুষের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে মুখে গায়ে কালশিরে পড়ে গেল। তিক্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল ফটা, —নিজেদের লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবো তাতে এত বাধা! একবার ধীরেন্দ্রলাল নিবারণকে বলল,—পদ্মকে দেখছি না কেন? কিন্তু তার কথা সম্মিলিত মানুষের কলরোলে তলিয়ে গেল। কেউ তার খোঁজ করল না। রাশি রাশি মালা গলায় দিয়ে ধীরেন্দ্রলাল আর তার পাশে শিথিল তনুটি শান্তিপুরী কালো পেড়ে শাড়িতে পেঁচিয়ে চলেছে নীরদবালা। হাসিতে উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে সে। আবার চারিদিক কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল জনতা—জয় ধীরেন্দ্রলালের জয়!

এই তীব্র জয়ধ্বনিটা তীরের মত বিঁধে গেল পদ্মের কানে। আত্রাইয়ের খালের ব্রীজের ওপর দিয়ে চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিজেকে অন্ধকারে মিশিয়ে দূর থেকে দেখল, শহরের বড় রাস্তায় আনন্দ টলোমলো সমারোহের উজ্জ্বল রঙীন ছবি! কোথায়, কতদূরে একক নিঃসঙ্গ হয়ে পদ্ম দাঁড়িয়ে থাকলো। সে কথা ধীরেন্দ্রলালের হয়ত মনে পড়ল না। তবুও—

তবুও আশ্চর্য। পদ্মের মনে কোন জ্বালা নেই, নেই কোন ক্ষোভ। ধীরেন্দ্রলাল। গানের মত একটা নাম। সুরের মত একটা মুখ। দীর্ঘ একটি বর্ষা, একটি শরৎ, অনেক সূর্যের আলো আর অন্ধকার তিলে তিলে তার মনে যে অনুরাগ ছড়িয়েছে তা যেন সোনার আলোর মত জ্বলে উঠল তার চেতনায়, বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের সুর বাজতে লাগল। মন বলল—লোকের ভিড়ে হয়তো তাকে ডাকতে পারেনি। কিন্তু ধীরেন্দ্রলালের মনের পটে নীহারিকার মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তারই মুখচ্ছবি।

একটু পরেই উঠোনের অন্ধকারে ধীরেন্দ্রলালের দীর্ঘ মূর্তিটা রেখার মত ফুটে উঠবে। স্নেহভার গলায় বলবে, তুমি রাগ করেছো পদ্ম?···তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ধীরেন্দ্রলালের জীবনে সে গৌরবের প্রদীপ জ্বালিয়েছে। তার

ওপর সে রাগ করবে? এও কি হয়! না তাই সম্ভব? অদৃশ্য একটা শক্তির প্রলেপে হাড জিরজিরে দেহটাকে মুহূর্তে শক্ত করে ঝড়ের বেগে বাড়ীর দিকে চলে গেল পদ্ম।

॥ তের ॥

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। তারই ফাঁকে ফাঁকে তারার দীপালি জ্বলছে। বারান্দার এক কোণে দুটো পাথুরে মূর্তির মত বসে আছে পুঁটি আব ন্যাদোন। ফোঁস ফোঁস করে কতকগুলো উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল ন্যাদোন—না পুঁটি তুমি আপত্তি করোনা। চল আমরা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই। দিদি থাক তার মনের মানুষ নিয়ে—

—তুমি খুব অবিচার করছো দিদির ওপর। মিথ্যে রাগ করছো। তাঁকে ভুল বোঝা তোমার উচিত নয়—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ রাখো—রাগে গরগর করে উঠলো ন্যাদোন। চোখের তারা-দুটো জ্বলতে লাগল। বলল—আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ও একটা সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—

গলাটা একটু নামিযে যেন কি একটা গুঢ় কথা বলছে, এমনি ফিস ফিস গলায় পুঁটি বলল—তুমি এত নাটক করে বেড়াও, বুঝতে পারোনা, দিদির এত টান কেন ঐ লোকটার ওপব? মেযে হয়ে জন্মেছে। বিযেও হযেছে। তবুও বেচারী না পেল ঘর, না পেল বর—ভারী হযে উঠল পুটির গলার স্বর।

—বেশ তো, ধীরেনদাকেই বিয়ে করুক না। ঘরসংসার করুক। আমিও তো তাই চাই।

—দেখো ওকে নিয়েই ঘর বাঁধবে দিদি। খুব সুখীও হবে। তার মত মানুষ চিরকাল দুঃখী হয়ে থাকতে পারে না।

—পদ্মদি আছো?—বাইরে বেড়ার ওপারে কে যেন মৃদু গলায় ডাকল।

—কে রে লালু নাকি? ভেতরে আয়—

উঠোনের এক কোণে এসে দাঁড়াল লালু আর ফটা।

—কি রে? খবর কি তোদের?—বলল ন্যাদোন।

—খবর আর কি? তুই তো সবই জানিস!

কঠিন গলায় লালু বলল—সেই ইলেকশনের ক্যানভাসের সময় থেকে দোকান বন্ধ।

—আমরা হপ্তা কাবারে মাইনে পেতাম—তাও পাচ্ছি না। কেমন করে আমাদের দিন চলবে?

—তোদের ম্যানেজার কোথায়?

—ধীরেনদা তো চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য মেতে উঠেছেন। তাঁর জন্যে নীরদা দেবী, আমাদের পদ্মদি, বিড়ি কারিগররা সবাই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তদ্বির করছে।—বলল ফটা,—জিন্দাবাদ বিড়ির দোকান আর খুলবে বলে তো মনে হয় না—

—পদ্মদি আমাদের সোজাসুজি বলুক—লালু বলল,—তাহলে আমরা রাস্তা দেখি।

—হিলির বর্ডারে গিয়ে 'স্মাগলিং' করলে ঢের বেশী রোজগার করতে পারবো।—পকেট থেকে তিনটে বিড়ি বের করে লালু আর ফটাকে দিয়ে ন্যাদোন বলল—নে ধরিয়ে নিযে বস ওখানে। লালু আব ফটা ছেঁড়া একটা সতরঞ্চির ওপর বসল। কালিপড়া লণ্ঠনের ছায়া কাঁপা আলো নাচতে লাগল ওদের তামাটে মুখের রেখায় রেখায়। গম্ভীর হয়ে এল ন্যাদোনের চোখের দৃষ্টি। বলল—তোদের সঙ্গে পরামর্শ আছে একটা। দিদি তো তোদের খুব ভালবাসে। তোরা কি বুঝিস, ধীরেনদার সঙ্গে সত্যিই কি ওর ভাব-ভালবাসা আছে? যদি থাকে তাহলে তোরা ভাই দিদিকে বিয়ে করতে বল—

—ধীরেনদা সম্বন্ধে প্রথমে পদ্মদির ধারণা খুব ভাল ছিল না,—ফটা বলল।

—এখন তো ধীরেনদাই তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠেছে। ইলেকশনে কী ভীষণ পরিশ্রম যে করেছে,—লালু বলল,—পদ্মদির মনে নিশ্চয়ই ধীরেনদা ছাপ ফেলেছে—

—শহরের লোক যা তা বলছে ধীরেনদা আর দিদিকে জড়িয়ে।—হ্যাদোন বলল—দিদির নিন্দা আমি এতটুকু সহ্য করতে পারি না।

—দিদিকে বিয়ে করতে কেমন করে বলবে লালু ঠাকুরপোরা ?—বলল পুঁটি—বয়সে কত ছোট না ওরা।

—হ্যাঁ বৌদি ঠিক বলেছে !—বলল ফটা—পদ্মদিকে কিছু বলা আমাদের সাজে না।

—আমার ভাই অসহ্য হয়ে উঠেছে।—তিক্তগলায় বলল হ্যাদোন—আমি আর কিছুদিন দেখবো তারপর একটা হেস্তনেস্ত করবো—

—লালু ঠাকুরপো, তোমরা দিদিকে স্পষ্ট করে বলো না, দোকান খুলবে কি না ? তোমরা বেকার কতদিন বসে থাকবে ?

—ফটাকে তো বলতে বলছি বৌদি। তা ও কিছুতেই বলবেনা পদ্মদিকে। আমি ঠিক করেছি, বর্ডারে বিড়ির পাতা স্মাগলিং করবো।

—না না ওসব করতে যেওনা লালু ঠাকুরপো।—আর্ত গলায় বলল পুঁটি—ধরা পড়লে সারা জীবন জেলে পচে মরবে।

—বৌদি বয়সে ছোট হলে কি হয় বুদ্ধি কিন্তু একেবারে পাকা গিন্নির মত—

—যাও কি যে বলো !—লজ্জার ছায়া পড়ল পুঁটির চোখে।

—আরে বাপু, এসব সাংসারিক বুদ্ধি নিয়েই মেয়েরা জন্মায়—একটু থেমে যেন কোন নিবিড় মধুর স্মৃতির রোমন্থন করছে, এমনিভাবে কতকটা স্বগোক্তির মতই ফটা বলে ফেলল—এই যেমন সেদিন দুপুরে সুধা কেমন সুন্দর বলল— পদ্মদিকে তোমরা ছেড়ে যেওনা। তোমাদের জন্যে তিনি অনেক করেছেন—

—তোকে সুধা একথা কবে বলল ?—বলল লালু—

—এই তো আজও দুপুরে বলছিল—ফটার বুকে ভয়ের ধুকুধুকু। নিদারুণ একটা আশঙ্কায় হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। অন্ধকারে লালুর চোখদুটো চক চক করে উঠল। কঠিন গলায় বলল—তুই তাহলে আবার

সুধার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছিস? মা তোকে একবার অপমান করল। তাতেও তোর শিক্ষা হয় নি?

অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফটার বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে। কিন্তু একটা কথা বলল না। দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা ঝুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পুঁটির চোখে বেদনার্ত দৃষ্টি ফুটে উঠল। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে যেন তীব্র বিরক্তিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করে বলল—ছিঃ ছিঃ এসব কি? লালু ঠাকুরপো তুমি আমাদের সামনে ওকে এসব না বললেই পারতে।

কঠিন হয়ে উঠেছে লালুর মুখের রেখাগুলো। আর ফটার নিরাশ্বাস অবয়বহীন অন্ধকার জীবনের ভেতরে আলোয় ঝলমলে একটিমাত্র সুন্দর স্বপ্ন সুধার হাসি হাসি মুখখানা তার চেতনার ভেতরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পঁচিশ বছরের জীবনে যে যৌবন বাসনা মনের তারে তারে জলদবাজনার মত বেজে ওঠে, যে মোহন আশা তার বহু রাত্রিকে অস্থির উন্মনা করে তোলে, সেই দুর্মর রঙীন তৃষ্ণাটা তার বুকে কান্নার ঢেউ জাগিয়ে দিল। তার মনের ভেতরে দুঃস্বপ্নের ছবির মত ফুটে উঠল কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা। লালুর মা হেমাঙ্গিনী দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিল। নিস্তব্ধতায় তলিয়ে গেছে চারিদিক। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। লালুদের বাড়ীর পাশের পেয়ারা গাছের ডালে চড়াই পাখীর দল কিচির মিচির করছিল। গল্পে আর হাসিতে মুখর হয়ে উজ্জ্বল প্রাণের লীলার মত সুধা তার সম্মুখে যেন নেচে বেড়াচ্ছিল। সে বলেছিল—আমি এলেই তুমি এত খুসী হয়ে ওঠ কেন সুধা?

—কেন, তুমি বোঝো না? কিন্তু তোমার মুখ শুকনো দেখছি কেন, ফটাদা!

—বিড়ির পাতার মহাজনের কাছে গিয়েছিলাম সেই কালিয়াগঞ্জে, পেটে কিছু পড়েনি।

—সকালে কিছু খাওনি! উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করেছিল সুধা। ছুটে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে মুড়ি নিয়ে এসেছিল। তারই পাশে ঘন হয়ে বসেছিল সুধা। তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের সুরভি সুগন্ধি ফুলের মত তার নাকে এসে

লাগছিল। তার হাতের বাটীতে মুড়ি মুড়কি পরম যত্নে মেখে দিয়েছিল সুধা। সে বলেছিল—এত আনলে কেন সুধা? আমি তো এত মুড়ি-মুড়কি খেতে পারবো না—

—খুব পারবে। আদুরে মেয়ের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল—এত বড় চেহারা তোমার! এইটুকু খেতে পারবে না—

—তোমাকেও কিন্তু একটু খেতে হবে।

—ও, বুঝেছি! আমি না খেলে, তুমি খাবে না।

দুষ্টামীর রঙে ছেয়ে গিয়েছিল সুধার টানা টানা চোখদুটো। ভ্রু কুঁচকে বলেছিল—বেশ খাচ্ছি।—দুজনেই একটা বিপুল খুসীর দোলায় গা ভাসিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাবা থাবা মুড়ি তুলে নিয়ে খেয়েছিল। হঠাৎ উঠোনের বাতাসে ভাঙ্গা কাঁসরের মত একটা আওয়াজ বেজে উঠেছিল—

—সুধা তোর ঘরের ভেতরে কে রে? হেমাঙ্গিনীর দুটো রক্ত চোখে আগুন ঝরছিল।

তার গলায় মুড়ি আটকে গিয়েছিল। ভয়ে পাংশু মুখ। আর সুধার মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। শক্ত করে মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সুধা। ফট্টা বলেছিল—আমি মাসিমা, লালুর খোঁজে এসেছিলাম—

—লালুর খোঁজে এই ভর দুপুরে? বেশ কথা বলতে শিখেছো যা হোক। বন্ধুর কাছে এসে তার সমোত্ত বয়সের বোনের সঙ্গে ফিস্‌ফাস গুজু গুজু আলাপ—

—না মাসীমা। আমি ওকে বোনের মত দেখি।

—চুপ কর।—ঘাট থেকে কেচে নিয়ে আসা ভিজে কাপড়ের ডালি থপ করে মাটিতে নামিয়ে রেখে দুপ দাপ পা ফেলে এগিয়ে এল হেমাঙ্গিনী। তার মাথার রক্তস্রোতে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে উঠল। ঘরের ভেতরে এসে সে রোশে ক্ষোভে চিৎকার করে বলেছিল—যাও বেরিয়ে যাও—আর কখনো এ বাড়ীতে এসো না। দাঁতে দাঁত ঘসে আবার বলেছিল—বোনের মত। সবাই

ওরকম বলে। কাঁচা পেয়ারার মত ডাঁসা কোন মেয়ে দেখলেই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ানো তোমার স্বভাব—

থর থর করে কাঁপছিল সুধা। নিরক্ত দুটো ঠোঁট। দুগালের রঙ কাগজের মত সাদা। প্রথম ফুঁপিয়ে, তারপরে অঝোর ধারার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে, মা তুমি কি!—আমাকে তুমি অবিশ্বাস করছো?

—কেঁদনা সুধা—সে সুধাকে বলেছিল। হেমাঙ্গিনীকে বলেছিল, আচ্ছা আমি যাচ্ছি। আর কোনদিন আসবো না মাসিমা···তার পরেই নিঃশব্দে মাথা নীচু করে বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল। অস্বস্তিকর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফটাই বলল—আমি নিজে যাইনি। তোর মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল—

—তবে দেখ তো, ফটার কোন দোষ নেই—বলল ন্যাদোন।

—লালু ঠাকুরপো তোমার কিন্তু খুব অন্যায় হয়েছে—পুঁটি বলল।

—মা তোকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন?

—জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের অবস্থা জানার জন্য। তুই নাকি একমাস একটি পয়সা দিস নি মাসিমার হাতে—

—কি। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়াল লালু। ভীষণ ক্রোধে জ্বলে উঠে বলল—পাড়ার লোক ডেকে ডেকে বুঝি বুড়ী আজকাল এইসব দুঃখের কথা বলছে? বলেই ঝড়ের মত সে ছুটে বাইরে চলে গেল।

—ছিঃ ছিঃ কি রকম বিশ্রী একটা কাণ্ড হয়ে গেল। বলল পুঁটি—কোথায় সবাই মিলে গল্প গুজব করবো। তা না—

—ফটা, লালু তো তোর বন্ধু, বলল ন্যাদোন। কিন্তু মাঝে মাঝে তোর ওপর অত ক্ষেপে ওঠে কেন রে?

—ও কিছু না, বলল ফটা, লালু আমাকে খুবই ভালবাসে। তবে ও একটু রগচটা। আর ওর মায়ের সঙ্গে ওর বনিবনা হয় না।

—দিদি আসছে না কেন? কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল পুঁটি—কি হলো, তুমি একটু দেখবে?

—কে যাবে এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে—অসীম বিরক্তিতে মুখটা বিকৃত করে বলল হ্যাদোন—ধীরেনদার জন্যই হয়তো মিউনিসিপ্যালিটি কমিশনারদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরছে।

—আমি পদ্মদির খোঁজে যাচ্ছি বৌদি, ফটা বলল—আমার জানা দরকার জিন্দাবাদ বিড়ির দোকান খুলবে কি না—অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ফটা।

অস্ফুট গলায় বলল হ্যাদোন, আর তোমার দোকান খুলেছে!

—দিদির সম্বন্ধে তোমার এসব কথা আমার মোটেই ভাল লাগে না—বলল পুঁটি।

—তোমার ভাল লাগার জন্য আমি কথা বলিনা। এ বাড়ীর ভিটেয় পিত্তি বমির থু থু ছিটিযে দিয়ে চলে যাবো। তুমি তৈরী থেকো বলছি—শব্দ করে দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ি ধরিয়ে হন হন করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল হ্যাদোন।

হেঁকে বলল পুঁটি—এত রাতে আবার কোথায় যাচ্ছো?

—সারাদিন না খেয়ে আছে দিদি। সে না খেয়ে থাকবে—আমি কি করে খাবো বলোতো! চেঁচিয়ে বলল হ্যাদোন। নিথর হয়ে বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে রইল পুঁটি।

॥ চোদ্দ ॥

নিউ টাউনের দিগ্‌বিকীর্ণ প্রান্তরে ছোট ছোট সাদা একতলা বাংলো বাড়ী-গুলো সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বিজলী বাতির আলোয় ঝলমল করছিল। ডি. এম, এস. পি, সিভিল সার্জ্জনদের বাড়ী ছাড়িয়ে একেবারে খাড়ির পারের ওপারে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে মিউনিসিপ্যালিটির নবনির্বাচিত কমিশনার-দের সভা বসেছে। নিবারণ, নরেন, বিশু আর অন্যান্য বিড়ি কারিগররাও উপস্থিত হয়েছে। তিন নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার সুনীল মোক্তার নাকের বাঁ পাশে কিসমিসের মত আঁচিলটা খুঁটে বলল—চার ও পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের

কমিশনারদের তাহলে দেখা যাচ্ছে ধীরেনবাবু চেয়ারম্যান হলে তাঁদের আপত্তি নেই।

বুক চিতিয়ে বলল দুই নম্বর ওয়ার্ডের বিশুরঞ্জন দাসগুপ্ত—না তা হতে পারে না। এক নম্বরের সুবিনয়বাবু এবং আমি বলছি চেয়ারম্যান আমিই হবো। ইট ইজ এ পিপল্‌স্ ভার্ডিক্ট!

—ধীরেন বাবু কে? তিনি বাইরে থেকে এসেছেন।—বললেন সুবিনয় দাস—আমরা স্থানীয় লোক। এখানকার লোকই আমাকে বেশী ভোট দিয়েছে। তাদের কথা আমাদের শুনতেই হবে।—সুগঠিত ঘাড়টাকে শক্ত করে সে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বিডি ইউনিয়নের সম্পাদক নিবাবণ বলল—কিন্তু আমরা সমস্ত বিড়ি কর্মচারীরা, বাস্তুত্যাগীরা বলছি, ধীরেনবাবুকে চেয়ারম্যানের পোষ্ট দিলে আপনারা সুবিবেচনার পরিচয় দেবেন। কেননা আজীবন তিনি দেশের কাজ করেছেন, দেশের কাজে নেমেই আজ তাঁর এই দৈন্যদশা।

বিশুরঞ্জন বলল, আহা আপনি বললেই তো হবে না, কমিশনারদের ভেতরে মেজরিটি যদি তাঁকে সমর্থন না করেন?

পাঁচ নম্বরের কালীনাথ বলল,—আমি বলছি, ধীরেনবাবুকেই চেয়ারম্যান করা উচিত। তিনি এবার প্রথম কমিশনার নির্ব্বাচিত হয়েছেন এবং বয়সেও তিনি যুবক। সজীব রক্তকেই বেশি মূল্য দেওয়া প্রয়োজন।

—তাহলে তিন নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার সুনীলবাবুর মতামতের ওপরে সব নির্ভর করছে—দুচোখে তীব্র আগ্রহ ফুটিয়ে বলল বিশুরঞ্জন—মোক্তারবাবু বলুন আপনি, যাঁর নাম বলবেন তাঁরই মেজরিটি হবে এবং তিনিই চেয়ারম্যান হবেন।

সুনীল মোক্তারের মরা শকুনের ঘোলা চোখের মত দুচোখে নিরুত্তাপ দৃষ্টি। গম্ভীর গলায় দৈববাণী উচ্চারণের মত করে বলল—বেশ করে ভেবে দেখতে হবে তো, পাবলিক ডিউটি! হুট করে একটা মতামত দিলেই তো চলবে না!

ফাঁক ফাঁক দাঁতগুলোর ভেতরে দেশালাইকাঠি দিয়ে খুঁটতে লাগল সুনীল মোক্তার। আর ঘরের উপস্থিত জনতার জোড়া জোড়া চোখের তীব্র দৃষ্টির সার্চলাইট আছড়ে পড়ল সুনীল মোক্তারের মুখের ওপর। কমিশনাররা ব্যাকুল হয়ে বলল—বলুন। আপনি যাঁর নাম করবেন তিনিই মেজরিটি হবেন, অনুগ্রহ করে শুধু নামটা বলুন।

সুনীল মোক্তার মুখের রেখায় রেখায় পরম নির্বেদের একটা মূর্চ্ছনা ফুটিয়ে শান্ত আর নীরব হয়ে বসে রইল।

ধীরেন্দ্রলালের চোখ দুটোর দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। বলল,—বিশ্বাস করুন মোক্তারবাবু, দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে জনসাধারণের সেবা করবো। শহরের প্রত্যেকটি রাস্তা মেরামত করে দেব।

সুনীল মোক্তার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—মুস্কিল কি জানেন, এসব হল পাবলিকের ব্যাপার। আমি যাঁর নাম বলরো তিনি যদি চেয়ারম্যান হয়ে কাজ কর্ম কিছু না করেন তা হলে পাবলিক আমাকেই দোষ দেবে। তাই ভাবছি—সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ওপর কি না!

নিবারণ বলল—ধীরেনদাকে আপনি তো চেনেন মোক্তারবাবু। সাঁপাহারের ছেলে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জেলে গিয়েছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান দেশকর্মী। দেশের কাজে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সুনীল মোক্তার বলল—দেশের কাজে অনেকেরই ওরকম নিষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু দায়িত্বপুর্ণ পদ পেলেই মনের যে পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। আমি ঢের দেখেছি।

—বলুন মোক্তারবাবু আপনি কি সর্ত্তে রাজী হতে পারেন?—বলল ধীরেন্দ্রলাল।

—পারি এক সর্ত্তে—বলল সুনীল মোক্তার। ঘোলাটে চোখদুটো দগদগে ঘায়ের মত জ্বলে উঠল। ঘেঁড়িয়ে টেনে টেনে হেসে বলল—দেখুন, আমার অভাবের সংসার। আমাকে যদি দুশো টাকা দিতে পারেন, বিশুরঞ্জনবাবু বা ধীরেনবাবু যিনি টাকা দেবেন, তাঁকেই সমর্থন করবো। আর, কথা দিতে হবে, আমাকেই ভাইস চেয়ারম্যান করতে হবে।

—দুশো টাকা!—ধীরেন্দ্রলালের চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটল।

উগ্র ক্রোধে জ্বলে উঠল বিশুরঞ্জন—বলল কেন দেব দুশো টাকা? এ কী মগের মল্লুক?

—বেশ দেবেন না। চেয়ারম্যান হওয়ার আশাও ছেড়ে দিন, বলল সুনীল মোক্তার।

—ধীরেনদা, আমরা চাঁদা তুলে টাকা দেব। আপনি কি বলেন?—বলল নিবারণ।

ফুঁসে উঠল চ্যাপার বিড়ির নরেন—দস্তুরমত জনসাধারণ ভোট দিয়ে ধীরেনদাকে নির্ব্বাচিত করেছে। কেন তিনি টাকা দেবেন?

নান্টু সেন বলল—সত্যি—এ অত্যন্ত অন্যায় প্রস্তাব।

হঠাৎ ধীরেন্দ্রলাল বলল—আচ্ছা আপনারা একটু বসুন। আমি এখুনি আসছি।

মাতলা একটা ঝড়ের মত ছুটে বাইরে চলে গেল ধীরেন্দ্রলাল। সকলেই চকিত চোখে তার অপস্রিয়মান মূর্ত্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। নিবারণ হেঁকে বলল—এই নরেন, বিশু, চল সকলে। ধীরেনদা হয়তো টাকার খোঁজে গেলেন।

'স্পেশাল মতি' বিড়ির বিশু বলল,—যেমন করে হোক ধীরেনদাকে চেয়ারম্যান করতেই হবে। তা না হলে আমাদের এত পরিশ্রম বৃথা হয়ে যাবে—

তারা কলরব করতে করতে বেরিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে ধীরেন্দ্রলালের বাস্তুত্যাগী সমর্থকরাও চলে গেল। বিশুরঞ্জন বলল—বেশ ধীরেনবাবু যদি টাকা আনতে পারেন তা হলে চেয়ারম্যান না হয় তিনিই হলেন কিন্তু তারপরে?

—তারপরে আবার কি? ধীরেনবাবু, কালীনাথবাবু, নান্টুবাবু এবং আমি এই চারজনের মেজরিটিতে আমিই ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে যাবো।—পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বলল সুনীল মোক্তার।

বিশুরঞ্জনের উদ্দীপ্ত মুখে অন্ধকার নেমে এল। কালীনাথ বলল

—ধীরেনবাবুর সাপোর্টার শহরে অত্যন্ত বেশী। তিনশো বিড়ি কারিগর তো আছেই তার ওপরে শহরের বেশীর ভাগ রিফিউজি তাঁকে ভোট দিয়েছে।—

—আমার তো মনে হয়। উনি টাকা সংগ্রহ করতে যান নি—বলল নান্নু সেন—পপুলার লীডার কখনো এসব ব্যাক-ডোর পলিসি সমর্থন করতে পারে না। হয়তো রিফিউজিদের বলতে গেছেন ব্যাপারটা।

ভীত বিবর্ণ হয়ে বলল সুনীল মোক্তার—আমাদের নিজেদের সলাপরামর্শের কথা জনসাধারণকে জানালে বাছাধনকে মজাটা টের পাইয়ে দেব।

—যতই তড়পান না কেন দাদা,—তর্জনী তুলে নান্নু সেন বলল—আপনাদের দিন গেছে। আজ থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে আপনারা পাবনা কি ঢাকা থেকে এসে যেমন প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন এই দেশের বাঁহে মানুষগুলোর ওপর।—ঠিক তেমনি করেই আপনাদের হটিয়ে দিযে রিফিউজিরা শহরের বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব করবে।

খেঁকিয়ে হেসে বলল সুনীল মোক্তার—আরে রেখে দাও তোমার থিয়োরী। নুন আনতে তেল ফুরোয়—ঐ সব পেটের ধান্দায় অস্থির চরম গরীব রিফিউজিগুলো মাতব্বরী করবে—না রোজগারের চেষ্টা করবে?

খাদিমপুরের ঢাকা পাবনা কলোনীতে বাস্তত্যাগীদের জন্য কর্মতৎপরতা দেখিয়ে কালীনাথ ইতিমধ্যেই বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছে। কালীনাথ গম্ভীর হয়ে বলল,—ওরা গরীব নয় সুনীলবাবু। ওদের চোখেমুখে যে শ্রীহীনতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় সেটা শুধু দারিদ্র্যের জন্য নয়। ওরা যে জীবন ফেলে এসেছে, সেই সুন্দর-স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য তীব্র অতৃপ্তিই ওদের মনের ভেতরে সর্ব্বদা তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। ওদের অভাব আছে, অতৃপ্তি আছে বলেই তো ওরাই ব্যবসা বাণিজ্যে লেখাপড়ায় স্থানীয় লোকদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

—শহরের প্রত্যেকটি জনপ্রতিষ্ঠান রিফিউজিদের ক্যাপচার করতে অনেক দেরী আছে,—বলল বিশুরঞ্জন,—আপনারা বললেই তো হবে না। বেশীরভাগই

মজতুর-কুলী-কামিন শ্রেণীর বাস্তুত্যাগী এ শহরে এসেছে। ওদের না আছে কালচার না জানে লেখাপড়া।

—ঐ আনন্দেই থাকুন,—ব্যঙ্গ করে বলল কালীনাথ।

উগ্র ক্রোধে জ্বলে উঠল বিশুরঞ্জন—আমি কি আপনার ঠাট্টার পাত্র? ওরকম ভেঙিয়ে কথা বলছেন কেন?—বলেই সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে সশব্দে একটা কিল বসিয়ে দিলেন।

নান্থ সেন বলল—ঠিকই তো বলেছেন কালীনাথবাবু। আপনি অত চটছেন কেন?

মিউনিসিপ্যালিটির নবনির্ব্বাচিত কমিশনারদের ক্রোধতপ্ত গলার কুৎসিত চীৎকার নিউটাউনের অন্ধকারের বুক ছিঁড়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে জোরপায়ে চলেছে ধীরেন্দ্রলাল পদ্মের বাড়ীর দিকে। কালিয়াগঞ্জ রোডের তুপাশে বুকসমান উঁচু সাঁইঘাসের নিবিড় জঙ্গলে প্রেতিনীর কান্নার মত বাতাস বয়ে চলেছে। তীব্রকণ্ঠ ঝিঁঝির ডাক যেন তার রক্তের ভেতরে বাজনা বাজাচ্ছে। মাত্র তুশো টাকা। তার মনের ভেতরে আনন্দের সুরভি যেন গলে গলে পড়ছে। নিশ্চয়ই পদ্ম তার জন্য তুশো টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারবে। টাকাটা ওদের হাতে জমা দিতে পারলেই সে শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সম্মান পাবে। কত লোক কত অসংখ্য প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তার চোখের সম্মুখ দিয়ে যেন তার নিজেরই মহিমাদীপ্ত জীবনের হাজারো রঙীন ছবির মিছিল শোভাযাত্রা করে চলে গেল। তার মনের ভেতরে স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে দাঁড়াল একটা শুভ সঙ্কল্প। তার সাধ্যমত জনসাধারণের সেবা সে করবে। প্রথমেই রাস্তার ধূলোতে জল দেওয়ার জন্য রাস্তার পাশে পাশে টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে হবে; চন্দ্রনাথ দত্তের ভাঙ্গা ঘণ্টাটাও মেরামত করিয়ে দিতে হবে। তার সুখ্যাতিতে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। অসহ্য অস্থিরতায় তার হাতের আঙুলগুলো নিস্‌পিস করে উঠল।

—এই যে কোথায় চললেন?—হঠাৎ চকভবানীর মোড়ের ওপরে যেন মাটি

ফুঁড়ে উঠে এল নীরদা। হাতে সেই হাতল লাগানো ব্যাগ। মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল—এমন তীরবেগে কোথায় যাচ্ছেন?

পদ্মের বাড়ীতে যাচ্ছি। দুশোটা টাকা আমার বিশেষ প্রয়োজন—হাঁফাতে হাঁফাতে বলল ধীরেন্দ্রলাল। উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখদুটো।

নীরদা বলল—কেন, দুশো টাকা দিয়ে কি করবেন?

—দুশো টাকা সুনীলবাবুকে দিতে পারলেই ওরা সবাই আমাকে চেয়ারম্যান করবে। পরে দেখা হবে।—বলেই ধীরেন্দ্রলাল উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলল ঢাকা কলোনীর দিকে।

চকভবানীর মোড়ে আম কাঁঠাল গাছের নীচে জমাট অন্ধকারে পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল নীরদা। রাস্তার পাশে দশানন সান্যালের বাঁশবনের ভেতরে জ্বলছে রাশি রাশি জোনাকী। এই গাঢ় অন্ধকারের ভেতরে হঠাৎ যেন তার হাঁ-করা ধূ ধূ শূন্য ভবিষ্যৎ দেখতে পেল নীরদা। ধীরেন্দ্রলালের নির্বাচনের সময় অমানুষিক পরিশ্রম করে এবং তার সান্নিধ্যে এসে কেন যেন তার মনে হয়েছিল, জীবনটা একেবারেই রুক্ষ, নিস্তৃণ মরুভূমি নয়। আছে কোথাও কোথাও শ্যামল স্নেহ প্রীতির উর্বর আশ্বাস। বিয়াল্লিশের সেই আগুনঝরা দিনের দেশসেবক ধীরেন্দ্রলালের মনের কোন কোণে হয়তো তার জন্য একটু স্থান আছে। কিন্তু—ভুল! ভুল! ধীরেন্দ্রলাল ঐ কালো কুৎসিত ঢ্যাঙ্গা মেয়েটাকেই ভালবাসে। ওর দড়ির মত ছিবড়ে শুকনো শরীরে কোন অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছে সে, কে জানে? অতৃপ্ত ও ব্যর্থ জীবনের দাহে পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে সে অনেক পুরুষের মনেই রঙ ধরিয়েছে, কিন্তু কাউকেই সে বাঁধতে পারে নি। কি হবে, কী লাভ এই আলেয়ার পেছনে উন্মাদের মত ছুটে? তার মনের তীব্র ব্যথাই চোখের জল হয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ল দুই গাল বেয়ে। তার কানের কাছে মশারা গান সুরু করল। হঠাৎ মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে দূরে রাস্তার ওপরে দুটো আগুনের ফুলকি দেখা গেল। আমগাছের আড়ালে সরে গেল নীরদা।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে সাইকেল চালিয়ে নিউ টাউনের দিকে চলেছে দুইজন লোক। তাদের একজন বলল—গতিক দেখে মনে হচ্ছে, জিন্দাবাদ বিড়ির ধীরেন্দ্রলালই চেয়ারম্যান হবে।

—ওর বিড়ির দোকানের পাশে ঐ যে পেঁয়াজী বিক্রি করে কালো মেয়েটা, ওর জন্য খুব খেটেছে হে।

—আচ্ছা, তুই জানিস, ঐ মেয়েটার মা নাকি একটা বেশ্যা ছিল—

দুটো অগ্নিবিন্দু নিবিড় অন্ধকারে তলিয়ে গেল। কথা বলতে বলতে তারা দূরে মিলিয়ে গেল। আহত একটা সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল নীরদার মনটা। হোক পদ্মের মা-র কলঙ্কিত জীবন। তবুও ওকেই বিয়ে করবে ধীরেন্দ্রলাল। ওরা সুখী হবে। আর সে? পুরাণো একটা বাতিল আসবাবের মত নিউ টাউনের ঐ ঘরের অন্ধকার কোণে পড়ে থাকবে। সারা দেহ ছাপিয়ে বয়সের ভার নামবে। কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে শঙ্খচূড় সাপের মত সাদা চুলের ইসারা দেখা যাবে। তখন কি কেউ তার দিকে তাকাবে! অবসন্ন দেহমন নিয়ে টলতে টলতে সে নিউ টাউনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পদ্মের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো হাত কচলে ধীরেন্দ্রলাল বলল—পদ্ম তুমি অন্ততঃ একশোটা টাকা দাও। চেয়ারম্যান হলেই তোমার টাকা শোধ করে দেব।

—কী আশ্চর্য। তুমি টাকা দিতে যাবে কেন? গণভোটে তুমি নির্বাচিত হয়েছো। জনসাধারণ তোমাকে চেয়েছে। কেন সুনীল মোক্তারকে দুশো টাকা ঘুস দিতে হবে?—মশালের মত জ্বলছে পদ্মের চোখদুটো। উত্তেজনায় থর থর কাঁপছে তার দেহ। কয়েক মুহূর্ত পর বিষন্ন, গম্ভীর গলায় বলল—টাকার জন্যে তুমি ছুটে এসেছো। অথচ তুমি ভেবে দেখলে না, এই টাকার কথা পাবলিক জানতে পারলে, তুমি তাদের কাছে কত ছোট হয়ে যাবে?

—সে আমি জানি। কিন্তু পাঁচজন কমিশনারদের ভেতরে দুইজন আমাকে সমর্থন করেছেন আর দুইজন যে বিপক্ষে। তাই বাকী একজনের কথার ওপরেই সব নির্ভর করছে।

—বেশ তো, তাই বলে তাঁকে খুসী করার জন্য এতবড় অন্যায় করবে তুমি ?—বাঁকা তলোয়ারের মত পদ্মের দৃপ্ত মুর্ত্তিটা জলজ্বল করছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল,—তাঁর যদি তোমাকে পছন্দ না হয়, তোমার নাম বলবেন না।

—বলবেন না! তাহলে আমি চেয়ারম্যান হবো না পদ্ম ?—চেঁচিয়ে উঠল ধীরেন্দ্রলাল।

পদ্ম বলল—তিন বস্তা বিড়ির পাতা কোন বিড়ির দোকানের মালিকের কাছে বন্ধক রেখে দুশো টাকাই তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু শুনে রাখ, একপয়সাও দেব না এবং তোমাকেই চেয়ারম্যান করবো।

—কেমন করে ?—বোকা বোকা চোখে পদ্মের উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাল ধীরেন্দ্রলাল।

শহরের সমস্ত রিফিউজিদের এবং বিড়ি কারিগরকে ডেকে কাল ভুষলায় বাঁদর ব্র্যাণ্ডের বিড়িব কারখানায় মিটিং ডাকো। সেই সভায় তোমার ঐ মোক্তারের সদিচ্ছার কথাটাও বলো। দেখবে কী অবস্থা হয়।

—ঠিক বলেছো পদ্ম—চীৎকার করে উঠল ধীরেন্দ্রলাল। আনন্দে উত্তেজনায় পদ্মের হাতদুটো চেপে ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পদ্ম বলল—তোমার ঘরে শুতে যাও। আমি বড ক্লান্ত। কাল যা হয় করা যাবে—নিঃশব্দ পায়ে তার ঘরের দিকে চলে গেল পদ্ম। বিচিত্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল ধীরেন্দ্রলাল।

॥ পনের ॥

দুইদিন পর। যখন সিনেমা হলের লাউড স্পীকার কোন চটুল হিন্দী গানের সুর শহরের বাতাসে ভাসতে ভাসতে আত্রাই নদীর ওপারে ছড়িয়ে পড়ল, যখন মুখমিষ্টি চায়ের দোকানে কালাদা আসর জমিয়ে জাপানী বাঁশের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বলছিলেন, ঠিক সেই সময় দূরে ভুষলার বাঁদর

ব্র্যাণ্ড বিড়ির কারখানার দিক থেকে বিড়ির কারিগরদের সমবেত গলায় জয়ধ্বনি শোনা গেল, জয় ধীরেন্দ্রলালের জয়!

কালাদা বলে উঠলেন, এই রে, ঐ বিড়ির কারিগরটাই শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় চেয়ারম্যান হলো!

—হবেনা কেন?—বলল, মুখমিষ্টির দোকানদার নিমাই,—খাদিমপুরের ঢাকা কলোনী, বরিশাল কলোনীর সব বাস্তুত্যাগীরা, শহরের সমস্ত বিড়ি-ওয়ালারা একজোট হয়ে ইলেক্টেড কমিশনারদের শাসিয়ে এসেছিল যে।

খদ্দরের হাফপ্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে ফুঁসে উঠল কালাদা, তাই বলে একটা বিড়ি ওয়ালার হুমকী মেনে নিতে হবে?

ঢাকা কলোনীর স্কুল মাষ্টার কানাই বলল—অবস্থা বিপর্যয়ে ধীরেনবাবু আজ বিড়ির কাজ করছেন। উনি তো চিরকালই বিড়ির কারিগর ছিলেন না। আপনিই তো বলেছেন, ধীরেনবাবু আপনার সঙ্গে হিজলী জেলে ছিলেন।

দূর থেকে বিড়িকর্মীদের উল্লাস জয়ধ্বনি শুনেই রাস্তার দুপাশে বাস্তুত্যাগী দোকানদাররা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাদের একজন বলল—এই শহরের সব প্রতিষ্ঠানে আমাদের বাস্তুত্যাগী প্রতিনিধিকে ঢোকাতে হবে। পদ্মার ওপার থেকে সর্বস্ব খুইয়ে এসেছি বলে কি চিরকালই আমরা বিড়ির দোকান কি মুদীর দোকান করেই জীবন কাটাবো?

বিড়ির কারিগরদের বিশাল শোভাযাত্রা আলোর জেল্লা তুলে মুখমিষ্টি দোকানের সম্মুখে এসে পড়ল। রাস্তার দুধারে অজস্র লোক ভেঙ্গে এল নবনির্ব্বাচিত চেয়ারম্যানকে দেখতে। সকলেই বিস্মিত চোখে দেখল—ধীরেন্দ্রলাল তার নীল ছিটের সার্টটা বদলে একটা লংক্লথের পাঞ্জাবী পরেছে। ধুতির কোঁচাটা ডানদিকের পকেটে গুঁজেছে। দারিদ্র্যজীর্ণ ও দৈন্যভরা বিগত জীবনের খোলসটা খুলে সম্মানের আর গৌরবের পোষাক পরে নিজের চারিদিকে একটা মহিমার দীপ্তি ছড়িয়ে চলেছে ধীরেন্দ্রলাল।

মুখমিষ্টি দোকানের সম্মুখে আসতেই তাকে অসংখ্য লোক ঘিরে ধরল।

পানের দোকানদার দেবেন দাস বলল, ধীরেনবাবু, আমাদের পাড়ার দাম-কচুরীপানায় ভরা পুকুরটা পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তো?

স্টেশনারী দোকানদার যতীন হাজরা বলল—একেবারে আমার বাড়ীর ধার ঘেঁসে রামশরণবাবুর ইটের ভাঁটা। সেই ভাঁটার কাজে যে ভাবে মাটি খুঁড়ছে, তাতে আমার বাড়ীর ক্ষতি হয়ে যাবে মশাই। আপনি রামশরণ-বাবুকে বলবেন—

—আচ্ছা—নিশ্চয়ই বলবো,—বলল ধীরেন্দ্রলাল।

শত শত মানুষের অসংখ্য দুঃখদুর্দশার কথা শুনল ধীরেন্দ্রলাল। সে তাদের প্রত্যেককে হাসিমুখে প্রতিশ্রুতি দিল। বিড়ি কারিগরদের শোভাযাত্রা আবার উল্লাসের জয়ধ্বনি তুলে এগিয়ে চলল। মুখমিষ্টি দোকানের সামনে জনতার জটলা বলে উঠল—এবার মিউনিসিপ্যালিটিতে কিছু কাজ হবে আশা করা যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে ধীরেন্দ্রলাল বাড়ীতে ফিরে এল। অসহ্য আনন্দে উত্তেজনায ঘুম এল না তার চোখে। বিছানাটায় যেন অজস্র আগুনের ফুলকি ছড়ানো। সেই প্রথম রামনগরে এসে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পথে পথে একটা ঘেয়ো কুকুরের মত ঘুরে বেড়ানো অনাহারের যন্ত্রণাক্লিষ্ট সেই দুঃসহ দিনগুলো যেন তার জ্বালাধরা চোখের সম্মুখ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে যেতে লাগল।

সেই নিদারুণ দুর্দিনে তাকে আশ্রয় দিয়েছে এই পদ্ম। তাকে আশ্রয় দিল, হাত ধরে আলোয টেনে নিয়ে এল। নিজে তার জন্য অজস্র কটু কুৎসিত কথা শুনে দুঃখ বরণ করে তার জীবনে গৌরবের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু ও কি কিছুই চায় না? ওর যৌবনের রক্তে গুরু গুরু ঝড়ো মেঘের ডাক কি ওঠে না? চিরকুমার ধীরেন্দ্রলালের অনুভূতিতে নারী বিচিত্র এক অজানা মহাদেশের মতই। বৈশাখের আকাশে মেঘ জমেছে থরে থরে। বাইরে একটানা ঝড়ো বাতাসের কান্না। বৃষ্টির টিপ টিপ শব্দে আর বাতাসের হাহা-কারে তার মন কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তার উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ মনটা যেন ফুঁসে উঠে বলল, তুমিপ্রচণ্ড আত্মপ্রেমিক। যে লোক নিজেকে বেশী ভালবাসে

সে আর কাউকে ভালবাসতে পারে না। তুমি পদ্মর চোখের ভাষা পড়তে পারো নি, কেননা তোমার নিজেরই তীব্র লোভের অঙ্কুশের খোঁচায় তুমি মত্তহস্তীর মত দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছো। মুহূর্তে বিছানার ওপরে উঠে বসল ধীরেন্দ্রলাল। সুতীব্র একটা জ্বালা আগুনের ফুলকির মত ছড়িয়ে পড়েছে তার চেতনায়। তার বঞ্চিত ক্ষুধিত যৌবন যেন দুর্যোগের এই মাঝরাতে তারই বুকের ভেতরে মাথা খুঁড়তে লাগল। টলতে টলতে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। চটের পর্দা ঠেলে পদ্মর ঘরে এসে দাঁড়াল।

সল্‌তে পুড়ে বুক জ্বলে নিভে আসছে প্রদীপটা। পদ্মের শীর্ণ একটা হাত ঝুলে পড়েছে খাটের নীচে। ব্লাউজের আড়ালে দৃঢ় কঠিন দুটো স্তনের রেখা ফুটে উঠেছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে মৃদু ওঠানামা করছে বুকটা। ঘুমন্ত পদ্মের উদ্ধত দেহছন্দ তার চেতনাকে বিশৃঙ্খল করে দিল। লুব্ধ, মত্ত একটা সাপের মত সির সির করে তার কাঁপা আঙ্‌লগুলো বুলিযে দিতে লাগল পদ্মের মুখের ওপরে। চাপা গলায় ডাকল, পদ্ম—পদ্ম, ওঠ।

—এ কী! কে?—কে? ভযার্ত গলায় চেঁচিযে উঠল পদ্ম।

তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধীরেন্দ্রলাল বলল—অত জোরে কথা বলো না।' ন্যাদোনরা শুনতে পাবে।

—এত রাত্রে তুমি এমন করে কেন এসেছো বল তো? ছিঃ ছিঃ—

—পদ্ম. এভাবে বেশি দিন থাকা যায না। তুমি তো আমাকে ভালবাসো—বাদ বাকী বক্তব্যটা ধীরেন্দ্রলালের গলার ভেতরে আটকে গেল। কোন কথা বলল না পদ্ম। স্থির নিষ্পলক চোখে ধীরেন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে রইল।

ধীরেন্দ্রলালের মনে হলো যেন পদ্মের চোখের মণি দুটো নেই, দুর্যোগ রাত্রির এই অন্ধকার শিলীভূত হয়ে আছে তার দুচোখে। শিউরে উঠল ধীরেন্দ্রলাল তার মুখের ছায়ায় পদ্ম কি তার মায়ের ভুল ভালবাসার পঙ্কতিলক আঁকা সেই প্রেমিককেই দেখতে পেয়েছে? আবার সাহস সঞ্চয় করে বলল ধীরেন্দ্রলাল—আমি কি তোমার যোগ্য নই পদ্ম?

—যোগ্য নও ! পদ্মর বুকের ভেতরটা যেন ছিঁড়ে গেল। যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটল তার মুখে। বলল,—আমাকে বিয়ে করলে শহরের লোক তোমাকে কি মনে করবে বলো ? বিড়ি কারিগররা, বাস্তুত্যাগীরা তোমাকে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছে, সেখান থেকে তোমাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে দেবে।

—কেন পদ্ম ?

—আমার মায়ের কলঙ্কের কথা সকলেই জানে। ওরা সবাই মনে মনে আমাকে ঘৃণা করে।

ধীরেন্দ্রলালের নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে বসল পদ্ম। তীক্ষ্ণচোখে ধীরেন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে বলল—আমার কি ইচ্ছা জানো ?

—কি ?

—তুমি আরও বড় হবে—আরও অনেক—অনেক বড়। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হবে। এম-এল-এ-হবে। তোমার সুখ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তখন তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবো অনেক দূরে।—পদ্মের চোখদুটো স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে।

ধীরেন্দ্রলাল যেন তার কথা শুনতেই পেল না। বলল—বিয়ে করলে নিন্দে করবে বলছো কিন্তু তোমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকার জন্যে লোকে কিছু কম বলে, ভেবেছো ?

—তা বলুক—যেন বহুদূর থেকে ক্ষীণ গলায় বলল পদ্ম—তোমাকে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে ভালবাসতে গেলেই মনে হয় তোমাকে আমি ছোট করে ফেলবো। তুমি হয়তো দূরে সরে যাবে। আমার জন্মলগ্নে একটা ভয়ানক অভিশাপ আছে কিনা ! তার চেয়ে এই ভাল, তোমার পাশে থেকে যতটুকু পারি তোমার কাজ করব।

—পদ্ম !—ধীরেন্দ্রলালের বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ল রক্তের উচ্ছ্বাস। উত্তেজনার আবেগে সে থর থর করে কেঁপে উঠল। লোলুপ উল্লাসে পদ্মকে বুকের কাছে টেনে আনতে উদ্যত হতেই তার হাত দুটো স্তব্ধ হয়ে গেল। মেটে প্রদীপের ছায়া-কাঁপা আলোয়, ম্লান অন্ধকার ঘরে পদ্মকে মনে হল যেন দেবী-

মূর্তির মত। আশ্চর্য একটা শুচিতার দীপ্তি জ্বলছে তার কালো তনুদেহের চারিদিকে। হঠাৎ ধীরেন্দ্রলালের কাঁধের ওপরে শীর্ণ দুটো হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে পাগলের মত চীৎকার করে উঠল পদ্ম—যাও, তোমার ঘরে যাও। আমাকে এভাবে দুর্ব্বল করে দিও না—

কড়—কড়—কড়াৎ।—দূরে বাজ পড়ল। বৃষ্টির ধারা বন্দুকের গুলীর মত এসে পড়ছে ঝাঁপের জানালায়। ঝড়ের হাওয়ায় উঠোনের মিছরীভোগ আমগাছটা মাথা দোলাচ্ছে। মাতালের মত টলতে টলতে ধীরেন্দ্রলাল পদ্মর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত বসে রইল পদ্ম। যেন কোন অতলান্ত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে তার চেতনা। হঠাৎ বাইরে ক্রুদ্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশে ন্যাদোনের গলার স্বর ভেসে এল,—দিদি, তুই এখনো জেগে আছিস ?

ঝড়ের মত চটের পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল ন্যাদোন। পদ্মের শরীরের ভেতরটা সির সির করে উঠল। তবে কি ন্যাদোন আড়ি পেতে সব শুনেছে! কথা বলতে গেল। কিন্তু কে যেন সাঁড়াসী দিয়ে তার গলা টিপে ধরল। শরীরের সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জমেছে। কিন্তু—

কিন্তু ন্যাদোন সহজ গলায় বলল,—বড় জাম-বাটিটা দে তো দিদি। আমার ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। পুঁটির মাথাটা ভিজে গেছে—

—ও, জাম-বাটি নিবি! পদ্মের শীতল দেহে যেন প্রাণ এল। স্বাভাবিক-গলায় বলল—ঐ তো ঘরের কোণে রয়েছে জামবাটিটা, নিয়ে যা। ঘরামীদের এত করে বললাম ঘরটা ছাইয়ে দিতে, তা কি শুনল ?

একটিও কথা না বলে জামবাটিটা নিয়ে চলে গেল ন্যাদোন। ধুক ধুক করছে পদ্মের বুকের ভেতরটা। নিজের ওপরে তীব্র ঘৃণায় জ্বলে উঠল পদ্ম। একটা প্রেতিনীর মত অশান্ত পায়ে ঘরের ভেতরে পায়চারী করতে লাগল। একটানা বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল কালবৈশাখীর রাত্রিটা।

॥ ষোল ॥

রামনগরের গৌরাঙ্গ টকিজের মালিক গণেশ দত্ত গোঁফ খুঁটতে খুঁটতে বলল হ্যাদোনকে—দেখ ব্যবসার অবস্থা মোটেই ভাল না। কলকাতা থেকে রামনগরের কমিউনিকেশন খুব খারাপ। হেভী ফ্রেট চার্জ হয়ে যায় ফিল্ম এখানে নিয়ে আসতে। সিনেমার ডিষ্ট্রীবিউটাররাও একটু ভাল বই হলেই চড়া পার্সেণ্টেজ হাঁকে। এ ব্যবসাতে বড় 'লস' খেতে হয় আজকাল।

—যেমন করে হোক একটা ব্যবস্থা করুন, হাতযোড় করে বলল হ্যাদোন। আপনি ইচ্ছে করলে একটা গেটকিপারের চাকরী তো দিতে পারেন।

—দেখি, ভাবছি গঙ্গারামপুরে তাঁবু-খাটানো টকি নিয়ে যাবো। তা হলে কয়েকটা লোক লাগবে। যদি এস. ডি. ও. সাহেবের কাছ থেকে লাইসেন্সটা পাই, তাহলে টকি নিয়ে যেতে পারি।

—তখন আমাকে ডাকবেন ত ?

—হ্যাঁ। কিন্তু মাইনে ত্রিশ টাকার বেশী দিতে পারবো না।

—খোরাকী দেবেন তো ?

—দেব।

আনন্দে হ্যাদোনের চোখ দুটো চক চক করে উঠল। বলল—আপনার একশো বছর পরমায়ু হোক।

—থাক, আর থিয়েটার করতে হবে না—বলেই একটা কৌটা থেকে গোল্ড ফ্লেক বের করলেন গনেশ দত্ত।

দুপুরের রোদে আগুন ঝরছে খাদিমপুরের দিক-চিহ্নহীন প্রান্তরে। ধুলোর গন্ধ বেয়ে গরম বাতাস তার চোখে মুখে ঝাপটা দিচ্ছে। তার উত্তপ্ত মনের চিন্তাস্রোতে কতকগুলো সঙ্কল্প যেন গরম জলের মত টগবগ করে ফুটে উঠল। একবার শেষ চেষ্টা করবে সে দিদির বিয়ের জন্য। না হয় ধীরেন্দ্রলালের সান্নিধ্য থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নেবে। না, কোন ভুল নেই! একটা নিষ্ঠুর সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার চোখের সম্মুখে। দিদির জীবনের

চারিদিকে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সে-দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এই বন্ধ্যা মাঠটার মতই মর্মান্তিক রিক্ততায় ওর মনটা হাহাকার করে উঠবে। কেন, কিসের আশায়, ও বিড়িকারিগর আর বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গে গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের কাছে ধীরেন্দ্রলালকে চেয়ারম্যান করার অনুরোধ করেছে, ঐ লোকটার উন্নতির জন্য! ও কি জানে না, নীরদা দেবীর সঙ্গে ধীরেন্দ্রলাল কত ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করে। ধীরেন্দ্রলাল! একরাশ গলিত পিণ্ডের মত তরল ঘৃণা যেন তার গলা বেয়ে নামতে লাগল। মনের ভেতরে ফুঁসে উঠল একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা। হয় ওকে তাড়াতে হবে, না হয়, পুঁটির হাত ধরে সে বাড়ী থেকে চলে যাবে চিরকালের মত। নিদারুণ একটা যন্ত্রণা যেন শতমুখ হয়ে তাকে বিদীর্ণ করতে লাগল।

—আরে এই ন্যাদোন, কোথায় চলেছিস হন হন করে?

ঢাকা কলোনীর একমাত্র চায়ের দোকান 'নবপল্লী চা মজলিস' থেকে হেঁকে বলল, কমিক প্লেয়ার ন্যাপা।

থমকে দাঁড়ালো ন্যাদোন। থিয়েটারের বেহালা বাদক বংশী বলল—আরে আয় না, তোকে তো আজকাল দেখাই যায় না। থিয়েটার হলের দিকেও আসিস না—

—ওকে কি আর এখন পাওয়া যাবে? ও হলো চেয়ারম্যানের ইয়ে—বাদবাকী কথাটা ম্যানেজার শশীর নেশারক্ত দুটো চোখে জ্বল জ্বল করতে লাগল।

—কি সব বলছো তোমরা?—বিরক্ত হয়ে বলল ন্যাদোন—ধীরেনবাবু আমাদের দোকানের কর্মচারী। খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরছিল। আশ্রয় দিয়েছি বাড়ীতে—

—হ্যাঁ, শুধু বাড়ীতে নয়—চোখদুটো আধবোজা করে 'গুজু গুজু' হেসে বলল ন্যাপা—একেবারে দিদির পাশের ঘরে রেখেছিস।

আর সহ্য করতে পারল না ন্যাদোন। রোষে, ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে দুম করে একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল ন্যাপার নাকে। নাক চেপে ধরে অস্ফুট

আর্তনাদ করে বেঞ্চ থেকে গড়িয়ে পড়ল স্থাপা। ছুটে বেরিয়ে গেল হ্যাদোন। মারমুখী হয়ে উঠল থিয়েটারের দলের ছেলেরা। চেঁচিয়ে বংশী বলল—ওকে মেরে তো সব লোকের মুখ চাপা দিতে পারবি না।

—যে মেয়েকে স্বামীতে নেয় না, যার মা কুলটা, সেই মেয়ে পাশাপাশি ঘরে একটা জোয়ান পুরুষের সঙ্গে বাস করেও ঠিক আছে! ও। কী সতীরে ওর দিদি!—নবপল্লী চা মজলিসের বাতাসে তরঙ্গিত হয়ে চলল অশ্রাব্য কুৎসিত কথার ঝড়।

আগুন ধরে গেছে হ্যাদোনের মাথায়। জোর পায়ে সে চলেছে বাড়ীর দিকে। বুড়ো বেলগাছটার নীচে লালু আর ফটার সঙ্গে দেখা হল। লালু বলল—কি রে হ্যাদোন, কি হয়েছে তোর?

কোন কথা বলল না হ্যাদোন। ক্ষ্যাপা মোষের মত মাথা নীচু করে ছুটে চলে যেতে লাগল। ফটা বলল—আমাদের জিন্দাবাদ বিড়ির দোকান তো আবার খুলবে রে। পদ্মদি বলেছেন, কালই দোকান চালু হবে—

—নিকুচি করেছে তোদের দোকানের!—চাপা বিষাক্ত গলায় বলল হ্যাদোন। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল ফটা আর লালু, তাদের চোখে অতল বিস্ময়।

ফটাদের বিদায় করে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়েছিল পদ্ম বারান্দায় একটা শীতলপাটির ওপরে। ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে আসছে। কিন্তু একটা দুশ্চিন্তায় জ্বলে যাচ্ছে তার মনের ভেতরটা। ধীরেন্দ্রলাল এখন চেয়ারম্যান হয়েছে। হয়তো আর তার বাড়ীতে সে থাকবে না। লোকেই বা কি বলবে! সে সামান্য একটা বিড়ির দোকানের মালিক, বাজারের রাস্তায় বসে তোলা উনানে পেঁয়াজীও বিক্রী করতে হয় তাকে! যতই ঘনিষ্ঠতা থাক লোকের চোখে, তাদের মধ্যে আকাশ ও মাটির ব্যবধান।

উঠোনে দাঁড়িয়ে বোমার মত ফেটে পড়ল হ্যাদোন। হাতটা মুঠো করে চেঁচিয়ে বলল, দিদি তুই পরিষ্কার করে বল ধীরেনবাবুকে বিদায় করছিস কি না?

—কেন? কি অপরাধ করেছেন তিনি?—নিভু নিভু গলায় বলল পদ্ম। বুকটা দুরু দুরু কেঁপে উঠল। তবে কি সেই কালবৈশাখীর রাত্রের সব কথা ন্যাদোন জানে।

—ধীরেনবাবু বাড়ীতে থাকলে তোর নামে লোকে যা-তা কুৎসা রটায়। সেই সব খারাপ কথা আমাকে শুনতে হয়—

বিড়ির দোকানের সমস্যা নিয়ে পদ্মের মন মেজাজ ভাল ছিল না। তার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। বলল—লোকে যা খুসী বলুক, আমার কিছু এসে যায় না। তুই আমাকে অবিশ্বাস করিস কি না, তাই বল?

তার কথার উত্তর না দিয়ে ন্যাদোন বলল—ধীরেনবাবুকে অন্য কোথাও বল না থাকতে?

—কেন? কি করেছেন তিনি? সে না থাকলেও লোকে আমাকে সতী-সাবিত্রী বলবে না।

—কেন বলবে শুনি! বর্ষায় রাত দুপুর পর্য্যন্ত তোরা ঢলাঢলি করবি, আদর সোহাগের—।

—কি?—হিংস্র সাপিনীর মত দুলে উঠল পদ্মর দীঘল দেহটা। ঝলকে ঝলকে আগুন ঝরছে তার দুচোখে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল—এত বড় কথা বললি তুই। তোর মুখে আটকালো না। আমাকে তুই সন্দেহ করছিস!

—সন্দেহ, অবিশ্বাস এসব কথার মানে বুঝছি না। স্পষ্ট দেখলাম—রাত দুপুরে ধীরেনবাবুর ঘাড়ে হাত দিয়ে কথা বলছিস তুই—

—চুপ কর—চিৎকার করে পদ্ম বলল—দূর হয়ে যা তুই আমার সামনে থেকে—

রান্নাঘর থেকে ঝাঁপিয়ে বাইরে এল পুঁটি। ন্যাদোনের হাত দুটো ধরে অনুনয়ে ভেঙ্গে পড়ে বলল—ছিঃ ছিঃ কি তুমি বলছো দিদিকে। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আগুনের হল্‌কার মত সাঁ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল ন্যাদোন।

আহতা মার্জারীর মত ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গী করে বলল পদ্ম—এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই! নির্গুণ পুরুষের তেজ কত! খসে পড়েছে পদ্মের আঁচল। ক্রুদ্ধ বুকটা দ্রুততালে ওঠানামা করছে।

কিন্তু পদ্মের কথাটা তীরের মত বিঁধে গেল পুঁটির মনে। এমনিই তো সে ঘর ছেড়ে চিরকালের মত চলে এসেছে। বেকার স্বামীর ভালবাসার সেতু ধরে এই দরিদ্র সংসারের ওপরে একটা ভারী পাথরের মত চেপে বসেছে। তাই সর্বদা একটা তীক্ষ্ণ হীনমন্যতায় ছেয়ে থাকে তার মন। তার মনের দুর্ব্বলতম স্থানে তীব্র আঘাত করেছে পদ্ম। চোখ ফেটে জল এল পুটির। পদ্মকে আর একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে রান্নাঘরে চলে গেল।

দুপুরের রোদের রঙ গেরুয়া হলো। উঠোনের কোণে কোণে ম্লান ছায়া জমেছে। রান্নাঘরের দুয়ারটা হাট করে খোলা আছে। হাঁড়িতে ভাত শুকিয়ে কড়কড়ে হযে গেছে। পদ্ম, পুঁটি কেউ দুপুরে খায় নি। হঠাৎ ঝড়ের মত ন্যাদোন এল। বলল—কৈ, পুঁটি বাইরে এস। কি নেবে নাও। চল এখান থেকে চলে যেতে হবে—

বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে পদ্ম। নিষ্পলক ধু ধু শূন্য দৃষ্টি। বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে তার চেতনা।

বাইরে এল পুঁটি। গালের ঠেলে ওঠা হাডের ওপরে অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করছে। নিস্তেজ গলায় বলল—কোথায যাবে? চাকরী ঠিক করেছো?

—বাজার পাড়ায় এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকবো, কযেকদিন। গনেশ দত্ত গঙ্গারামপুরে 'সিনেমা হল' 'ষ্টার্ট' দিলেই চলে যাবো সেখানে।—মাথা নীচু করে বলল ন্যাদোন—তুমি তৈরী হযে নাও আমি সাইকেল-রিক্সা ডাকতে যাচ্ছি—

সন্ধ্যার বিষণ্ণ কোমল অন্ধকার নামল চারিদিকে। একটা বড় টিনের ট্রাঙ্ক আর কয়েকটা পুঁটলী কুলীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বড় রাস্তার দিকে গেল ন্যাদোন। পুঁটি লঘু পায়ে পদ্মের কাছে এগিয়ে এল। হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম করে জলভরা দুটো চোখ তুলে বলল—দিদি, কোন অপরাধ করলে

ক্ষমা করো। সিঁথির এই সিঁদুরের দিকে তাকালে তোমারই কথা মনে পড়ে। সেই দুঃসময়ে—

—পুঁটি!—নিরুদ্ধ বেদনায় স্তব্ধ নিষ্প্রাণ পাথরের মত পদ্মের দেহটা তীব্র কান্নার আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল। অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়ল সে মাটিতে, অস্পষ্ট গলায় বলল—তোরাও আমাকে ভুল বুঝলি!

ত্রস্ত হাতে তাকে তুলে ধরে পুঁটি বলল—না, না, আমি ভুল বুঝি নি দিদি! সত্যিই তো দু-দুটো লোক—একেবারে বসে বসে খাচ্ছি। বাইরে গেলে হয়তো ও কিছু রোজগার করতে পারবে। তাই যাওয়াই ভাল—

—কৈ গো এস—রাস্তার ওপর থেকে ন্যাদোনের অধৈর্য্য চীৎকার ভেসে এল। পদ্মের নিবিড় স্নেহের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আবার তাকে প্রণাম করে বাইরে চলে গেল পুটি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কোমল গলায় বলল—ওর ওপরে তুমি রাগ করো না দিদি! ও তোমাকে খুবই ভালবাসে, তোমার অমঙ্গল হবে ভেবেই অস্থির হয়ে ওঠে। যদি পারো, ধীরেনবাবুকে বিয়ে করো—দিদি!

কোন কথা বলল না পদ্ম। স্থির দুটো চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি পুঁটির মুখের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোমটা একটু টেনে ধীর পায়ে চলতে লাগল পুঁটি। সন্ধ্যার ছায়া ছায়া অন্ধকারে দূরে ঢাকা কলোনীর সরু রাস্তা থেকে বড় রাস্তার দিকে তার অপস্যমান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন চমকে জেগে উঠল পদ্ম। চেঁচিয়ে বলল—কোন কষ্ট হলে জানাস কিন্তু পুঁটি—

দূর থেকে পুঁটির ক্ষীণ গলার আওয়াজ এল—নিশ্চয়ই জানাবো দিদি। ও কিছু না জানালেও আমি তোমাকে খবর দেব—

বাড়ীর বাইরে নিমগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটা ঠুঁটো তালগাছের মত বসে রইল পদ্ম। এক মুহূর্তে যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। ন্যাদোন! তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে যাকে মানুষ করেছে! দুর্দিনের দুঃখ-কষ্টের আঁচ একটুও পেতে দেয়নি তাকে! লোকের তুচ্ছ কথায় তাকে অবিশ্বাস

করে চলে গেল। মানুষের স্নেহবন্ধন কত ভঙ্গুর, মানুষের ভালবাসা কত ক্ষীণায়ু! ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা বেদনার নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে তার পাঁজর থেকে। সন্ধ্যার স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে বাড়ীতে বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি মুখর হয়ে উঠল। হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বলল পদ্ম—ঠাকুর, দেখ আমার হ্যাদোনের যেন কোন কষ্ট না হয়। আমি ছাড়া সংসারে আর ওর কেউ নেই।

॥ সতেরো ॥

জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের তালা খুলেই চেঁচিয়ে বলল লালু—দেখেছিস ফটা, ধীরেনদার টাঙ্গানো দেশ-নেতাদের ছবিগুলোয় কত ধুলো জমেছে! ময়লা একটা ন্যাকড়া দিয়ে জোরে জোরে ঘসে প্রতিটি ফটোর ধুলো মুছতে লাগল লালু। পদ্ম নিজেই দোকানে এল। বলল—আজ দুপুরে আরও দুজন কারিগরকে আসতে বলেছি, তিনদিনের ভেতরে সমস্ত পাইকারদের অর্ডার সাপ্লাই করতে হবে—

—কোন কোন পাইকারের অর্ডার আছে, পদ্মদি?

—হিলি, তপন, গঙ্গারামপুর আর কুশুমণ্ডী। এরা সবাই বলেছে, তিনদিনের ভেতরে মাল না পেলে স্পেশাল মতি, কি বাঁদরব্র্যাণ্ডের ঘরে চলে যাবে—

—বিড়ির পাতার স্টক তো বেশী নেই পদ্মদি—বলল ফটা।

—পাতার চালান কালিয়াগঞ্জ ষ্টেশনে এসে পড়ে আছে। আজ দুপুরের মোটরে চলে আসবে—

দুরু দুরু কাঁপছে লালুর বুক। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না পদ্মের মুখের দিকে। সাপের মত ছোবল দিল তার মনে একটা অশুভ আশঙ্কা। পদ্মদি, ফটা ওরা কি তাকে সন্দেহ করছে? দোকানের চাবি যে তারই কাছে থাকে।

নিশিরাতের অন্ধকারের আড়ালে সে গা ঢাকা দিয়ে এসেছে দোকানে।

ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগে বোঝাই করে বিড়ির পাতা নিয়ে টুলুর সঙ্গে খড়মপুর গ্রামের পরেই পাকিস্তানের সীমানায় গিয়ে বিক্রী করেছে ডবল দামে। যে পদ্মদি তাকে এত স্নেহ করে তারই ক্ষতি করতে তার বুক ভেঙ্গে গিয়েছে। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর গঞ্জনা, তার অশ্রাব্য কটু উক্তিতে সে মরিয়া হয়েই একাজ করেছে। যেদিন তার মা বলল—সপ্তাহ কাবারে আগের মত মাইনে আনতে না পারলে খেতে দেবে না, সেইদিনই রাত্রে প্রায় দশ টাকা রোজগার করে নিয়ে এসেছিল। না, পদ্মদির এত বড় ক্ষতি আর সে করবে না। নিজের দুষ্কৃতির অনুভূতি তীব্র বিষের মত জ্বালা ছড়িয়ে দিল তার রক্তে।

—বিড়ির কেঁদ পাতা এলে খুব হিসেব করে খরচ করবি বুঝলি লালু? —বলল পদ্ম—পাতা কিন্তু খুবই 'স্মাগলিং' হচ্ছে বর্ডারে। শিলিগুড়ি থেকে পাতার চালানও ঠিকমত আসছে না।

—খুব যত্ন করে রাখবো পদ্মদি। একটা পাতাও তোমার নষ্ট হবে না।— একটু থেমে চিন্তিত হয়ে বলল ফটা, কিন্তু পদ্মদি, পাতার গাঁটরীর দড়ি ঢিল দেখি মাঝে মাঝে। ভেতর থেকে পাতা কেউ সরাচ্ছে না কি!—দুরু দুরু কাঁপছে লালুর বুক। চোখে ভীত দৃষ্টি।

পদ্ম বলল—না, না, আমার এখানে সেরকম লোক কেউ নেই। তোর যদি সন্দেহ হয় তাহলে রাত্রে দোকানে থাক না?

তাই থাকবো পদ্মদি, বলল ফটা।

আকাশের মাঝখানে সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে পদ্ম বলল—অনেক বেলা হয়েছে। আমি যাই। তোরা কাজ কর।

মাথা নীচু করে কাজ করে চলেছে লালু। ঘন সবুজ সুতো দিয়ে এক একটা বিড়ি বাঁধছে। বাণ্ডিলে ভারতমাতার ছবি আঁকা জিন্দাবাদ বিড়ির লেবেল লাগিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ধামার ভেতরে। কয়লার উনানে গন গন করছে আগুন। উনানের ওপরে একটা তারের চালুনির ভেতরে রাশি রাশি বিড়ির বাণ্ডিল সেঁকতে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত হাতে বিড়ির পাতা কেটে চলেছে ফটা। ঘরের বাতাসে কাঁচির কুচ কুচ শব্দ ভাসছে। পাথরের মত

নির্বিকার ফটার মুখ। চোখের তারায় শান্ত বিষন্নতা। তার মুখের দিকে তাকিয়েই লালুর সচল হাতদুটো স্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে এসে ফটার পিঠে হাত রেখে বলল, তুই কথা বলছিস না কেন রে? নিশ্চয়ই রাগ করেছিস আমার ওপরে না?

কোন কথা বলল না ফটা। সে লালুকে চেনে। ওর বাইরেটাই অমন রুক্ষ আর উগ্র। কিন্তু ওর মত উদার আর নরম মনের মানুষ সহসা দেখা যায় না। কিন্তু কেন যেন হেমাঙ্গিনীর তীব্র অনমনীয় জেদ আর ভয়ঙ্কর একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওর রোষদীপ্তি ঝলসে ওঠে না। কেন? ফটা বুঝতে পারে না, শুধু দারিদ্র্যের অসহনীয় দুঃখকষ্টই কি তাকে চরম সর্ব্বনাশা অভিশাপের দিকে নিয়ে চলেছে? অভাব তো সকলেরই আছে। তাই বলে নিজের মেয়ের ভালমন্দ আবার কে দেখে না!

নিটোল স্বাস্থ্যপুষ্ট সুধার যৌবনের লোভ দেখিয়ে গঙ্গারামপুরের ড্রাইভার রণুর অনেক টাকা নিয়েছে হেমাঙ্গিনী। আবার কয়েকদিন হলো, সে দেখেছে, সুধাদের বাড়ীর সম্মুখে আমড়া গাছটার নীচে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হাতে একটা এ্যাটাচী কেস নিয়ে, সিল্কের জামাপরা এক ভদ্রলোক ঘুর ঘুর করছে। হয়তো হেমাঙ্গিনীর নতুন শিকার!

—কি রে ফটা আমার দিকে তাকাবি না?

—সেদিনই তো বলেছি তোর ওপরে রাগ করি নি।

—সত্যি বলছিস তো?—খুসী উপছে পড়ে লালুর চোখে। কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে ম্লান গলায় বলল—দেখ, অভাবে আর মা-র অত্যাচারে বুদ্ধিশুদ্ধির হুঁস থাকে না ভাই! আমাদের কলোনীর লোক তো আমাদের বাড়ীর ওপরে খাপ্পা হয়ে উঠেছে।

—কেন?

—বাড়ীতে বড় মেয়ে আছে। আর মা নিত্য নতুন ছেলে নিয়ে আসছে বাড়ীতে। সুধাকে দিয়ে চা তৈরী করে জোর করে ওকে পাঠাচ্ছে—তাদের কাছে। সুধা চোখের জল মুছতে মুছতে মা যা বলে সবই করে।

—তুই বুঝি কেবল হাঁ ক'রে সব দেখিস্?

—কি করবো বল? মা-র চোখের দিকে তাকালে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কোনদিন আমি মা-র মুখের ওপর একটা কথা বলতে পারি না।—অসহায় একটা জানোয়ারের মত সে ফটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ সোরগোল তুলে বিড়ি ইউনিয়নের সম্পাদক নিবারণ এল। তার সঙ্গে এল নরেন, বিশু আরও দু'একজন বিড়ি কারিগর। নিবারণ বলল, ধীরেনদা, কৈ রে ফটা?

—তিনি তো আজকাল দোকানে আসেন না।

—আজ সন্ধ্যায় তোরা দুজনই ভুষলার আমবাগানে বাঁদরব্র্যাণ্ডের বিড়ির কারখানায় আসবি। আমাদের বিড়ি ইউনিয়নের মিটিং আছে—

—মিটিংএ কী বিষয়ে আলোচনা হবে নিবারণদা?

—আমাদের মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন?

—আরে না, না। তোরা আছিস তোদের তালে।—বিরক্ত হয়ে নিবারণ বলল,—বর্ডারে বিড়ির পাতার চোরাই চালান করতে গিয়ে চারজন বিড়ি কারিগর ধরা পড়েছে। তারা এপারে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের জেলে আছে। ধীরেনদাকে দিয়ে ডি. এম-কে বলাবো ওদের জন্য। একটু তদ্বির না করলে কি গরীব বেচারারা কোনদিন ছাড়া পাবে?

—কিন্তু কেন, কিসের জন্য ওরা স্মাগলিং করতে চায় আগে দেখা উচিত নিবারণদা,—বলল লালু।

—তুই হয়তো বলবি, ওদের অভাব আছে।—গম্ভীর হয়ে বলল ফটা,—কিন্তু অভাব আছে বলেই কি চুরি করতে হবে?

লালু যেন তার কথা শুনতেই পেল না। বলল,—মিউনিসিপ্যালিটির অফিসেই হয়তো ধীরেনদাকে পাবেন।

—চল সব, ধীরেনদাকে এই বেলাই জানাতে হবে, সভ্যদের বলল নিবারণ—বিকেলে হয়তো আবার অন্য কোন কাজে জড়িয়ে পড়বো।

তারা চলে গেল। একটু পরেই ড্রাইভার রণু এল। উস্কোখুস্কো চুল। নেশারক্ত দুটো চোখ।

গম্ভীর গলায় বলল, লালুবাবু বাইরে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

—আমার সঙ্গে কথা!—দুর্বোধ্য একটা বিস্ময়ের খোঁচায় লালুর চোখের তারা দুটো ছটফট করে। তবুও বলল—তোমার তো ভাই আমাদের বাড়ীতে অবাধ গতিবিধি। সোজাসুজি মা-র কাছে চলে গেলেই পারতে।

লালু রণুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফটার বুকে তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তির কাঁটা বিঁধল।

একটা কুমারী-তনুর চারিদিকে যেন রাশি রাশি সরীসৃপ বিষাক্ত ফণা তুলেছে। হেমাঙ্গিনীর উগ্র লোভ, রণুর মত পুরুষের জৈব ক্ষুধা—না আর ভাবতে পারে না ফটা। তার ঝিম ঝিম চেতনার ওপর দিয়ে ছল ছল করে দুলে গেল একটা ছায়াশরীর, ছায়ামনা সুধা। কত নির্জন দুপুরে, সুধা তার কাছে এসেছে আর উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ গলায় বলেছে তার মায়ের দুষ্প্র-বৃত্তির কথা। তার হাসি-লাস্যের বদলে কিছু অর্থ রোজগারের চেষ্টার কথা। খাঁচায় বন্দী, নিরুপায় একটা পশুর মত সে তীব্র যন্ত্রণায় ফুঁসে উঠেছে। কতবার যে মনে হয়েছে, ক্লেদ পঙ্কিলতার ঐ দুঃসহ কারাগার থেকে তার বহু বিনিদ্র রাতের স্বপ্নকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু মৃতবৎসার শিশুর মত তার হাজারো আশার শিশুরা একটু হাত-পা ছুঁড়েই স্থির হয়ে যায়। তার চেতনাকে কে যেন শক্ত সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে বুড়ী-মা, ছোট ছোট দুটো ভাই বোন আর সংসারের হিংস্র দারিদ্র্য। সুধার জলভরা চোখের করুণতাকে কোন আশা দিয়েই রঙীন করে দিতে পারে না। শুধু শিরার নক্সাকাটা এই আঙুলগুলো তীব্র অস্থিরতায় নিসপিস করে ওঠে।

একটু পরেই লালু ফিরে এল। গম্ভীর থমথমে মুখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, না, শালা এখান থেকে পালাতে হবে। মা-র জ্বালায় পাগল হয়ে যেতে হবে।

—কেন কি হলো?

—সুধার সঙ্গে বিয়ে দেবে এই লোভ দেখিয়ে মা রণুর কাছে, পাবনা

কলোনীর হরনাথের কাছ থেকে অনেক টাকার জিনিস নিয়েছে। এখন মা বলছে, সুধাকে নারী মঙ্গল কেন্দ্রে পাঠাবে।

—ঐ যে এ্যাটাচী কেস বগলে নিয়ে আর চশমা পরে একটা লোক তোদের কলোনীতে রোজ যায়, উনিই কি নারী মঙ্গল কেন্দ্রের সেক্রেটারী?

—হ্যাঁ।

—শুনেছি মেয়েরা সেখানে ভর্ত্তি হলে সবকার থেকে ষ্টাইপেণ্ড দেয মাঝে মাঝে।

—ষ্টাইপেণ্ড মানে টাকা তো?—চোখ দুটো নাচিযে লালু বলল,—টাকার গন্ধ পেলে মা সব করতে পারে। আগে কিন্তু এরকম ছিল না, বুঝলি!

—তা, ঐ মেযেদের আশ্রমে ওকে পাঠালে মন্দ হয না, ফটা বলল।

—কিন্তু হরনাথ,—রণুর দল সবাই যে আমার ওপরে মারমুখী হযে উঠেছে। তার কি করবো?—বাঁ হাতের একটা আঙুল দিযে কপালটা টিপে ধরে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল লালু। প্রহৃত পশুর মত হঠাৎ চীৎকার করে বলল—হা ভগবান কী পাপ যে করেছি!—সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ আঠারো ॥

তিন দিন পর। নিউ টাউনের অবারিত প্রান্তরে রক্ত-চন্দনেব মত ঝবছে সকালের রোদ। দূরে আত্রাইয়ের ওপারে কাজল কালো দিগন্তের দিকে তাকিযে নীরদা বলল—দেখ, তোমার কিন্তু আর পদ্মর ওখানে থাকা চলে না। এখন তুমি চেয়ারম্যান। একটা বিড়ির দোকানের মালিকেব বাড়ীতে তুমি থাকবে?

—বিড়ির দোকানের মালিক হতে পারে—ধীরেন্দ্রলাল বলল—কিন্তু দুর্দিনে ও আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, দুবেলা খেতে দিয়েছে—

—দূরে থেকেও তার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারবে। তার বাড়ীতে

থাকা তোমার প্রেস্‌টিজের দিক থেকে—কথা শেষ করল না নীরদা। ঘন নীল সিল্কের রুমাল দিয়ে নাকের কোণে, গলার খাঁজের পাউডার মুছতে মুছতে তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করল।

করুণ হয়ে উঠেছে ধীরেন্দ্রলালের মুখখানা। নীরদার ঠোঁটের কোণে মিহি হাসির রেখা ফুটল। সেন্টিমেণ্টাল ফুল! সে মনে মনে বলল, উপকার করেছে বলে ভালবেসে তার প্রতিদান দিতে চাও, না ওর দুঃখ কষ্টের জীবনের জন্য করুণা। মেয়েদের অসহায় অবস্থা দেখলেই পুরুষ মানুষ ভালবেসে ফেলে। মিষ্টি হেসে নীরদা বলল, কোথায় থাকবে, সে তুমি ভেবে ঠিক করো পরে। তবে জেনে রেখ, যারা বড় হয়, সবাইকে ছাড়িয়ে যায়, তারা পুরনো দিনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। তারা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে অতীতকে। ভবিষ্যতের দিকেই থাকে তাদের দৃষ্টি।

—তুমি ঠিকই বলেছো নীরদা। আমি অন্য একটা বাসা ভাড়া নেব। সত্যিই ওখানে থাকা ঠিক নয়।

সাফল্যের হাসি ঝিকমিক করে নীরদার মুখে। আরেকটা তীর নিক্ষেপ করে। ধীরেন্দ্রলালের ঘন কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলিযে সস্নেহ গলায় বলে—দেখ নিউ টাউনে জলের বড় কষ্ট। আমি বাড়ীতে একটা পাতকুযো খুঁড়তে চাই। আমাকে শ খানেক টাকা দেবে?

—শ খানেক টাকা! অত টাকা আমি কোথায় পাবো?

—কি যে বলো তুমি! কিশোরী মেয়ের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলল নীবদা—তুমি চেয়ারম্যান! তোমার এখন টাকার অভাব?

—ছিঃ ছিঃ এসব কথা বলো না নীরদা। সত্যি তুমি যদি ভালবাসো তাহলে আমার মঙ্গল কামনা করো।

—না নেতা হওয়ার যোগ্য নও তুমি। ভলাণ্টিয়ার হযে থাকাই তোমার উচিত ছিল—তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে নীরদা বলল, অন্যলোক চেযারম্যান হলে এরই মধ্যে দেখতে তার স্ত্রীর গায়ে নতুন গয়না উঠতো। বাড়ীতে টিউব-ওয়েল বসতো।

—পাবলিক মানি ভেঙ্গে নিজের বাড়ীতে টিউবওয়েল।—দুর্বোধ্য একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি ফোটে ধীরেন্দ্রলালের চোখে।

খিল খিল করে হেসে উঠল নীরদা। বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি মহাভারত থেকে নেমে এসেছো ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

ধীরেন্দ্রলাল মাথাটা প্রবলভাবে ঝাঁকিয়ে, আর্তগলায় বলল,—না, না, পাবলিক মানিতে আমাকে হাত দিতে বলো না।

—তুমি একটা মারাত্মক ভুল করছো। যুগটা বদলেছে। সত্য, নীতি, আদর্শের কথা যারা বলে, তারা হয় জীবনযুদ্ধে বিপর্য্যস্ত, হতাশ, ব্যর্থ, না হয় পাগল।

—কেন, বলছো কি তুমি? নীতি, আদর্শ না থাকলে যে মানুষের কিছুই থাকবে না। সুতোকাটা ঘুড়ির মত হাওয়ায় ভেসে গোঁত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে যাবে।

—টাকা থাকলেই মানুষের সব থাকে। তোমার ওসব ছেঁদো কথা রেখে দাও। সম্পদ দিয়েই মানুষের সামাজিক মর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠার বিচার করা হয়।

স্থির অপলক চোখে কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ধীরেন্দ্রলাল। বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলনের সেই অগ্নিক্ষরা দিনে যাকে মনে হতো পবিত্র একটা জ্যোর্তিময়ী দীপশিখা, আজ তারই চোখে ধক ধক করে জ্বলছে সর্বনাশের আগুন। বিধাতা ওকে সব দিক থেকে মর্মান্তিক ভাবে বঞ্চিত করেছে বলেই হয়তো ও মানুষের সব সৎ ও মহৎ প্রেরণার বিরুদ্ধে বিষাক্ত আক্রোশে জ্বলে পুড়ে মরছে। শব্দ করে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ল ধীরেন্দ্রলাল। বলল, আমি আজ যাই নীরদা, তোমাকে টাকা দিতে পারবো না।

—তুমি রাগ করছো?—পরম মমতায় ধীরেন্দ্রলালের বুকে একটা হাত রেখে সে বলল।—তোমার মঙ্গলের জন্যেই বললাম, যে যুগের যে রীতি।

তুমি চিরকাল ত চেয়ারম্যান থাকবে না। তোমাকে গুছিয়ে নিতে হবে তো? তুমি জানো না, তোমাকে ঘিরে আমার কত আশা!

ধীরেন্দ্রলালের বুকটা কেঁপে উঠল। নীরদার হৃৎপিণ্ডের দুরু দুরু ধ্বনি যেন তার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঝড়ের তাণ্ডব তুলল। হঠাৎ ব্যগ্র দু বাহু বাড়িয়ে লোলুপ উল্লাসে তাকে সজোরে বুকের ভেতরে টেনে নিল।

—আঃ ছাড়ো! কেউ দেখে ফেলবে—মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল নীরদা। সিঁদুরে মেঘের রং ধরেছে তার মুখে।

কামনার জ্বরে ধক ধক করে জ্বলছে ধীরেন্দ্রলালের চোখদুটো। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নীচু করে বলল—তুমি কিছু মনে করলে নীরদা? আমি বড় —বাদবাকী কথাটা তার গলার ভেতরে আটকে গেল। মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ধীরেন্দ্রলাল।

বারান্দায় এসে চেঁচিয়ে বলল নীরদা—সন্ধ্যাবেলা এস কিন্তু।

নিউটাউনের মাঠের ওপরে উত্তপ্ত বাতাস যন্ত্রণার গোঙানির মত আর্তনাদ করছে। দূরে দিগন্তের কোলে রোদের তাতারসি কাঁপছে তৃষ্ণার ছবির মত। তারই জীবনের অতৃপ্ত বাসনার মত যেন দাউ দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে মাঠটা। হ্রস্ব থেকে হ্রস্ব হয়ে ধীরেন্দ্রলালের মিলিয়ে যাওয়া মূর্ত্তির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল নীরদা। কে জানে কোন অজানিত কারণে তার বুকের ভেতরে ঢিপ ঢিপ করে আছাড় খেতে লাগল নিঃশ্বাসগুলো।

দুপুরে জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানে কারিগরদের বসিয়ে রেখে বাড়ীতে খেতে চলেছে ফটা। আত্রাইয়ের খালের পাশে সরু পথ ধরে সে উকিল পাড়ার দিকে হাঁটছে। হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এল পাবনা কলোনীর একটা ছেলে। বলল—ফটাদা সুধাদি আমাকে পাঠালো। মোটর ড্রাইভার রণুর দল আর বাসের মালিক হরনাথ সুধাদির মাকে খুব শাসাচ্ছে।

—আমি কি করবো?—বিরক্ত হয়ে বলল ফটা—যার যেমন কাজ তার তেমন ফল তো পেতেই হবে। টাকার লোভে বাজে লোককে অত প্রশ্রয় দিয়েছে কেন? তখন মনে ছিল না!

—একটা কিছু হলে, সুধাদির জীবন নষ্ট হয়ে যাবে ফটাদা। করুণ হয়ে উঠল ছেলেটির মুখ।

ফটার চোখে নিরুপায় দৃষ্টি, বলল—আমার কিছুই করার নেই ভাই—দ্রুত পায়ে সে হাঁটতে লাগল।

আশ্চর্য জীব এই মেয়েরা! চতুর, সংযত, আত্মস্থ, যে কোন অবস্থায় নমনীয়, কখনো পরিবেশকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। কেন সুধা ওর মা-র কথায় ঐ চরিত্রহীন ছেলেগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি করে? ওদের সঙ্গে বসে চা খায়, খিলখিলিয়ে হাসে! ওর মা-র মুখে থুথু ছিটিয়ে বেরিয়ে চলে আসতে পারে না? কোন আশ্রমে গিয়ে সেলাইয়ের কাজ করে স্বাধীনভাবেও তো বাঁচতে পারে! ইচ্ছে করলে সে ঐ নারীমঙ্গল কেন্দ্রের সম্পাদকের সঙ্গেও চলে তো যেতে পারে! আসলে উচ্ছল হাসি আর লাস্যের বেসাতি করে করে ওর রক্তেও নেশা ধরেছে। লালুর মুখে, তার অস্থির অবস্থার কথা জেনে মনটা ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। কিন্তু ওদের পাশের বাড়ী মীনা, শম্ভুর বোন কি মিথ্যা কথা বলবে? তার মন নানা রঙে, নানা মায়ায় সুধার যে সুন্দর ছবি এঁকেছিল, তার ওপরে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরল। কী গভীর ভাবেই যে সে তাকে ভালবাসতো!

—ফটাদা!—রয়না গাছের স্যাঁতসেতে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সুধা। চমকে উঠল ফটা। কেউটের ফণার মত রুক্ষ চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। উত্তেজনায় দ্রুততর হয়ে উঠেছে নিঃশ্বাস।

—এ কী! তুই এখানে?

—তোমাকে ডাকতে পাঠিয়ে হিলির রাস্তার কালভার্টের ওপরে বসে অপেক্ষা করছিলাম। তুমি চলে যাচ্ছো যে!

—তুই ডাকলেই আমাকে আসতে হবে তার কি মানে আছে?

বিস্মিত দৃষ্টি ফুটল সুধার চোখে। বিষণ্ণ গলায় বলল—বলছো কি ফটাদা? কেন, আমি কী অপরাধ করেছি তোমার কাছে।

—আমাকে বিরক্ত করতে আসিস কেন? যা না, তোর ড্রাইভার আর বাসের মালিকদের কাছে। সব শুনেছি আমি মীনার মুখে—

—মীনা!—সুধার চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠল। কান্নাভরা গলায় বলল—সব, সব মিথ্যে বলেছে ফটাদা। তুমি বিশ্বাস কর। তুমি ভালবাসো বলে মীনা আমাকে হিংসে করে।—একটু থেমে শান্ত গলায় বলল—বাড়ীতে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ফটাদা। রাত্রে জানলায় ঢিল পড়ে। সারারাত জানলার নীচে মানুষের পায়ের শব্দ শুনি। আমি আজই নিরাপদ বাবুর সঙ্গে নারীকল্যাণ কেন্দ্রে চলে যাবো।

—ভালই তো! মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ষ্টাইপেণ্ড পাবি। কত লেখাপড়া জানা লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। আমাদের কথা তুই ভুলেই যাবি!—মাথার ওপরে স্বর্য্যের দিকে তাকিয়ে বলল—বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, আমি যাই সুধা।—তার দিকে একবারও না তাকিয়ে ফটা হাঁটতে সুরু করল। সে জানতেও পারল না, দুটো জলভরা চোখের জ্বালাধরা দৃষ্টি তার পিঠে সূঁচের মত বিঁধছে।

॥ উনিশ ॥

নারীমঙ্গল কেন্দ্রের সেক্রেটারী নিরাপদবাবু বললেন,—আপনার কোন ভয় নেই মা। মাসে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা পাবে আপনার মেয়ে। তাঁতের কাজ শিখবে, বেতের ঝুড়ি বুনতে শিখবে—

—সেখানে কতজন মেয়ে আছে?—জিজ্ঞাসা করল হেমাঙ্গিনী।

—জন পঞ্চাশেক হবে।

—সবাই কি রিফিউজি?

—হ্যাঁ মা, তারা সবাই বাস্তুত্যাগী। অনাথা মেয়ে। আমরা তাদেরই জন্য আশ্রম করেছি। গরীব-দুঃখী মেয়েদের থাকা-খাওযা লেখাপড়া আর হাতের কাজ শেখানোর সবরকম সুবন্দোবস্ত করেছি।

—দেখবেন পঞ্চাশটা করে টাকা যেন নিয়মিত পাই। আমার ঠিকানায় মানি-অর্ডার করে পাঠাবেন।—হেমাঙ্গিনীর চোখদুটো খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু থেমে বলল,—কুশমুণ্ডীতে আপনাদের আশ্রম তো? আমি মাঝে মাঝে গিয়ে সুধাকে দেখে আসবো।

মাটিতে জুতো ঘসতে ঘসতে ছাড়া গলায় নিরাপদ বলল,—কোথাকার এক ড্রাইভার আর বাসের মালিক না কি আপনাদের ওপরে আক্রোশে ফুলছে? তারা যদি রাস্তার মধ্যে গোলমাল করে।

—কলোনীর সবাই আমাদের ওপরে চটা—চাপা গলায় বলল হেমাঙ্গিনী—সুধার একটা হিল্লে হয়ে যাচ্ছে দেখে, সকলেই আমার ওপরে হিংসেয় জ্বলছে। তাই বলছি, আপনি সুধাকে রাত্রে নিয়ে যাবেন।

—সুধার সঙ্গে আপনার ছেলে লালু যাবে তো?

—লালু! না। সুধা চাকরী করতে যায় সেটা ওর মত নয়। আর ও সাত তালের মানুষ। ছুটি পাবে না।

—সুধার সঙ্গে তাহলে কে যাবে? আপনি চলুন না?

নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুধা। চোখে জলের ছাপ। কিন্তু সহজ গলায় বলল,—আপনি আমার বাবার বয়সী। আপনার সঙ্গে গেলে কেউ কিছু বলবে না। ঘর ছেড়ে বাইরেই যখন যাচ্ছি, অপরিচিত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেই তো হবে।

হেমাঙ্গিনীর দুটো ছোট ছোট চোখে হাসি ঝিকিয়ে উঠল। বলল,—নিরাপদবাবু, আমার মেয়ের মনের জোর দেখেছেন?

নিরাপদর ঠোঁটের কোণায় হাসি উঁকি দিল। বলল—আমাদের নারী মঙ্গল আশ্রমের সব মেয়েই সুধার মত মা! অজস্র দুঃখকষ্টের ঘা খেয়ে খেয়ে ওরা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছে।

—বেশ তাহলে আজ সন্ধ্যাতেই রওনা হবেন—বলল হেমাঙ্গিনী—দিনের আলোয় গেলে আবার লোক জানা-জানি হবে। সেটা আমরা চাই না—

রাত্রির অন্ধকার ডানা মেলে নেমে আসছে খড়মপুর গ্রামের সীমান্তে। মরাশকুনীর খালের এপারে খড়মপুর, ভালুকাহার, ওপারে ডালিমগাঁও আর সেকেন্দারহার গ্রাম। এপারে হাওয়ায় ওড়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা আর ওপারে বাতাসে মাথা নাড়ায় পাকিস্তানের পতাকা।

মরাশকুনীর খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে খড়মপুর—ভালুকাহারের লোকরা নিষ্ফল হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর সঙ্গীকে বলে—পাসপোর্ট না হলি ডালিমগাঁও তো কি—সিকান্দারোত যাবা পারবু না বাঁহে। কী তাজ্জবের কথা দেখিছেন ঐ ডালিমগাঁও বলি বিছাশ হয়ে গেছি!

ঠিক তেমনি সেকেন্দারাহারের মুসলমান চাষী রহমান মরাশকুনীর খালের নড়বড়ে পুলটার ওপরে দাঁড়িয়ে স্থির অপলক চোখের দৃষ্টি ভাসিয়ে দেয় খড়মপুর, ভালুকাহারের বিপুল ব্যাপ্ত প্রান্তরে দিগন্তের সীমায় সীমায় তরঙ্গায়িত ধানগাছের ঘন সবুজ নিস্পন্দ সমুদ্রের দিকে। বাতাসে ভেসে আসে কাটারীভোগ, চিনিসকর চালের মিষ্টি সুগন্ধ! বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহমান। আছে, আছে—সব আছে। ঐ তো ডানদিকের প্লটটা চৌধুরীদের জমি। বাঁদিকের তিন কোণা জমিটা সরকারদের। সুদূর শৈশব থেকে আধি খেটে, বুকের রক্ত দিয়ে এই সব জমিতে তারা সবুজের তরঙ্গ তুলে দিয়েছে। মিষ্টি ধানের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মধুর স্বপ্নে তারা বিভোর হয়ে গেছে। এই ধান তাদের সব দিয়েছে। দিয়েছে বৌযের পরণে শাড়ি, রূপার পৈঁছে, ছেলে-মেয়ের জামাকাপড়। আর আজ। চাপা কান্না থমকে থাকে রহমানের চোখে। আঁকাবাঁকা মরাশকুনীর দীর্ঘ খালটাকে তার মনে হয় যেন বিষাক্ত একটা সরীসৃপ। দুই দেশের মানুষের সুখের আর পরম নিশ্চিন্ততার জীবনে মর্মান্তিক অভিশাপের বিষ ঢালছে ঝলকে ঝলকে। রহমানের চেতনায় ছায়া ছায়া কুয়াশার মত কতকগুলো প্রশ্ন ভেসে বেড়ায়—কেন, কি পাপে তারা আর ওপারে বাবুদের জমিতে আধি খাটতে যেতে পারবে না? এপারের মহরমের মেলায় ভালুকাহারের পরাণ মণ্ডল, পূর্ণ

বর্মনেরা আসতে পারবে না ? এ ব্যবস্থা ক'রে, কার কি লাভ হয়েছে, বুঝতে পারে না রহমান।

মরাশকুনীর খালের দুই পাড়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ও সুখী উজ্জ্বল কৃষি-জীবনের ওপরে দেশভাগের পরেই বিপর্য্যয় নেমে এসেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আরেকটা জীবন দুই পারেরই আটিশ্বরী আর সাঁই-ঘাসের ঝোপে ঝোপে, পাটের ক্ষেতের নিবিড় জঙ্গলে নিঃশব্দচর শ্বাপদের মত হামাগুড়ি দিয়ে চলে।

বর্ডার মিলিটারী গ্রুপ কম্যাণ্ডারের ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে রাত দশটার ইসারা! বুট জুতোয় মস মস শব্দ তুলে কম্যাণ্ডার শিউচরণ ক্যাম্পের বাইরে এল। হেঁকে অর্ডার দিল—গার্ডস! রেডি হো যাও—দশ বাজ গিয়া।—মুহূর্তে চঞ্চলতার ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল বর্ডার গার্ডসদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে। সীমান্তরক্ষীরা সকলে বুট-পট্টি পরে রাইফেল কাঁধে নিয়ে বাইরে এল। অন্ধকারে ঝকমক করে উঠল চকচকে সঙীনগুলো। প্রতিটি রক্ষীর চোখের স্থির দৃষ্টি মরাশকুনীর খালের পাড়ে ঝাপড়া বটগাছের নীলাভ অন্ধকারের দিকে। রাত দশটা থেকে ভোর পর্য্যন্ত ঐ বটগাছের আড়ালে, আটিশ্বরী আর সাঁই-ঘাসের ঝোপে ঝোপে ছায়া মূর্ত্তিরা চঞ্চল হয়ে উঠবে। জন্তুর মত তারা হামাগুড়ি দিয়ে ওপারে সেকেন্দারহারের দিকে চলে যাবে। সেকেন্দারহারের শিবপুকুরের উঁচু পাড়ের শিয়াল কাঁটার ঝোপের অন্ধকারে পাকিস্তানের মহাজন ওদেরই প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে তাকিয়ে আছে, ভালুকা-হারের সীমানায় ঐ বটগাছটার দিকে। ঐ ছায়া মূর্ত্তিরা এপার থেকে কেউ নিয়ে যাবে চিনি, কেউ লবণ, মশলাপাতি, কেউ সিঙ্গারমেশিন কি টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতি। কেউ নিয়ে যাবে বিড়ির পাতা। সীমান্ত অঞ্চলে সবাই ওদের ঢোলাইদার বলে। ভালুকাহার, খড়মপুর কি হিলির মহাজনদের মাল ওরা ঢোলাই করে। ওরা জিনিসের ওজন অনুযায়ী আট আনা থেকে এক টাকা পর্য্যন্ত মজুরী পায়। এ অঞ্চলে মিল-কারখানা নেই, অন্নসংস্থানের কোন উপায়ই নেই, তাই সীমান্ত এলাকার আট

থেকে আটাত্ত্ব পর্যন্ত বয়সের মেয়ে-পুরুষ হয়ে উঠেছে চোরাই মালের ঢোলাইদার।

সীমান্ত রক্ষীদের গ্রুপ কম্যাণ্ডার শিউচরণ হেঁকে বলল—খুউব হুঁসিয়ারিসে পাহারা দেও—আজ সদরসে নয়া ডি. এম. সাহাব আয়েগা। রক্ষীদের চোখের দৃষ্টি আরও প্রখর হয়ে উঠল। সীমান্তরক্ষীদের সাদা সাদা অতিকায় তাঁবুগুলোর দিকে তাকিয়ে বাঁদব ব্রাণ্ডের কারিগর টুলু বলল শম্ভুকে—আজ কিন্তু এদের খুব তোড়জোড় দেখছি যে রে—

—আজ ভাই সেকেন্দারহারে যাওয়া ঠিক হবে না। ফিরে চল।

—দু বস্তা মাল নিয়ে এসেছি, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া তো মুস্কিল!—টুলুর চোখে নিরুপায় দৃষ্টি ফুটল।

বাতাসের কান্না বাজছে সাঁই-ঘাসের ঝোপে। রাতের স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে শেয়াল ডেকে উঠল ভালুকাহারের বেজিহার দীঘির উঁচু পাড়ের ওপর থেকে। হঠাৎ দূরে হিলির পীচ বাঁধানো রাস্তার দিকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ ভেসে এল। কালো থকথকে অন্ধকারের বুক চিবে দুটো হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা জীপ তীর বেগে ছুটে আসছে।

হেঁকে উঠল শিউচরণ,—সব এ্যাটেন্‌সান হো যাও—ডি. এম. সাহাব আ রঁহি হ্যায়।—চোখের পলকে রক্ষীদের ঘাড়ের ওপরে রাইফেলগুলো উঠে এল। সাই ঘাঁসের ঝোপে ঝোপে, পাটক্ষেতের জঙ্গলে শিউরে উঠল ঢোলাইদারদের দল। তারা ফিসফিসিয়ে বলল—আজ আর নগদ রোজগার করতে হবে না—সব মালগুলো শালা মহাজনকে ফিরিয়ে দিতে হবে রে—

ঢ্যাপার বিড়ির কারিগর শম্ভু বলল টুলুকে—চল আজ ফিরে যাই। ইচ্ছে করে বিপদের ঝুঁকি নয়ে তুইও সেকান্দারহারে যাস না—

টুলুর চোখে কাতর দৃষ্টি ফুটল। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় জ্বলে উঠে বলল—শালা, মালিক মাইনে দেবে মাত্র কুড়ি টাকা। বিয়ে করেছি। বুড়ী মা আছে, বিধবা বোন আছে—কি করে চলে বল তো?—

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্মাগলিংই করবো—বলল শম্ভু,—এমনিই তো আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। জেলে গিয়ে দুবেলা পেটভরে ভাত তো পাবো—

স্তব্ধ রাত্রির বুকে শব্দ তুলে খস্ করে ব্রেক কষে জীপ থামল সীমান্তরক্ষীদের তাঁবুর সামনে। হেডলাইটের উগ্র সাদা দুটো আলো মরাশকুনীর খালের পাড়ে বটগাছের নীচের জমাট অন্ধকারকে ঝলসে দিয়েই নিভে গেল। ছুটে এসে বুটে শব্দ তুলে স্যালিউট করল শিউচরণ ডি. এম. সাহেবকে। ডি. এম. বললেন—আজ যতগুলো ঢোলাইদার আসবে সকলকে ধরা চাই। সীমান্ত অঞ্চলে বিস্তর চোরাই মাল পাচার হচ্ছে। খবরের কাগজ-ওয়ালারা কি রকম হৈ হৈ করছে, তোমরা দেখেছো তো?

হাত জোড় করে শিউচরণ বলল—খড়মপুর আর ভালুকাহার বাদে হামাদের সীমানামে যে কুনো পাহারাদার নাহি স্যাব। ইস লিয়ে—

—হ্যাঁ, আমি ডিফেন্স সেক্রেটারীকে লিখেছি—বললেন ডি. এম.—সমস্ত এলাকায় বর্ডার-গার্ড বসানোর জন্য—

—হু গোজ দেয়ার?—হেঁকে উঠল এক সীমান্তরক্ষী। তার রাইফেলের চকচকে সঙীনে ঝকমক করে উঠল নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরোয়ানা। ডি. এম. সাহেবের চোখদুটো বাঘের মত কপিশ আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠল। দাঁত দিয়ে পাইপ কামড়ে ধরে 'অর্ডার' দিলেন—এ্যারেষ্ট—এ্যারেষ্ট দ্যাট স্মাগ্লার।

ক্ষিপ্ত একটা জন্তুর মত মরাশকুনীর খালের পাড়ে একটা ছায়ামূর্তির দিকে ছুটল শিউচরণ। তীরবেগে ছুটেছে সেই মূর্তি সেকেন্দারহারের দিকে। লোহার মত কঠিন দুই হাতের আগল দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল শিউচরণ শাড়ির একটা উড়ন্ত আঁচল। তরল অন্ধকারে মেয়েটি তার জলভরা করুণ চোখের দৃষ্টি তুলে ধরল শিউচরনের উত্তেজিত মুখের দিকে। বলল—তোমার পায়ে পড়ি—আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

শিউচরণ দুই হাত দিয়ে পাখীর পালকের মত হালকা দেহটা একটা ঝাঁকি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তার কৃশকরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে শিউচরণ বলল—তুমি ভদ্দর ঘরকি লেড়কী। তুম কেঁও 'স্মাগলিং' করতি হ্যায়!

—বিশ্বাস কর। আমার মার খুব কঠিন অসুখ। ডাক্তার ডাকার পয়সা নেই। তাই দু' একটা টাকার আশায়—শেষের দিকের কথাগুলো তার অঝোর কান্নায় তলিয়ে গেল।

—ভাই বেরাদর কি কুটুম কৈ নেই আপকি?

—না, কেউ নেই। আমি আর আমার মা, পাকিস্তান থেকে এখানে এসে ক্যাম্পে আছি। কান্না থরো থরো কিশোরী মেয়েটার অসহায় করুণ অবস্থা দেখে গ্রুপ কম্যাণ্ডার শিউচরণের মনটা নরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। শুধু ডি. এম. নয়, প্রতিটি সীমান্ত রক্ষীদের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্নমুখ তীরের মত তারই পিঠে বিঁধছে। দয়া করে এই মেয়ে চোলাইদারটিকে ছেড়ে দিলে তার বিপদ অনিবার্য! চাপা কঠিন গলায় বলল সে—চল তুমাকে থানায় যেতে হোবে। তোমাকে ছাড়িয়ে দেবার কুনো উপায় নেই।

—আমাকে তুমি ধরবে?—দুহাতে বুক চেপে ধরে কেঁদে আছড়ে পড়ল মেয়েটি। আটিশ্বরীর ঝোপের আড়ালে শিউরে উঠল টুলু। ফিস ফিসিয়ে শম্ভু বলল—চল—চল পালাই।

মরাশকুনীর খালের পাড়ের গা ঘেঁসে বুক সমান উঁচু বিন্নার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শঙ্করপুরের সীমানা ছাড়িয়ে নিরাপদ-এলাকার দিকে চলতে লাগল। প্রায় এক মাইল দূরে এসে তারা দেখল তমসাস্তীর্ণ মরাশকুনীর খালের জল অন্ধকারে একটা ভোঁতা ছুরির মত মনে হচ্ছে। খালের ওপারেই পাকিস্তানের এলাকায় আজলকাজল গ্রাম। কিন্তু এখানে দুইদেশের সীমান্তে কোন পাহারা নেই। খালের পাড়ে একটা কদমগাছের নীচে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। একটা বিড়ি ধরিয়ে টুলু বলল—শম্ভু, কাল থেকে এখান দিয়ে মাল পাচার করবো বুঝলি?

—না, ভাই আমি আর আসছি না—ক্লান্ত বিষন্ন গলায় শম্ভু বলল—পয়সার জন্যে এমন জন্তুর মত পরিশ্রম করতে আমি পারবো না—

—তুই বিয়ে করিস নি। একটা পেট। তোর ভাবনা কি?—বিড়ির

আগুনে দেখা যায় টুলুর চোখে ব্যথার ছায়া। ম্লান গলায় বলল—এই কাজ করছি বলে বাড়ীর সবাই দুমুঠো খেয়ে বেঁচে আছে!

—চল ওঠা যাক, রাত শেষ হয়ে আসছে—পূব আকাশের পাতলা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল শম্ভু। নিঃশব্দ পায়ে তাঁরা রামনগরের দিকে চলল। একটু দূরে যেতেই থমকে দাঁড়াল শম্ভু। দক্ষিণগোবিন্দপুরের ঝাপড়া বকুলগাছের নীচ দিয়ে একটা পাল্কী আসছে মনে হচ্ছে। তাদের চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

এত রাত্রে পাকিস্তানের সীমানায় পাল্কীতে করে কে আসে! তীব্র কৌতুহলে তাদের মনের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল। শম্ভু বলল—পা চালিয়ে চল তো টুলু ঐ দিকে!

—আপনি কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন! কুশমুণ্ডী তো এদিকে নয়—স্ত্রী কণ্ঠের চাপা আর্তনাদে শিউরে উঠল রাত্রিটা। বাতাসে ভেসে এল তার চাপা কান্নার শব্দ।

—থামাও পাল্কী—বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল শম্ভু আর টুলু।—কাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছো?

পাল্কীর জানালা সশব্দে খুলে গেল। ঝাঁপিয়ে নামল সুধা। আঁচলটা মরা সাপের মত দুলছে। ক্রুদ্ধ উত্তেজিত বুকে উত্তাল ঢেউ ভাঙছে। চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত চক চক করছে।—শম্ভুদা, টুলুদা, বাঁচাও আমাকে—আমাকে রক্ষা করো।

তীরবিদ্ধ একটা জন্তুর মত চীৎকার করে সুধার গলাটা টিপে ধরল নারী মঙ্গল আশ্রমের সেক্রেটারী। মুহূর্তে শেষরাতের ফিকে অন্ধকারে দক্ষিণ গোবিন্দপুরের সেই বিজন প্রান্তরে একটা হিংস্র লড়াই সুরু হয়ে গেল। নিরাপদর নাকে একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে শম্ভু চেঁচিয়ে বলল—টুলু—তুই সুধাকে নিয়ে দৌড় দে—

চোখের পলকে সুধাকে নিয়ে বুকসমান উঁচু বিন্নার জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল টুলু। শক্ত করে শম্ভুর হাতটা চেপে ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল নিরাপদ—তুমি

ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছো ছোকরা। দেশ ভাগের পর থেকে নাগাড়ে আমরা এই ব্যবসা করছি। কোনদিন কোথাও বাধা পাই নি—

—হাত ছাড়ুন—শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল শম্ভু। কিন্তু ঐ হাড় জিরজিরে মধ্যবয়সী লোকটার গায়ে কী প্রচণ্ড শক্তি! তার হাতের মুঠোটা যেন লোহার মত চেপে বসেছে শম্ভুর হাতে।

নিরাপদর দুচোখে আগুন ঝরছে। রক্তখেকো বাঘের মত আক্রোশে জ্বলে উঠে সে বলল—প্রায় চার হাজার টাকার মাল যে তুমি লোকসান করে দিলে তার জন্যে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

—কি নিরাপদবাবু? আজলকাজল গাঁয়ের সীমানায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমার পা ব্যাথা হয়ে গেল—ফরসা ধবধবে চেহারার এক যুবক সামনে এসে দাঁড়াল।

—আর বলবেন না স্যার। চমৎকার একটা পাখী নিয়ে এসেছিলাম। একেবারে সীমানার কাছে এসে এই হারামজাদা সব ভণ্ডুল করে দিল—

—মেয়েটা তোমার কে হয়?—প্রশ্ন করল সেই যুবক।

—আমার বোন—স্পষ্ট গলায় শম্ভু বলল—আমাকে ছেড়ে দিন।—

নিরাপদবাবু বলল—দিনের আলো ফুটছে। আপনি ওপারে চলে যান স্যার। দিন সাতেকের ভেতরে আপনাকে আরো ভালো মাল দেব—

—আমার য়্যাড্ভান্সটা ফেরৎ দিন ত।

—অনুগ্রহ করে সাতটা দিন অপেক্ষা করুন স্যার।

—আচ্ছা দেখি—লম্বা পা ফেলে আজলকাজল গ্রামের দিকে যেতে যেতে যুবকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—ছেলেটার কাঁধে বিড়ির পাতা বোঝাই ব্যাগ দেখেছেন তো? ওকে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন না।

—সে কি আপনাকে বলতে হবে স্যার। শালা আমার কতবড় ক্ষতিটাই না করেছে।

নিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠে শম্ভু বলল—ছেড়ে দিন আমাকে। না হলে পুলিশকে আমিও বলে দেব, আপনি ওপারে মেয়ে স্মাগলিং করছেন—

বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে কলা দেখানোর মুদ্রা করে বলল নিরাপদ—কোন লাভ হবে না। আমাকে কর্তারা সবাই নারী মঙ্গল আশ্রমের সেক্রেটারী বলে জানে—ঘেঙ্গিয়ে হেসে উঠল। হায়েনার মত শুকনো খটখটে হাসি।

—আপনি হাত ছাড়বেন কি না বলুন?—প্রাণপণে একটা ধাক্কা দিল তাকে শম্ভু। কিন্তু আশ্চর্য তাকে এক ইঞ্চিও সরানো গেল না। প্রৌঢ় নিরাপদর সরীসৃপের মত দীর্ঘ ও পিচ্ছিল দেহটার হাড়ে হাড়ে মত্তহস্তীর শক্তি। টেনে হিঁচড়ে সে শম্ভুকে নিয়ে চলল সীমান্তরক্ষীদের তাঁবুর দিকে। শম্ভুর বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠল কান্না। তার চোখের সম্মুখে নাচতে লাগল কারাগার। বুড়ী মা ভাই-বোন, বিশাল একটা সংসার। তবুও মহৎ আবেগে তার বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত মনটা বিপুল একটা গৌরবের অনুভূতিতে ভরে উঠেছে, দুঃখিনী সুধাকে আসন্ন চরম সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছে!

খড়মপুর থেকে রামনগরের কাঁচা মাটির রাস্তার দুধারে ধু ধু মাঠের পারে সূর্য্য উঠল। মাতালের মত টলছে সুধা। নিদারুণ ক্লান্তির পীড়নে তার রাত্রিজাগরণক্লিষ্ট চোখদুটো বুজে আসছে। টুলু বার বার খড়মপুরের কাজল কালো দিগন্তের দিকে করুণ চোখে তাকাচ্ছে। জলভরা চোখে সুধা বলল—শম্ভুদা এখনো এল না? নিশ্চয়ই ওকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে টুলুদা। আমার মত হতভাগীর জন্যে শম্ভুদার জীবন নষ্ট হয়ে গেল।—টুলুর হাত দুটো ধরে কান্নাভরা গলায় বলল—তুমি যাও—দেখ টুলুদা। শম্ভুদা না এলে আমি যাবো না—যেতে পারবো না—অঝোর কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠে রাস্তার ধুলোর ওপরে বসে পড়ল সুধা। একটা বদ্ধ উন্মাদিনীর মত নিজের কপালে কিল-চড় মারতে লাগল। আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন অদৃশ্য কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশে বোমার মত ফেটে পড়ে বলল—হা ভগবান কী পাপ করেছি আমি!

—ওঠ—ওঠ—ওকী। ব্যস্ত হয়ে উঠল টুলু—চল রামনগরের থানায়

নিরাপদের নামে একটা এজাহার তো করি—তার মাথায় হাত বুলিয়ে আবার বলস—কাঁদিস না বোন। চল—

॥ কুড়ি ॥

বেলা বাড়ল। সূর্য্যের আলো চারিদিকে আগুন ছড়াচ্ছে। বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে পদ্ম। জ্বরের যন্ত্রণায় চোখদুটো লাল হয়েছে। খাঁ খাঁ করছে বাড়ীটা। ন্যাদোনের ঘরটার দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটো জলে ভরে এল। গঙ্গারামপুরে গিয়ে তাকে একটা খবর পর্য্যন্ত দেয়নি ন্যাদোন! গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস মাটির মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ পদ্মের অবয়বের মধ্যে ক্ষীণ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। দূরে খাদিমপুরের দিগ-বিকীর্ণ প্রান্তরে দিগন্তের কালো রোদের ঝিলিমিলি কাঁপছে। ধুলোর ঘূর্ণি প্রেতচ্ছায়ার মত অবয়ব নিয়ে উঠতে যেতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। উঠোনের কোণে জড়ো করা পাতাগুলো ফরফর করে হঠাৎ সর্পিল ভঙ্গীতে ঘুরপাক খেয়ে উড়তে আরম্ভ করল। আমগাছের মাথার ওপরে বসে একটা চিল তীক্ষ্ণস্বরে একঘেয়ে ডাক ডেকে চলেছে। চিলের চীৎকার তার দুর্ব্বল অবসন্ন চেতনাটাকে যেন তুরপুনের মত ফালা ফালা করে দিয়ে গেল। রোদজ্বলা ধুধু মাঠের দিকে তাকিয়ে পদ্মর মনে হল—ঐ মাঠের মতই নিস্তৃন রৌদ্রদগ্ধ তার জীবন। স্নেহ নেই, নেই কোন আশ্বাস, নেই কোন প্রেম-প্রীতির সবুজ স্নিগ্ধ মরূদ্যানের ইসারা। চেয়ারম্যান হওয়ার পর নানা কাজের ব্যস্ততায় ধীরেন্দ্রলাল বাড়ীতে প্রায়ই থাকে না। নির্জন জনশূন্য বাড়ীটা যেন হাঁ করে তাকে গিলতে আসে। সারারাত তার ঘুম আসে না। কান পেতে শোনে আমগাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার মর্মর। টিনের চালে টুপটাপ শুকনো পাতা ঝরার শব্দ। কে জানে, কোন অজ্ঞানিত কারণে তার বুকে ঠেলে ঠেলে ওঠে ছলো ছলো কান্নার ঢেউ। দুটো উত্তপ্ত জ্বালাধরা চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পশুপতির হাসিহাসি সরল মুখখানা!

হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে সে সুখে আছে। স্ত্রীর ভালবাসায়, সেবায়, শিশুদের কলরোলে তার জীবন ভরে উঠেছে। তন্দ্রার ভেতরে তার দুচোখে স্বপ্ন নেমে আসে। তার বুকে পিঠে ছোট ছোট শিশুর কচি হাতের স্পর্শে তার রক্তে আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়। পশুপতি বলে—তুমি ওদের আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছো!

—তুমি তোমার কাজে যাও তো? কৃত্রিম রোষে ফুঁসে উঠে সে বলে, পুরুষমানুষের বাড়ীর ভেতরের অত খবরে দরকার কি!—কোমল নধরদেহ শিশুদের সে ময়দার মত ঠেসে চটকে তার বুকে চেপে ধরে আদরে সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

ঘুম ভেঙ্গে যায়। কালিলেপা অন্ধকারে চারিদিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে তার চেতনা। কোথায় পশুপতি! মুঠো মুঠো নরম সুন্দর ফুলের মত শিশুরা কোথায়! সব,—সবই তার হতে পারতো! কিন্তু স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে! তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণা তরঙ্গিত হয়ে যায় তার ধমনীতে-ধমনীতে। তার মৃতা মায়ের শীর্ণ, বহু রেখাঙ্কিত মুখের ভেতরে ভুল ভালবাসার আবেগে টলোমলো, হাস্যে-লাস্যে এক সর্বনাশা তরুণীর মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। ঐ ভালবাসা তার জীবনকে মরুভূমি করে দিয়েছে। মুছে দিয়েছে পৃথিবীর সব রঙ। একটা প্রেতিনীর মত সে ঘরের ভেতরে পায়চারী করে। আর অদূরে উত্তর ভিটের ঘর থেকে ভেসে আসা ঘুমন্ত ধীরেন্দ্রলালের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে চমকে চমকে ওঠে। এই ধীরেন্দ্রলালের হাত ধরে সে সংসার রচনা করতে পারে। কিন্তু তার জন্মলগ্নে যে সর্বনাশা অভিশাপ আছে! যে ধীরেন্দ্রলালকে নিয়ে সে কত রঙীন স্বপ্নের জাল বোনে, সেই ধীরেন্দ্রলালই আবার একদিন নিছক খেয়ালের প্রেরণায় তাকে একটা জীর্ণ মলিন কাপড়ের মত পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে মাথা উঁচু করে। তার মত কুশ্রী একটা মেয়েকে যে সে ভালবেসেছে, এই অনুভূতিটাই তার ঘা খাওয়া দুঃখী জীবনের অন্ধকারে নীহারিকার আলোর মত জ্বল জ্বল করুক। প্রতিটি মুহূর্তে তার মা-র দুরবস্থার ছবিটা যেন দুঃস্বপ্নের মত তার চেতনার

ভেতরে জেগে থাকে।···সূর্য্যের আলো উঠোনের কোণে ছায়া ফেলে। রোদ হেলে পড়ে।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় সে। জ্বরের যন্ত্রণায় চোখদুটো জ্বালা করে। ধীর পায়ে রান্নাঘরের দিকে যায়। এখুনি হয়তো ধীরেন্দ্রলাল এসে পড়বে! তার জন্যই রান্না করতে হবে।

—পদ্ম, আজ তোমার শরীর কেমন আছে? ধীরেন্দ্রলাল উঠোনে এসে দাঁড়াল। পদ্মর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার চোখদুটো ছল-ছল করছে। জ্বর আর বাড়েনি তো? তোমাকে বললাম—দোকানের জন্যে এত পরিশ্রম করো না।

পদ্মর ঠোঁটের কোণে ম্লান, নির্জীব হাসির রেখা ফুটল। বলল—তোমার আজ ফিরতে এত দেরী হলো কেন?

—আর বলো কেন? আত্রাই নদীর বন্যায় চন্দ্রনাথ রায়ের ঘাটের রাস্তাটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। চার নম্বর ওয়ার্ডের লোক দরখাস্ত করেছিল। তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

—খুব ভাল করেছো। কেউ যেন তোমার দুর্নাম না করে। কত লোকের কাছে তোমার প্রশংসা করেছি ভোটের সময়—দুর্বল, জ্বরাক্রান্ত পদ্মর নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে ওঠে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সে আবার বলে—সব সময় মনে রাখবে, মানুষ তার কৃতকর্মের পুণ্যে অমর হয়ে যায়। এমনভাবে কাজ করবে, যাতে তুমি যখন চেয়ারম্যান থাকবে না, তখনো লোকে তোমার নাম স্মরণ করবে।

ধীরেন্দ্রলাল দুচোখে নির্বিকার দৃষ্টি ফুটিয়ে পদ্মের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার একটি কথা বুঝতে পারছে কি না সন্দেহ। দুইদিক থেকে দুটো তীর যেন তার বুকের পাঁজরে বিঁধে গেছে। নীরদা তার মাজা-মাজা রঙের মুখখানা পাউডার-পমেডের প্রলেপে উজ্জ্বল করে রঙীন ঝলমলে সিল্কের শাড়ীতে দেহটা পেঁচিয়ে, হাসিতে লাস্যে ঝিম ঝিম একটা নেশা মাখিয়ে বিলোল উল্লাসে তাকে অতল পঙ্কের দিকে নিয়ে যেতে চায়।

উদগ্র একটা লোভ যেন শাড়ী ব্লাউজে আবৃত হয়ে রমনীয় মূর্ত্তি ধরে তাকে অহরহ সর্বনাশের হাতছানি দিচ্ছে। আর এই পদ্ম! কি যে ও চায়, কী পেলে যে ও খুসী হয়, ধীরেন্দ্রলাল তা বুঝতে পারে না। ও যেন সুদূর অজানা রহস্যের কুয়াশার পরিবেশ দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখে। ও তাকে ত্যাগের দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও মহৎ প্রেরণার বেদীতে দেবতার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ওকে দেখে মনে হয়. যেন একটা পুণ্যময়-স্তব মানুষের মূর্ত্তি নিয়েছে। ওর বিষাদশ্রীতে আশ্চর্য স্নিগ্ধ পবিত্রতা!

—তুমি কিচ্ছু শুনছো না যাও—ধীরেন্দ্রলালের শূন্য দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল পদ্ম।

ধীরেন্দ্রলালের চোখে অস্বস্তির ছায়া দুলে উঠল। সে বলল—তোমার আদর্শ আমাকে অনেক প্রেরণা দিয়েছে পদ্ম। কিন্তু—

—কিন্তু কি? কিছু বলবে?

—হ্যাঁ, অনেকদিন থেকে তোমাকে বলি-বলি করছি। কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। এখানে আর আমার থাকা চলে না পদ্ম। আমি অফিসপাড়ায় একটা বাসা ভাড়া করেছি—

—বেশ তো! এই কথা বলতে এত ইতস্তত করছো কেন? আমিও তোমাকে সেই কথা বলবো ভাবছিলাম। তোমার একটা আলাদা বাসা দরকার। কত লোক কত কাজ নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। শহরের উঁচুতলার আর দশটা গণ্যমান্য লোকের সঙ্গেও মেলামেশা করতে হবে।—নীচের দিকে তাকিয়ে মাটিতে নখ খুঁটতে লাগল পদ্ম।

—আমি আজই বিকেলে চলে যাবো পদ্ম।

কুণ্ঠিত গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল—লালুকে তোমার বাসায় থাকতে বলবো?

—পাশাপাশি ত লোক রয়েছে অনেক। একা খুব থাকতে পারবো—ধীরেন্দ্রলালের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে পদ্ম রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

নিশ্চল হয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল ধীরেন্দ্রলাল। আশ্চর্য মেয়ে! একবারও

তাকে থাকতে অনুরোধ করল না। ওর তেজোদৃপ্ত ব্যবহার, অনমনীয় দৃঢ়তার জন্যই ধীরেন্দ্রলাল মুগ্ধ হয়। আর ওর প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। তার মনের ভেতরে একটা বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে—কেমন হয় এখানে থাকলে! ওর রক্তে কামনার আগুন খর ধারায় জ্বালিয়ে দিয়ে ওর দৃপ্ত মনের সব তেজ, সব দম্ভ পুড়িয়ে ছাই করে দেবার একটা ইচ্ছা জেগে ওঠে।

রান্নাঘর থেকে পদ্ম বলে—চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো? এখানে থাকলে তোমার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে—

—পদ্মদি, শীগগীর বাইরে এস। দুপুরের বাতাসে একটা আর্ত চীৎকার ভেসে উঠল। ছুটে বাইরে এল পদ্ম। তার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল সুধা। তীব্র কান্নায় ফুলে ফুলে বলল—পদ্মদি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

—এ কী রে! কি হয়েছে তোর?—শিউরে উঠল পদ্ম। সুধার শাড়ির এখানে ওখানে কাঁটায় ছিঁড়ে গেছে। খোঁপা ভেঙ্গে চুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠে। টুলু একে একে সব ঘটনা বলল। বলল শেষরাতের অন্ধকারে কেমন করে চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল সুধা।

—তোর মা মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকার লোভে একটা অজানা-অচেনা লোকের সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দিল—বিস্মিত হয়ে পদ্ম বলল। ধীরে ধীরে সুধার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

—টাকা পেলে ওর মা সব পারে তুমি তা জানো পদ্মদি!—বলল টুলু।

গম্ভীর গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল—সীমান্ত এলাকায় এরকম সাংঘাতিক ব্যবসা চলছে আমরা খবর পেয়েছি। কোন সমিতির প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের ছদ্মবেশে ওরা ঘোরে—দেখি ডি. এম-কে ব্যাপারটা বলতে হবে—

—তোরা গিয়েছিলি কেন টুলু খড়মপুরে?—বলল পদ্ম।

টুলুর চোখে সঙ্কোচের ছায়া পড়ল। তবুও স্পষ্ট, দৃঢ় গলায় বলল —তোমাকে বলতে কোন লজ্জা নেই পদ্মদি। বিড়ির পাতা পাকিস্তানে বিক্রী করতে গিয়েছিলাম। তোমার মত আমাদের মালিক ত ঠিকমত মাইনে দেয় না। তাই বাধ্য হয়ে—

—সুধা, তুমি তোমার মা-র কাছে যাও। বলল ধীরেন্দ্রলাল—তাকে বলো, তার লোভের জন্য তোমার জীবন নষ্ট হতে চলেছিল।

—না, আমাকে আমার মার কাছে যেতে বলবেন না—পাগলের মত চীৎকার করে উঠল সুধা। রক্তের ডেলার মত চোখদুটো যেন এখুনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রোষে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় জ্বলে উঠে বলল সুধা—বাড়ীতে পাঠালেই আমাকে আবার সেজেগুজে নানা লোককে অভ্যর্থনা করতে বলবে, মা। পদ্মদি, অনেক সহ্য করেছি, দিনের পর দিন মাতাল ড্রাইভারের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেছি। কি একটা খারাপ অসুখের রোগী হরনাথকে চা খাইয়েছি।

—থাক আর বলতে হবে না, ঘৃণায় শিউরে উঠল পদ্ম। বিষণ্ণ হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। বলল,—গরীবের সংসারে মেয়ে হয়ে জন্মানোই পাপ, সুধা। আর তার মা যদি তোর মা-র মত হয়, তাহলে সেই মেয়ের বিপদ নিশ্চিত। সেখানে মেয়েকেই একটু শক্ত হতে হয়।

—কি রকম মা, মেয়ের ইজ্জতের দিকেও তাকায় না? আশ্চর্য!—বলল ধীরেন্দ্রলাল।

—না তাকায় না,—বলল পদ্ম।—দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার মত শক্ত মন সকলের থাকে না। সহজে যে পথে কিছু উপার্জন হয়, সেই পথই তারা বেছে নেয় পরে।—সুধার দিকে তাকিয়ে আবার বলল—তুই আমার কাছে থাক সুধা। তোকে তোর মা-র কাছে যেতে হবে না।

পদ্মের স্নেহ মধুর কণ্ঠে সুধার চোখে জল এল! জল টলটলে চোখে হাসি ঝিকিয়ে উঠল। পদ্ম বলল, তোর সঙ্গে ফটার বিয়ে দেব।

আচমকা কথাটা যেন সুধার বুকে তীরের মত বিঁধে গেল। শক্ত হয়ে খিলের মত এঁটে বসল চোয়াল দুটো তার গালে। চিৎকার করে বলল, —মাপ করো। ওকে বিয়ে করতে পারবো না।—হাতদুটো মুঠো পাকিয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল। কাটা গাছের মত টলে পড়ল সুধা।

ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল টুলু—পদ্মদি, এ যে ফিট হয়ে গেল?

ধীরেন্দ্রলাল বলল—রাত জাগা, উত্তেজনা অপমান, একটার পর একটা আঘাত পেয়ে ও যে মরে যায় নি, এই যথেষ্ট।

পদ্ম বলল—টুলু শীগগীর জল নিয়ে আয়।

॥ একুশ ॥

তিন মাস পর। ভূষলার আমবাগানে বাঁদরব্র্যাণ্ডের কারখানায় বিড়ি কর্মচারী এবং কারিগরদের সভা বসেছে। বিড়ি ইউনিয়নের সম্পাদক নিবারণ বলল, ধীরেনদাকে খবর দেওয়া হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, উনি একটু পরে আসবেন—বলল শিবু।

বাঁদর ব্র্যাণ্ডের নরেন গম্ভীর গলায় বলল, মালিকরা আমাদের যদি হাজারে সোয়া দুটাকা করে মাইনে না দেয়, তাহলে ছোকরা কারিগররা তো চোরাই মাল পাচার করে দু'একপয়সা উপায়ের চেষ্টা করবেই। আর শম্ভুর মত এরকম বিপদে পড়বে।

নিবারণ বলল, বর্ডারে যারা মাল পারাপার করে তারা বেশীর-ভাগই বিড়ি কারিগর। এটা আমাদের কাছে খুবই লজ্জার কথা। আমাদের বদনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

—এই সমস্যার প্রতিকারের একমাত্র উপায়—স্পেশাল মতির বিশু বলল, আমাদের মাইনে বাড়ানো। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। আমাদের আপখোরাকী এবং মাইনে হাজারে মাত্র এক টাকা। একটা মানুষের পেটও ওতে চলে না।

বাঁদরব্র্যাণ্ডের ছোকরা কারিগর টুলু বলল—বিশুদা ঠিক কথাই বলেছেন, এই কম মাইনের জন্যেই বাধ্য হয়ে আমাদের অনেককেই এই নোংরা পথে নামতে হচ্ছে। শুধু বিড়ি কারিগররাই নয়, পেটের দায়ে অনেক মেয়েপুরুষই বর্ডারে মাল চালান করে। দৈনিক আট আনা

থেকে একটাকা করে রোজগার হয় এই কাজে। সহজে পয়সা উপার্জনের এই উপায় পেটের দায়েই নিতে হয়—

—হ্যাঁ, আমি হিলি বর্ডারে গিয়ে দেখেছি—বলল নরেন—যারা ঢোলাইদার, তারা সবাই গরীব, অভাবী মানুষ। সবাই জানে, বাস্তুত্যাগীই তাদের ভেতরে বেশী। বর্ডারে গেলে দেখা যায়, পেটের দায়ে আমাদের দেশের জনসাধারণের বিশাল এক অংশ ঢোলাইদার হয়ে উঠেছে। ঢোলাইদার নামে নতুন একটা 'ক্লাস' তৈরী হয়ে গেছে।

সমবেত বিড়ি কারিগরদের ভেতরে গুঞ্জন উঠল। একজন বলল—আমাদের মাইনে বাড়ানোর কি হবে সেই কথাতে আসুন—

—হ্যাঁ, বর্ডারে স্মাগলিং-এর কথা বলে কি হবে?

ধীরেন্দ্রলাল হঠাৎ ঝড়ের মত এল। কড়া ইস্ত্রীর পাঞ্জাবী, আর মটকার চাদরে আভিজাত্যের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল বিড়ির তামাকের গন্ধেভরা ম্লান অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই কারখানা ঘরে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে সে বলল, তোমাদের সভায় কি কি এজেণ্ডা আছে বলো, আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমাকে আবার মহিলা সমিতির এক সভায় যেতে হবে।

নিবারণ বলল—প্রথম এজেণ্ডা— শম্ভুকে জেল থেকে বের করে আনা। দ্বিতীয় হচ্ছে, বিপদের ঝুঁকি নিয়েও বিড়ি কারিগররা বর্ডারে মাল পার করছে—

—তোমরা বলবে, মাইনে কম বলেই তো তোমাদের ভেতরে অনেকেই এসব করছে,—বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলল ধীরেন্দ্রলাল,—কিন্তু মানুষের দুশ্চরিত্রতার সুযোগ নিয়ে পতিতারাও তো সহজে রোজগার করে। কিন্তু তাতে পতিতার কোন গৌরব নেই, লোকে তাদের ঘৃণাই করে। মাইনে কম! বেশ তো তোমরা ধর্মঘট কর।

—ধর্মঘট যে করবো বলছেন, পাশাপাশি জেলা থেকে রেডিমেড বিড়ির প্যাকেট কিনে নিয়ে আসবে মালিক। ঝেঁটিয়ে তাড়াবে আমাদের—

—মালদহ, জলপাইগুড়ির অনেক কোম্পানীর বিড়ি তো রামনগরে রীতিমত

মার্কেট ক্যাপচার করেছে। মালদহের গোলাপী বিড়ি এখানে প্রচুর বিক্রী হয়,—বলল ফটা,—তার কারণ সেণ্ট দেওয়া নেপালী মশলা।

গম্ভীর গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল, আচ্ছা নিবারণ, তোমাদের বিড়ির মালিকদের ভেতরে বেশ ইনফ্লুয়েনশিয়াল কয়েকজনের নাম বলো তো? —পকেট থেকে নোটবুক বের করল ধীরেন্দ্রলাল।

নিবারণ বলল, স্পেশালমতির মালিক, বাস্তুত্যাগী ইউনিয়নের সেক্রেটারী, কামিনী সরকার, বাঁদর ব্র্যাণ্ডের দীননাথ দাস, চ্যাপার বিড়ির রমেশ চৌধুরী আর জিন্দাবাদ বিড়ির—

—আচ্ছা থাক, থাক আমি সব মালিকেই তোমাদের হয়ে অনুরোধ করবো তোমাদের মাইনে বাড়ানোর জন্য।—নিবারণ আর বিশু, তোমরা বিড়ি কারিগরদের প্রতিনিধি হিসেবে আমার সঙ্গে থাকবে।

—শম্ভুর কি হবে ধীরেনদা? চেঁচিয়ে উঠল টুলু।

—আমি ডি. এম-কে ওর কথা বলবো।—ধীরেন্দ্রলাল বলল।

হঠাৎ লালু কোথা থেকে ছুটে এল। বলল—ফটা আছিস এখানে?

—কেন রে?—ফটা বলল।

—শীগ্‌গীর আয় পদ্মদি ডাকছেন।—ফটা ও লালু চলে গেল।

ধীরেন্দ্রলাল বলল,—যদি মালিকরা আমাদের কথা না রাখে তাহলে তোমরা ধর্মঘট করবে।—বলেই সে বেরিয়ে গেল।

বেলাশেষের আলো স্বর্ণমারীচের মত পলাতক হলো দিগন্তে। আকাশ চুঁইয়ে ছায়া ছায়া অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। নিউ টাউনের প্রান্তরের ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে ধীরেন্দ্রলাল। নিদারুণ একটা অস্বস্তির যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছে তার মাথার ভেতরটা। হঠাৎ তার চোখের সামনে, পদ্মের বাড়ীর পাশে রাশি রাশি স্বর্ণলতায় ছেয়ে থাকা ছোট সজিনা গাছটার ছবি ভেসে উঠল। সজিনার কচি কচি সবুজ পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে, সরু সরু ডালের ছাল উঠে গিয়ে চাকা চাকা ঘায়ের মত দাগ দেখা দিয়েছে আর ঐ সজিনার সমস্ত রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে ঝলমল করছে তন্বী স্বর্ণলতারা।

'নিবিড় বন্ধনে পাকে পাকে সাপের মত জড়িয়ে ধরেছে গাছটাকে। ঐ স্বর্ণলতার সঙ্গে যেন কোথায় মিল আছে নীরদার। প্রাণখোলা হাসি লাস্যে, চোখের কটাক্ষে তার উদ্দাম প্রাণের আবর্ত যেন ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। কী প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে নীরদা! তার বাড়ীর সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ধীরেন্দ্রলাল। জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে নিঅনের উগ্র সাদা আলো আছড়ে পড়ছে বাইরে দিকচিহ্নহীন অন্ধকারের বুকে। সম্মিলিত মেয়েলী গলার উচ্ছ্বসিত হাসির দমকে কেঁপে উঠছে নিউ টাউনের শান্ত নিস্তব্ধতা। চুড়ির রিন ঠিন্, শাড়ীর খসখসানি, চীনামাটির কাপ প্লেটের ঠুং ঠাং আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে নীরদার বাড়ী। অনেক আগে আসতে বলেছিল নীরদা। খুব দেরী হয়ে গেছে।

বারান্দায় দাঁড়াতেই, নীরদা সমস্ত শরীরে ছন্দের ঘুর্ণি খেলিয়ে যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে বাইরে এল। কপালে জ্বলজ্বল করছে কুমকুমের টিপ। তন্বী দেহটা পাক দিয়ে উঠেছে ঘন সবুজ সিল্কের শাড়ী। ধীরেন্দ্রলালের হাতটা ধরে বলল—তোমার কথা মিসেস নন্দীকে বলেছি। সেই কখন থেকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি—

—মিসেস নন্দী কে?

—মিসেস নন্দী জলপাইগুড়ি থেকে এসেছেন। উত্তরবঙ্গ স্ত্রী মহামণ্ডলের একজন কর্মী। আমাদের মহিলা-সমিতির কাজ দেখতে এসেছেন।

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল ধীরেন্দ্রলাল। তার চোখের তারা দুটো কর কর করে উঠল। শহরের মহিলাসমিতির সভ্যারা প্রায় সবাই এসেছেন। রঙ বেরঙের শাড়ী আর নানা হাল ফ্যাসানের গয়নার জোরালো আলো ঠিকরে পড়ছে। স্নো এসেন্সের উগ্র মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

জীপ্ ফাস্টনারের চেনটা টেনে খুলে, তাঁর ফরসা ধবধবে মুখখানায় পাউডার পাফ বুলিয়ে নিলেন মিসেস নন্দী। ছোট্ট চিরুনী দিয়ে রুক্ষ চুল গুলো আঁচড়ে বললেন—আসুন মিঃ জোয়ারদার, বসুন। আপনি তো অত্যন্ত পপুলার লীডার। সকলের মুখেই আপনার প্রশংসা শুনছি—

—কি যে বলেন !—লজ্জা জড়ানো গলায় বলল ধীরেন্দ্রলাল—যারা আমাকে সম্মানের আসন দিয়েছে তাদের জন্যে আমি ভাবি, পরিশ্রম করি এটুকুই খালি বলতে পাবেন।

—এইটুকুই কটা নেতা পারেন, বলুন মিঃ জোয়ারদার ? একবার ইলেক্টেড হয়ে গেলে, অধিকাংশ নেতারই মনের পরিবর্ত্তন হযে যায়। এদিক থেকে আপনি একটি ব্যতিক্রম।—পুরন্ত গালে টোল ফেলে হাসলেন মিসেস নন্দী।

অন্যান্য মহিলারা নিঃশব্দে চা বিস্কুট খাচ্ছেন। মিসেস নন্দী আবার বললেন—আপনাদের এখানকার মহিলাসমিতির 'সোশ্যাল ওয়ার্ক' দেখে আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি। আপনারা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে তো মাসে মাসে একটা গ্রাণ্ট দেন এদের ?

—হ্যাঁ। দুশো টাকা দিই রামনগর মহিলা-সমিতিতে।

—উত্তর বঙ্গ স্ত্রী মহামণ্ডলেব সঙ্গে এখানকার মহিলাসমিতি এ্যাফিলিয়েটেড হযে যাক না। আপনাদের কোন আপত্তি আছে ?—বললেন মিসেস নন্দী, —একটা বড় অর্গ্যানাইজেশনের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা ভাল। আমরা এখানকার কর্মীদেব তৈরী তাঁতের কাপড, বেতের ঝুড়ি, টেবিল ক্লথ মেলায কিম্বা এক্সজিবিশনে বিক্রী করিযে দেব। সিঙ্গারমেশিনও সাপ্লাই করবো। লাইব্রেরী করে দেব।

—বেশ তো, এ্যাফিলিযেটেড করে নিন না এদের,—বলল ধীরেন্দ্রলাল।

নীরদা বলল,—কিন্তু ওদের অনুমোদন পেতে হলে, আমাদের ফাণ্ডে আড়াইশো টাকা আছে. দেখাতে হয় যে। অত টাকা তো নেই আমাদের এ্যাকাউণ্টে। কি করি বলো তো ?

প্রৌঢ়া সভ্যা কমলা দাসগুপ্তা বললেন—এত তাড়াতাড়ি আড়াইশো টাকা আমাদের খাতায় দেখিয়ে দেওয়া পসিবল নয় ধীরেনবাবু। আপনি মিউনিসিপ্যালিটির টাকা কোন 'হেড' থেকে নিয়ে আমাদের দিতে পারেন না ? পরে আমরা শোধ করবো—

—না, না, ওসব আমি পারবো না,—ধীরেন্দ্রলাল বলল।

নীরদা বলল—যে দুশো টাকা 'গ্রাণ্ট' দাও, তাই একমাসের 'এ্যাডভ্যান্স' দাও না ?

—না, তাও পারবো না—বলল ধীরেন্দ্রলাল। আরও একটা কথা যেন তার ঠোঁটের রেখায় কেঁপে কেঁপে থেমে গেল।

মিসেস নন্দী বললেন,—নীরদাদেবী অত ভাবছেন কেন ? আপনারা চ্যারিটি 'শো' করে টাকাটা তুলতে পারেন, মেয়েরা পাবলিকের কাছে চাঁদাও আদায় করতে পারে—

—আপনি কিছু মনে করবেন না, ধীরেনবাবু,—বললেন একটি মহিলা, —সত্যিই, এরকম অসঙ্গত প্রস্তাব করা ঠিক হয় নি।

—স্পষ্টভাবে না বললাম বলে আপনারা কিছু মনে না করলেই হলো, বিষণ্ণ গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল। নীরদার ভাবলেশহীন পাথরের মত নির্বিকার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো।

ক্যাঁচ্ করে ব্রেক কষে বাইরে একটা জীপ থামল। চঞ্চলতার জোয়ার এসে গেল মহিলাদের ভেতরে। বর্ষার নতুন জলের আহ্লাদের মত কলকল করে সবাই বলল—মিসেস বাসু এসে গেছেন।

—তরুদি এসেছে ?—তরুদি !

—ডি. এম-গিন্নী যখন এসেছেন, সঙ্গে নিশ্চয়ই তরুদি আছে।

ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে মেয়েরা সবাই বাইরে এল। উচ্চকিত গলায় সম্মিলিত অভ্যর্থনার বৃষ্টি ঝরল।—'আসুন—আসুন কী ভাগ্যি আমাদের !'

উগ্র সাদা আলোর সম্মুখে গোলাপী সিল্কের শাড়ী পরা একটা সতেজ স্থলপদ্মের মত ডি. এম-গিন্নী মিসেস বাসুর আবির্ভাবের আড়ালে সমস্ত ঘরটাই যেন হারিয়ে গেল। সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্ত দৃষ্টি তাঁর চোখের তারায় তারায়। মিসেস নন্দী নমস্কার বিনিময় করলেন।

—নীরদা কৈ, জলসা কোন ঘরে হবে ?—ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তরুদি। মিশকালো রঙের পৃথুল দেহটা টেনে টেনে ভেতরের বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

—ভেতরের বারান্দাতেই ফরাস পেতে রেখেছি তরুদি। হারমোনিয়াম, তবলাডুগী সব রেডী। আপনার মেয়ে এসেছে? নাচবে কে?

—এসেছে মানে? সেই বেলা চারটে থেকে আমি আর শীলা ডি. এমের বাংলোয় বসে আছি—বললেন তরুদি—মিসেস বাসু সব ইন্টারভিউ শেষ করে তবে এলেন। আমি বলেই তাকে নিয়ে আসতে পেরেছি, তাই না মিসেস বাসু?—

—হ্যাঁ, অসম্ভব আপনার ধৈর্য্য। আপনার মেয়ে কী নাচ দেখাবে? মৃদু হাসির রেশ টেনে বললেন মিসেস বাসু।

—নটীর পূজার শেষ দৃশ্যে শ্রীমতীর নৃত্য। গতবার পাবলিক স্টেজে শ্রীমতীর ভূমিকায় অভিনয় করে শীলা মেডেল পেয়েছিল?

—আপনার মেয়ে কৈ?—বললেন মিসেস নন্দী।

—এই শীলা, এদিকে আয়—হেঁকে উঠল তরুদি।

একটি মোটা, কালো, নাদুসনুদুস চেহারার মেয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। বুলডগের মত মুখখানায় বোকা বোকা হাসি। দুটো ছোট ছোট চোখে ঘর দৃষ্টি। শিউরে উঠলেন মিসেস নন্দী। এই চেহারায় শ্রীমতী!

সহরের শ্রেষ্ঠ হারমোনিয়ম বাজিয়ে মাষ্টারদা এলেন, বাঁশেরবাঁশী-বাজিয়ে শান্তি সেনও এলেন। কলরব করতে করতে মেয়েরা সবাই ভেতরে বারান্দায় চলে গেল। নিউ টাউনের বাতাসের বুকে তরঙ্গ তুলে শ্রীমতীর ঘুঙুর-ধ্বনি বেজে উঠল। হারমোনিয়ম আর বাঁশীর সুরের মূর্ছনায় আচ্ছন্ন বিবশ হয়ে গেল চারিদিক। সকলের অলক্ষ্যে ধীরেন্দ্রলাল বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমে পড়ল।

॥ বাইশ ॥

পশ্চিম আকাশ থেকে শেষ সূর্যের রঙ্ মুছে গেল। রাত্রির ছায়া নেমেছে ঢাকা কলোনীর ওপর। পদ্মর বাড়ীর সামনে শান্তিলতা ফুলে ছাওয়া গেটে

একটা টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছে। ম্লান আলোটাকে ঘিরে একটা গুবরে পোকা চক্রাকারে ঘুরছে। নিবারণ, নরেন, বিশু আরও অন্যান্য বিড়ি কারিগররা ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করছে। বাড়ীর উঠোনে ছাদনা তলা রচিত হয়েছে। আলপনায় আঁকা লক্ষ্মীর পদচিহ্নের ওপরে গ্যাসের ম্লান বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ঘরের ভেতরে বিষাদের স্বর্ণ প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে সুধা। তার কাজল পরা চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে।

পদ্ম বলল,—কাঁদছিস কেন রে সুধা। ফটা তোকে ছোটবেলা থেকে ভালবাসে। তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্ছি। তোর আনন্দ হওয়া উচিত—

—ভালবাসতে পারে। কিন্তু বড় ঠুন্‌কো-মনের মানুষ, পদ্মদি—বিষাক্ত গলায় বলল সুধা—আমি লজ্জার মাথা খেয়ে ওকে বহুবার বিয়ের কথা বলেছি। কিন্তু ও আমাকে আমলই দেয় নি।

—তুই ভুল করছিস সুধা। পুরুষ মানুষ সব দিক বিচার করে তবে কাজে হাত দেয়। তারা মেয়েদের মত ভাবাবেগে অন্ধ হয়ে কোন কাজ করতে পারে না—

—যার একটা মুখের কথায় সব উজাড় করে দিতে পারতাম তার জন্যে আমার সেই ভালবাসাকে তুমি ভাবাবেগ বলছো পদ্মদি ?

—ভালবাসার সবটুকুই আবেগ সুধা। প্রেম, প্রীতি, যে কোন রকমের আকর্ষণ—সবই অবেগ টলোমলো একটা অসুস্থ মনের লক্ষণ।

—কৈ পদ্ম, মেয়ে সাজানো হয়ে গেছে ?—ব্যস্ত হয়ে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে নিবারণ বলল—সুধা কি রাজী হচ্ছে না ?

—না, না, রাজী হবে না কেন ? তোমরা ফটাকে সাজাও।

নিবারণ চলে গেল।

পদ্ম বলল—দেখ সুধা, নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনিস না। জীবন, যৌবন খেলার জিনিস নয়। ভালবাসা, প্রেমের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু বিয়ে একটা জীবনের একটা বড় প্রয়োজন।

—কেন, তুমিও তো কুমারী মেয়ের মতই জীবন কাটাচ্ছো পদ্মদি।

—আমি।—শীর্ণ হাসির রেখা ফুটল পদ্মের ঠোঁটের কোণে।—তুই কি ভাবছিস আমি খুব সুখে আছি? বিয়ে হয়েও স্বামীর ঘর না করা, স্বামীকে না পাওয়া, মেয়ে মানুষের যে কতবড় দুঃখ আর অপমান তা যদি জানতিস—চোখ ফেটে জল এল পদ্মর। করুণ কোমল গলায় বলল—দেখ সুধা ঘা খাওয়া জীবনে অভিজ্ঞতা হয়েছে প্রচুর। দেখেছি বিয়ে না হলেও মেয়েরা স্বাধীনভাবে নানা কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে দিন কাটাতে পারে। কিন্তু শান্তি পায় না। আমি মেয়েমানুষ তাই তাদের সব চেয়ে বেশী আমিই বুঝতে পারি।

হঠাৎ গলাটা নামিয়ে সুধার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল,—নীরদা দেবীকে দেখিস নি? কম বয়সে ওর স্বামী মারা গিয়েছে। এত যে হাসি খুসী আর ঘাড়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে গরবিনীর মত চলন। তবুও কেন ধীরেনবাবুর আশপাশে ছায়ার মত ঘোরে? উত্তরবঙ্গ স্ত্রীমহামণ্ডলের মার্কেটিং অফিসার ঐ ছোকরা অনিমেষবাবুর সঙ্গেও ঢলাঢলি করে?—পদ্মের শেষের দিকের কথাগুলো ধারালো হয়ে উঠল।

সুধা বলল,—সবাই বলে ধীরেনদাকে তুমি ভালবাসো, তাই নীরদাকে হিংসে কর।

—এরকম কথা বলা খুব স্বাভাবিক,—শান্তগলায় বলল পদ্ম। যেন কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলছে—এক বাড়ীতে অনেকদিন ছিলাম। অনাত্মীয় দুটো ছেলেমেয়ে মেলামেশা করলেই লোকে সন্দেহ করবে। আরও একটা কথা আছে, তোকে ভালবাসি বলেই বলছি।

—কি পদ্মদি?

—সত্যিই ধীরেনবাবুকে আমার খুব ভাললাগে। আর আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব যে তিনি আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়েকে ভাল-বেসেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস। বাবা বলতেন, প্রেম হলো প্রকৃতিরই একটা মায়া। মেয়ে-পুরুষকে ঐ মায়ার বন্ধনে বেঁধেই প্রকৃতি পৃথিবীবকে সেই আবহমান কাল জীবনের স্রোত অব্যাহত

রেখেছেন। দুটো তরুণ-তরুণীর যে তীব্র আকর্ষণ সেটা সৃষ্টিরই তাগিদ। তাই মনে হয়, আমি যুবতী বলেই হয়তো ধীরেনবাবু আমাকে—

—তুমি এত জানো পদ্মদি !—শ্রদ্ধায় গভীর হয়ে ওঠে সুধার চোখ দুটো।

পদ্ম কুন্ঠিত হয়ে বলল,—কিছুই জানিনা ভাই, কোনোকালে স্কুলের মুখ দেখিনি। বাবা ছিলেন মস্ত পণ্ডিত। দিনরাত পুঁথির ভেতরে ডুবে থাকতেন। আমার সব জ্ঞানই তাঁর কাছ থেকে—

—আচ্ছা পদ্মদি রোজই তো ধীরেনদা নীরদাদেবীর বাড়ীতে যায। নানা কথাও শোনা যায়। তবুও ধীরেনদাকে তুমি বিশ্বাস কর, ভালবাসো।

—আমারও অনেক কথা কানে আসে। বুকের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যায়—একটু থেমে কেমন ব্যথাতুর চোখে গ্যাসের আলোর দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় পদ্ম বলল—কিন্তু গভীরভাবে যাকে ভালবাসা যায় তাকে অবিশ্বাস করতে মন চায় না ভাই।

—তুমি আশ্চর্য মেয়ে পদ্মদি !—বলল সুধা।

যাত্রার দলের বিড়ি ফোঁকা রাধা, ঢ্যাপার কারিগর সুদাম অখণ্ড মনযোগে ফটার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিচ্ছে আর গুন গুন করে সুর ভাঁজছে। করুণ গলায় ফটা বলল—তোরা তো বিয়ে দিচ্ছিস। কিন্তু আমি সংসার চালাবো কেমন করে ?

—কেন আমরা আছি। তুই বিড়ি কারিগর। তোর দুঃখে আমরা বুক দিয়ে পড়বো,—উত্তেজনায় টুলুর চোখদুটো জ্বলে উঠল। শিবু বলল, অভাব কার নেই রে ? তাই বলে সত্যিকারের ভালবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে যাবি তুই ?

—ইয়ার্কী পেয়েছো !—কোমর দুলিয়ে বলল ভোঁদড়,—হুঁ হুঁ বাবা, ধান খেয়েছো, এখন পালিয়ে যেতে চাও।

—আমার মা যে ঘরে উঠতে দেবে না। তার যে ভীষণ অমত। আর আমার হাজারে মাত্র এক টাকা মাইনে !

—মাইনে আমি বাড়িয়ে দেব।—দৃপ্ত পায়ে ঘরে এল পদ্ম। বলল,—যদি তোর মা উঠতে না দেয় তাহলে তোরা আমার কাছে থাকবি। তবুও একটা

জীবন নষ্ট করে দিতে পারিস না তুই। কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করলেই নিজের ওপরে দায়িত্ব এসে পড়ে। সে খেয়াল আগে ছিল না? তোর ওপর অভিমান করেই ও নারীমঙ্গল আশ্রমে রওনা হয়ে চরম বিপদের মুখে পড়েছিল—

ফটার মুখে কোন কথা নেই।

চেঁচিয়ে উঠল সুদাম—আরে পাউডারের ভেতরে একটু সিঁদুরের ছিঁটে হলে ভাল হতো—

—সিঁদুর মেশানো পাউডার কি ফটার কালো তোবড়ানো গালে ঘসবি—হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ল ভোঁদড়,—যা হবে মাইরী!

তরল অন্ধকারে ঘেরা উঠোনের ছাদনাতলা থেকে আকুল গলায় চেঁচিয়ে উঠল লালু—কিরে, তোদের সাজানো হলো? সেই সকাল থেকে উপোস করে বসে আছি। পেট চোঁ চোঁ করছে।

—থাম রে, থাম, হয়ে গিয়েছে। যাচ্ছি আমরা, কন্যা সম্প্রদান অত সহজ নয় হে। একটু কষ্ট করতেই হয়।

—টুলু শোন—ভীত সঙ্কুচিত গলায় বলল ফটা—সুধা বোধহয় কাঁদছে না রে? হয়তো আমার ওপর খুবই রাগ করেছে। সেদিন খাড়ির ধারে—

—বেশী ভালবাসলে অভিমানও খুব বেশী হয়। ওসব কিছু না।—বলল টুলু।

—ওর মতামতটা—

—পদ্মদি ওকে অনেক বুঝিয়েছেন। প্রথমে সে তোকে বিয়ে করতে আপত্তি করছিল।

—আপত্তি করছিল!—তীক্ষ্ণ গলায় বলল ফটা।

—আপত্তি করবে না? ভালবেসে মন মজিয়ে তারপরে মেয়েটাকে তুই পাকিস্তানে—

—প্রেম করতে হলে বুকের পাটা চাই বুঝলি—নিজের বুকের ওপরে প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে ভোঁদড় বলল—ঐ যে আমাদের কলোনীর বিধবা কাতু

বুড়ীর মেয়ে বিমলী! কলোনীর মাতব্বর নিতাই সেন ঐ বাড়ীর আশপাশে খুব ঘুর ঘুর করতো। একদিন হাত চেপে ধরেছিল বুঝি বিমলীর।

—তুই কি করলি?

—একদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে নিতাইকে শাসিয়ে দিলাম। তারপর কাছু বুড়ীর সে কি খাতির! বাড়ীতে দুধের সর তোলা ঘি, চিনি, মুড়ি, রসখাজা—

—আর বিমলী!—কৌতূহলে জ্বল জ্বল করছে জোড়া জোড়া চোখ।

ভোঁদড় বলল—বিমলী তো ভোঁদড়দা বলতে অজ্ঞান।

—সব ফোর-টুয়েন্টি! বলল শিবু,—তোর সব চালিয়াতি গল্পো।

—চালিয়াতি গল্প!—তাহলে তো শালা টুনীর সঙ্গে তোর ভাব-ভালবাসার কথাও ডাহা মিছে কথা—গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভোঁদড়।

উগ্র ক্রোধে জ্বলে উঠল টুলু, বলল—শালা, সাধেই কি তোদের লোকে ঘেন্না করে বিড়ি-বাঁধা ছেলে বলে। এসেছিস একটা কাজে। এখানে এসেই নিজেদের বাছুরে-প্রেমের গল্পো সুরু করেছিস।

—কৈ পদ্ম তোমাদের সব আয়োজন শেষ?

বিশু, নরেন, নিবারণের দলটা গোল হয়ে ছাদনা তলার পাশে শতরঞ্চির ওপরে বসল। কণের ঘর থেকে ভেসে এল পাড়ার মেয়েদের উলুধ্বনির তীক্ষ্ণ মিষ্টি শব্দ। আকাশে চন্দনের কৌঁটার মত রাশি রাশি তারা। নীচে পৃথিবীর এই দূরকোণে একটা শ্রীহীন খোলার ঘরের চারিদিকে তরঙ্গিত হয়ে বয়ে চলল উৎসবমত্ত নরনারীর আনন্দিত কলরোল। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে উঠোনের দোপাটি ফুলের পাতায় পাতায়, যেন জোৎস্নার টোপর পরে হেসে হেসে মাথা দোলাচ্ছে ফুলগুলো। শহরের সমস্ত তরুণ বিড়ি কারিগরদের শিরওঠা, চিমড়েপড়া মুখে উল্লাসের ঝিকিমিকি। তাদেরই একজনের জীবনের শুভলগ্নে তাদের সব দুঃখকষ্ট যেন নির্বাসিত হয়ে গিয়েছে। শিবু, ভোঁদড়, সুদাম, টুলু, সুধাকে পিঁড়িতে বসিয়ে ধীর মন্থর গতিতে একটার পর একটা পাক ঘোরাচ্ছে।

—উলুধ্বনি দেরে আবার!—উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে পদ্মর গলা। সন্ধ্যার বাতাসকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে উলুধ্বনি উঠল তিনবার। আর ফটা! বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে কপালে। হৃৎপিণ্ডটা কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। এখনি, এখনি—মল্লিকা ফুলের পাপড়ির মত শ্বেত চন্দনের ফোটা আঁকা সুধার কমনীয় মুখখানা, তার মুখের সামনে তুলে ধরবে ওরা। সুধার হাসি হাসি চোখ,—হাসি? না চরম ঘৃনার একটা ধিক্কার ধারালো হয়ে উঠবে তার চোখে। না, না, সে পারবে না। ওর কান্নার সামনে যেমন একদিন দাঁড়াতে পারে নি, তেমনি ওর তীব্র ঘৃণাভরা দৃষ্টির সম্মুখেও সে দাঁড়াতে পারবে না! ইচ্ছে হলো যে এই মুহূর্তে ছুটে কোথাও বেরিয়ে যায়, কিন্তু—

কিন্তু বর-কণের মাথার ওপরে রাশি রাশি শ্বেত পুষ্পের মত খই ছিটিয়ে দিল পদ্ম। ফটার আলাধরা দুটো চোখের আয়নায় প্রতিফলিত হলো সুধার দুটো চোখ। পাথরের মত নির্ব্বিকার শীতল সুধার দুটো চোখের দৃষ্টিতে বেদনার ছায়া। ফটার চোখ করুণ হয়ে উঠল। তার চোখদুটো যেন সুধার পায়ে ছটফট করে লুটিযে লুটিযে পড়ে বলতে চাইল—আমাকে ক্ষমা করো। যেন কুপিতা ঐ নাগিনীকে খুসী করার আশায় তার মুখে ম্লান হাসির রেখাও জাগল। চোখ ফেটে জল এলো সুধার। কাজল পরা জলভরা চোখদুটোয ছুরির ফলার মত একটা শাণিত দীপ্তি চারিদিকে ঠিকরে পড়ল। মুখ নীচু করল ফটা।

চেঁচিয়ে উঠল টুলু,—মুখ তুলে তাকা।

—ওদের শুভ দৃষ্টি তো পাবনা কলোনীর মাঠের ছায়ায, বঙ্গীব কালভার্টে অনেক হয়েছে,—বলল নিবারণ—ছেড়ে দাও ওতেই হবে।

বিয়ের আর সব আনুষ্ঠানিক কাজ শেষ করে বরকণেকে বাসর ঘরে নিয়ে গেল পদ্ম। ভোঁদড লালুদের বাড়ী থেকে ঘুরে এসে বলল—সুধার মা কিছুতেই এল না পদ্মদি। কেমন পাগলের মত চুল ছেড়ে দিয়ে উঠোনে পায়চারী করছে। আমাকে দেখেই মারমুখী হয়ে উঠল। বলল—যাও, আমি জানি আমার মেয়ে মরে গিযেছে—একটা খড়কাটা কাটারি তুলে নিয়ে মারতে এল আমাকে।—

—তাহলে বোধ হয় মাথাটাই খারাপ হয়েছে রে! চাপা ফিসফিস গলায় বলল পদ্ম—যাক সুধা কি লালুকে কিছু বলিস না।

হঠাৎ বাইরে রাতের নিস্তব্ধ বাতাসে সাইকেলের বেল বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং—

—দেখ তো কে ডাকে?

ভোঁদড় ছুটে বাইরে গেল। দুরু দুরু কাঁপতে লাগল পদ্মর বুক। এত রাত্রে সাইকেল করে তার বাড়ীতে কে আসবে! তবে কি টেলিগ্রাম পিওন! দূরে পূব দিকের বারান্দায় বিড়ি-কারিগররা দল বেঁধে খেতে বসেছে। বাসরঘরে মেয়েরা হুল্লোড় করছে। ভোঁদড় চীৎকার করে বলল—পদ্মদি শীগগীর এস। তোমার নামে টেলিগ্রাম এসেছে।

—টেলিগ্রাম!—পদ্মের বুকের ওপর দিয়ে যেন রেলগাড়ীর চাকা চলেছে গুরু গুরু ধ্বনি তুলে। নিশ্চয়ই ন্যাদোনের খবর! কারবাইডের গ্যাসের আলোয় টেলিগ্রামটা পড়েই চমকে উঠল ভোঁদড়। বলল,—ন্যাদোন দার কলেরা হয়েছে পদ্মদি! বৌদি তোমাকে যেতে বলেছে ফাষ্ট্ মোটরে—

—ন্যাদোনের কলেরা হয়েছে!—শিউরে উঠল পদ্ম।

মুহূর্তে বিষাদের ছায়া নেমে এল উৎসবমত্ত বাড়িটার চারিদিকে। ছুটে বাইরে এল ফটা। বলল,—আমি তোমার সঙ্গে যাবো পদ্মদি।

—না তোকে যেতে হবে না। লালু যাবে আমার সঙ্গে। রোগীর সেবার কাজ লালু খুব ভাল করে।

—তাহলে কাউকে পাঠিয়ে গঙ্গারামপুরের ফার্স্ট টিপের মোটরের দুটো টিকিট কিনে আনো,—বলল ফটা।

—ভোঁদড় যা তো, শীগগীর দুটো টিকিট কিনে আন—বলল নিবারণ, —আর আসার সময় ধীরেনদাকেও আসতে বলবি। আমাদের মালিকরা কি বলল তাও তো উনি বললেন না—

চোখের পলকে ছায়ার মত অদৃশ্য হয়ে গেল ভোঁদড়।

॥ তেইশ ॥

শেষরাতের অন্ধকার ঝিকমিক করছে চারিদিকে। পুবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে। পদ্ম, তার টিনের স্যুটকেশটায় কয়েকটা জামাকাপড় ভরে ফেলল। তীব্র একটা কান্না নিঃশব্দে ঝরছে বুকের ভেতরে। হয়তো পুঁটি প্রাণপণে যুদ্ধ করছে মৃত্যুর সঙ্গে। কলেরায় বেশীক্ষণ নাকি মানুষ বাঁচে না। সে কী গিয়ে ন্যাদোনকে দেখতে পাবে! নিজের বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছে তার একটিমাত্র ভাইকে। 'দিদি তুই আমার মায়ের মত।' হঠাৎ ন্যাদোনের কথাটা যেন তার কানের কাছে বেজে উঠল। পদ্মর স্নায়ুগুলো যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

সেই ভোরেই ধীরেন্দ্রলাল এল। বলল,—আমি সব শুনেছি, পদ্ম। আর আধ ঘণ্টা পরেই তো মোটর ছাড়বে। তুমি তৈরী হয়েছো তো?

—হ্যাঁ জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়েছি।

—লালু কোথায়?

—লালু বাসষ্ট্যাণ্ডে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে ভাল হতো। লালু ছেলেমানুষ। অচেনা জায়গা। যদি ন্যাদোনকে নিয়েই আসতে হয়।—কাতর হয়ে উঠল পদ্মর চোখের দৃষ্টি।

—তোমাকে বলতে হতো না পদ্ম। কিন্তু বিড়ি-কারিগররা হয়তো ধর্মঘট করবে। মালিকরা এক পয়সাও মাইনে বাড়াতে রাজী নয়। তুমিই বলো, এই সময় নিবারণদের ছেড়ে কি যাওয়া উচিত।

—কেন? কামিনীবাবু, দীননাথবাবুরা কি বললেন?

—কামিনীবাবু তো ধর্মঘটের নাম শুনেই জ্বলে উঠলেন। বললেন, আমারই উস্কানীতে নাকি ওরা নাচছে। দীননাথবাবু বললেন, ধর্মঘট করলেই প্রত্যেকটি বিড়ি কারিগরকে ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দেবেন।

—নিবারণরা কি করবে ঠিক করেছে?

—ওরা দোকানের সামনে পিকেটিং করবে। কলকাতার বিড়িপাতার ডিলারস এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মনসুখলাল মেহতাকে অনুরোধ করবে

রামনগরে পাতার চালান বন্ধ করে দিতে। এই সব প্ল্যান করছে। আজকে সন্ধ্যায় বাঁদর ব্র্যাণ্ডের কারখানায় ওদের মিটিং আছে—

—কামিনীবাবু বাস্তুত্যাগী ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়ে রিফিউজি বিড়ি কারিগরদের অভাবটা বুঝতে পারছেন না? আশ্চর্য! টাকা হলে মানুষের এরকম মতিচ্ছন্নই হয়।

—চল, বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে। তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

পদ্ম ও ধীরেন্দ্রলাল রাস্তায় নামল। ছায়া ছায়া অন্ধকার দুলছে ঢাকা কলোনীর গাছের পাতায় পাতায়। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে পদ্ম বলল—দেখ, নিবারণরা যেন কোন কষ্ট না পায় বা হাঙ্গামায় না পড়ে। যদি মাইনে বন্ধ করে দেয় ওদের মালিকরা তাহলে ফটাকে বলবে—আমার কিছু টাকা ওর কাছে থাকল।

—কোনদিকে সামলাই বলো তো? ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটির 'অডিট' হবে শীগগীরই। একেবারে শিরে সংক্রান্তি।

—'অডিট' হবে, তা তোমার ভাবনা কি?

—না, তাও তো একটা চিন্তা। এ্যাকাউটান্ট গোপালবাবু বুড়ো মানুষ, কি করে রেখেছে কে জানে!—বাস-স্ট্যাণ্ড এসে পড়ল। দূর থেকে লালু হাতছানি দিয়ে ডাকছে—শীগগীর এসো পদ্মদি, মোটর ছেড়ে দিচ্ছে—

মোটরে উঠে পদ্ম বলল—ন্যাদোনকে কিরকম যে দেখবো। আমার কিন্তু কেমন ভয় করছে। কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

—কিসের দুঃস্বপ্ন?

—আমার যেন কেউ নেই। আত্রাই নদীর ধারে শ্মশানে বসে নিজের মাথার চুল নিজে ছিঁড়ছি আর বুকফাটা কান্না কাঁদছি। কেউ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসাও করছে না, কি হয়েছে?—

—ন্যাদোনের টেলিগ্রাম পেয়েই তোমার মন খারাপ হয়েছিল। তাই ওসব স্বপ্ন দেখেছো। পৃথিবীর সবাই তোমাকে পরিত্যাগ করলেও জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমি তোমার পাশে থাকবো, পদ্ম।

—সত্যি বলছো!—ধীরেন্দ্রলালের হাতে একটা মৃদু চাপ দিল পদ্ম। তার বিষণ্ণ চোখ দুটো প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল,—দেখ, নীরদা দেবীর বাড়ীতে বেশী যেও না, লক্ষীটি! লোকে যা তা বলে—

—আজকাল সময়ই পাই না। ওর ওখানে বেশী যাই না তো।—নিভু-নিভু গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল। ম্লান ছায়া ভেসে উঠল তার মুখে।

গর্জন করে উঠল মোটরের ইঞ্জিন। পদ্ম বলল, যদি নিবারণরা ধর্মঘট করে তাহলে জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানও বন্ধ রেখ বুঝলে? মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ধীরেন্দ্রলাল।

গঙ্গারামপুরের বাস কালিয়াগঞ্জ রোডের ওপর দিয়ে চলতে সুরু করল দ্রুতগতিতে।

বাঁদর ব্র্যাণ্ড বিড়ির কারখানায় জরুরী সভা বসেছে। বিড়ি কারিগর ইউনিয়নের সভাপতি আসেন নি। তিনি অসুস্থ। কালিপড়া লণ্ঠনের ম্লান আলোর ছায়া কাঁপছে বিড়ি-কারিগরদের মুখের রেখায় রেখায়। তাদের চোখে চিন্তার কালো ছায়া। বুকের ভেতরে কলরব করে উঠছে অনাহার, পীড়ন, অপমান। কেননা তাদের নেতা নিবারণ একটু আগে জ্বালাময়ী ভাষায় কারিগরদের দুঃখ দৈন্যের কথা বলে, প্রত্যেককে দিয়ে ধর্মঘটে যোগদানের শপথ করিয়ে নিয়েছে।

ভোঁদড় বলল, কিন্তু মালিক ছাঁটাই করে দিলে কি করবো?

—ছাঁটাই করলেই হলো?—ফুঁসে উঠল আরেকজন—মালিকরা নতুন কারিগরকে আমাদের সামনে দিয়ে দোকানে নিয়ে যাক তো দেখি—

—তাতে পুলিশ হাঙ্গামা হতে পারে।

—হোক। সবরকম দুঃখকষ্টের জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে।—গর্জন করে উঠল নিবারণ—সংসার চালানোর মত একটা মাইনে আমরা চাই। তা না হলে আমাদের সবাইকে 'স্মাগলিং' করতে হবে বা যে কোন অসাধু উপায়ে পেটের ভাত জোগাতে হবে।

—ওই তো বলদা-বাড়ীর 'সাবিত্রী বিড়ির' বুড়ো কারিগর সুরেশকে

আবগারী পুলিশ ধরেছে, সে নেপাল থেকে চালানী বে-আইনী গাঁজা বিক্রী করতো—

—আমি চাই, আমাদের যে জীবিকা, তার রোজগারেই সৎ ভাবে জীবন যাপন করুক সব বিড়ি-কারিগর এবং এটা আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী। কামিনী সরকার, দীননাথ চৌধুরী ইত্যাদি মালিকরা এই বিড়ির ব্যবসা করেই নিউ টাউনে জমি কিনেছে। অথচ গরীব কারিগরদের হাজারে সওয়া দুই টাকা মাইনে দিতেই তাদের আপত্তি।—উদ্দীপ্ত হয়ে বলল নিবারণ—এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাতে হবে। আসছে কাল তোমরা কেউ দোকানে যাবে না।

হঠাৎ ধীরেন্দ্রলাল এল। সঙ্গে সঙ্গে কলরব করে উঠল কারিগররা। কিন্তু নিবারণ গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরেন্দ্রলাল বলল, কি তোমরা তাহলে ধর্মঘট করাই ঠিক করলে?

—নিশ্চয়ই ধর্মঘট করবো।—জ্বলে উঠল নরেন—আপনি তো আমাদের জন্যে কিছুই করলেন না?

—কামিনীবাবু, দীননাথবাবুকে আমি তো তোমাদের কথা বলেছিলাম ভাই।—যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে ধীরেন্দ্রলাল।

—আপনি সম্পূর্ণ বদলে গেছেন ধীরেনদা।—ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল।

—এই, থামো। বাজে কথা বলো না।—চীৎকার করে ধমকে উঠল নিবারণ।

ধীরেন্দ্রলাল গম্ভীর হয়ে বলল,—তোমাদের ধর্মঘটের পরিকল্পনা কি শুনি? মনে হচ্ছে তোমরা আমাকেও জড়িয়ে ফেলবে। বিড়ি ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা আমিই তো করেছি, আবার—

—ইচ্ছে করলে আপনি আমাদের সমর্থন না করতে পারেন।—বলল স্পেশাল মতির বিশু।

ধীরেন্দ্রলালের চোখে কেমন অন্যমনস্ক দৃষ্টি। কি যেন এক অস্বস্তির

ছায়া ভাসছে তার মুখে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিবারণ বলল, সংক্ষেপে আমাদের পরিকল্পনা হলো—আমরা যার যার বিড়ির দোকানের সম্মুখে 'পিকেটিং' করবো। প্রসেশান করে এস. ডি. ও-র বাড়ী যাবো এবং তাঁকে আমাদের অভাব-অভিযোগ বলবো। যদি মালিক দোকান খুলতে চায়, তাহলে বাধা দেব।—দ্বিতীয়ত, রামনগর-কালিয়াগঞ্জ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর বুকিং অফিসে খোঁজ নিয়েছি। আসছে কাল বিড়ির কেঁদপাতার চালান আসছে চল্লিশ বস্তা। ঐ পাতার 'ডেলিভারী' নিয়ে মালিকরা অন্য কারিগর দিয়ে বিড়ি তৈরীর চেষ্টা করবে এবং আমরা শুনেছি, কামিনীবাবু তাই করতে মনস্থ করেছেন। এই জন্যেই বিড়ির পাতা যাতে মালিকরা ডেলিভারী নিতে না পারে, আমরা সেই ব্যবস্থা করবো—

—বেশ ভাল। আমি প্রার্থনা করি, তোমাদের আন্দোলন জয়যুক্ত হোক। —নিস্পৃহ গলায় বলল ধীরেন্দ্রলাল। একটু থেমে আবার নিবারণকে বলল,—দেখ ভাই, লোকে যেন আমাকে এই গোলামলে জড়িয়ে কোন বদনাম না করে।—বলেই ঝড়ের বেগে ধীরেন্দ্রলাল বেরিয়ে গেল।

নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছে ধীরেন্দ্রলালের মাথার ভেতরটা। কানের কাছে রগ দুটো দপ দপ করছে। মিউনিসিপ্যালিটির 'অডিট' আসছে। রাত্রে তার ভাল করে ঘুম হয় না। মনে হয়, এই বিড়ি কারিগররা, বাস্তুত্যাগীরা তাকে ভালবেসে, শ্রদ্ধা করে যে সম্মানের আসনে বসিয়েছিল, তার মর্যাদা সে দিতে পারে নি। সরল ও আদর্শবাদী নিবারণের দৃঢ় মুখখানার দিকে তাকালেই তার বুকের ভেতরটা শির শির করে ওঠে। ভাবে, সে দিন আর বেশী দূরে নয়, যেদিন ওদের শ্রদ্ধায় আর প্রীতিভরা স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠবে। রামনগরের আকাশে বাতাসে বিড়ি কারিগরদের ধর্মঘটের কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। বিড়ির দোকান পর পর দুইদিন বন্ধ থাকলেই জনসাধারণ চঞ্চল হয়ে উঠবে। স্থানীয় সরকার তখন তাকেই দোষ দেবে। হঠাৎ নিউ টাউনের একটা বাড়ীর আলোর দিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

—কে ওখানে?—দূরে গণেশ ঘোষের বাঁশের ভিটের আড়াল থেকে কে যেন হেঁকে উঠল।

—আমি ধীরেন্দ্রলাল।

—ওঃ চেয়ারম্যান সাহেব! রামনগর বিড়ি ইউনিয়নের ফাউণ্ডার প্রেসিডেণ্ট!—ব্যঙ্গে ঝলসে উঠল বাঁদর ব্র্যাণ্ডের বিড়ির মালিক দীননাথ চৌধুরীর চোখদুটো।

—আপনি এখানে কেন চৌধুরী মশায়?

—তা আপনার শুনে দরকার?—কুটিল গলায় বলে উঠলেন চৌধুরীমশায়। কয়েক মুহূর্ত্ত রক্তজ্বলন্ত চোখে ধীরেন্দ্রলালের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—শুনুন বিড়ি কারিগররা যদি সত্যিই ষ্ট্রাইক করে, কি দোকান খুলতে বাধা দেয়, তাহলে আমরা কিন্তু আপনাকেই দায়ী করবো। আপনি মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান। শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হযে ঐসব ছোটলোকদের আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছেন। আমি এস. ডি. ও-কে একথা বলেছি।

—এস. ডি. ও.-কে বলেছেন!—আঁতকে উঠল ধীরেন্দ্রলাল। গলাটা শুকিয়ে এল তার। চিঁ চিঁ করে বলল,—কি বলেছেন তাঁকে?

—আমাদের রেজিওন্যাল ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সীর মিটিং ছিল এস. ডি. ওর চেম্বারে। এস. ডি. ও. সাহেব নিজে থেকেই বললেন, চৌধুরীমশায়, আপনার তো বিড়ির দোকান আছে। শুনছি ওরা নাকি ষ্ট্রাইক করবে! দেখবেন যেন কোন হাঙ্গামা না হয়, সদরে নতুন ডি. এম. এসেছেন—অত্যন্ত কড়া মানুষ। আমার বদনাম হয়ে যাবে।

—তার উত্তরে কি বললেন আপনি?

—আমি সোজা আপনার নাম বলে দিলাম। বললাম—স্যার, ধীরেন্দ্রলাল জোয়ারদারকে ডেকে একটু বলে দিন। ওই হচ্ছে নাটের গুরু। বিড়ি ইউনিয়নের সম্পাদক নিবারণ আর তার সব চ্যালাদের সে-ই নাচাচ্ছে।—গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ধরালেন দীননাথ। শান্ত অথচ কঠিন গলায় আবার বললেন,—আপনি একেবারে পথের ভিখিরী হয়ে রামনগরে এসেছিলেন। ওই

নিবারণরাই আপনাকে চেয়ারম্যান করেছে। কোথায় ওদের কিসে ভাল হয় তাই করবেন, তা না—

—বিশ্বাস করুন চৌধুরীমশায়, আমি ওদের ধর্মঘট করতে নিষেধই করেছি। এইমাত্র ওদের মিটিং থেকে এলাম। কিন্তু ওরা আমার কথায় আমলই দিল না।

—আপনার কথা সত্যি কি না, বুঝতে পারা যাবে পরে। আচ্ছা চলি, অনেক রাত হয়েছে। এস. ডি. ও. সাহেব আমাকে পেলে ছাড়তেই চান না। —গদগদ গলায় বললেন চৌধুরীমশায়।

সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে তিনি নিউটাউনের দিকে চলে গেলেন। আর দূরে এস. ডি. ও.র বাংলো বাড়ীর উজ্জল আলোর দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধীরেন্দ্রলাল। তীব্র একটা উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে তার রক্তে রক্তে। তার মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা পাপ আর সীমাহীন কোন অন্যায় যেন সহস্র তর্জনী তুলে তাকে শাসন করতে লাগল। কী কুক্ষণেই যে নীরদার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হল, এস. ডি. ও.র বাংলোর ঐ আলোটা যেন একচক্ষু হিংস্রতায় তারই দিকে তাকিয়ে আছে। না, উপায় নেই। কোন পথ নেই। নিদারুণ দীনতা আর অপমানের বিষে জর্জরিত হয়ে যাবে তার জীবন! সবাই তাকে পরিত্যাগ করবে! সন্ধ্যার অন্ধকারে রামনগর-কালিযাগঞ্জ রোডের ওপরে একটা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রইল ধীরেন্দ্রলাল। উত্তেজনায় আশঙ্কায় তার চুলের গোড়ায় গোড়ায় ঘাম জমে উঠল। যেমন করেই হোক আসন্ন সর্ব্বনাশ থেকে বাঁচতে হবে। রুদ্ধ অস্থিরতায় তার হাতের আঙুলগুলো নিসপিস করে উঠল।

পরদিন সকালেই নীরদা দেবীর বাড়ীর দিকে রওনা হলো ধীরেন্দ্রলাল। কয়েকদিন আগে পদ্ম বলেছিল, 'নীরদা দেবী তোমার পদমর্য্যাদাকে ভালবাসে, তোমাকে নয়। আমার মনে হয় তোমাকে সর্ব্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে সে'—কথাটা তার মনে হল, ঠিক—ঠিকই বলেছে পদ্ম। মিউনিসিপ্যালিটির

টাকা নানা খাতে খরচ দেখিয়ে, সেই টাকা দিয়ে শাড়ি গয়নাই সে কি কম দিয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে তার চেতনায় একটা বিষাক্ত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু—

কিন্তু সব সংযম, সব শুদ্ধ ও সৎ চিন্তা মুহূর্তে মন থেকে মুছে যায় নীরদার হাসি হাসি মুখের সামনে দাঁড়ালে। সে আর কঠোর হতে পারে না। কিন্তু সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, পদ্মর জন্য তার মনে যে স্নিগ্ধ পবিত্র একটা প্রীতির সুরভি ছড়ানো রয়েছে, নীরদার প্রতি তা নেই, তবুও একটা বিচিত্র অন্ধ আকর্ষণে বারে বারে সে তার কাছে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল ধীরেন্দ্রলাল,—নীরদা।

—যাক তাহলে আসতে পেরেছো? পদ্ম তোমাকে ছাড়ল?

—পদ্মর কথা কেন বলছো নীরদা? কৈ সে তো তোমার কথা বলে না! —বিরক্তি ঝরে পড়ল ধীরেন্দ্রলালের গলায়।

তাকে খুসী করার জন্যই যেন খিলখিলিয়ে হেসে উঠল নীরদা। বলল,—বলে না, তার কারণ পদ্মর সঙ্গে তোমার সত্যিকারের গাঢ় ভালবাসা আছে। প্রকৃত ভালবাসায় অবিশ্বাস, সন্দেহ বা হিংসা, কিছুই মনে আসতে পারে না।

নীরদার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো ধীরেন্দ্রলাল। নীরদার রূপ যেন ফেটে পড়ছে।

নীবদা আবার এক ঝলক হেসে বলল—জানো, উত্তরবঙ্গ স্ত্রী মহামণ্ডলের মার্কেটিং অফিসার অনিমেষবাবুর জীপে করে পতিরামে বোল্লায় আমাদের শাখা মহিলা সমিতির কাজ দেখে এলাম—

—তোমাদের সমিতির অন্যান্য সভ্যারা সব গিয়েছিলেন বুঝি?

—না, শুধু অনিমেষবাবু আর আমি গিয়েছিলাম। তিনি মেয়েদের হাতের তৈরী জিনিস দেখে খুব প্রশংসা করলেন। প্রতিটি জিনিসের 'কষ্ট অফ প্রোডাকশান' কষে বললেন, রামনগরের বাজারে বা এই জেলার কোথাও ওগুলো বিক্রী না করে, কলকাতার মার্কেটে ছাড়লে বেশ লাভ হবে। অবশ্য

ধলদীঘি মেলায় আর পূর্ব্বভারতীর বার্ষিক উৎসবে আমরা আমাদের জিনিসের একজিবিশান করব।

—নীরদা তোমাকে একটা কথা বলবো?—খুব তন্ময় হয়ে তাদের সমিতির কথা বলছিল নীরদা, তাকে বাধা দিয়ে ধীরেন ম্লান গলায় বলল—আচ্ছা নীরদা, এমন যদি কোনদিন হয়, শহরের সবাই আমাকে সম্মানের আসন থেকে টেনে নামিয়েছে, ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিনও তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে?

—কেন বলো তো?—বিস্মিত হয়ে নীরদা বলল—এসব কথা তোমার মনে আসছে কেন?

—না। এমনিই বলছি। যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

—ওঃ বুঝতে পেরেছি!—হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নীরদার মুখ। বলল,—তুমি অনেক দামী শাড়ি, গয়না আমাকে উপহার দিয়েছো, তাই তোমার দুশ্চিন্তা হয়েছে, না?

—তোমার জন্যে আমি অনেক নীচে নেমে গেছি নীরদা। তোমার সঙ্গসুখের লোভে এক একটা অন্যায় করেছি আর দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমোতে পারি নি।—ধীরেন্দ্রলালের করুণ মুখের দিকে তাকিযে চডা গলায হেসে উঠল নীরদা। বলল—নাঃ পদ্ম তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে দেখছি। যাঁরা পাবলিক ইনষ্টিটিউশানের কর্তৃপক্ষ হন, তাঁরা অনেকেই এরকম করেন। নিষ্কাম ভাবে জনসেবা যারা করে, তারা বোকা।

—বেশ, বোকা হয়েই না হয় থাকতাম। তবুও আজকের মত দুর্ভাবনায় জ্বলে পুড়ে মরতে হতো না।

—যখন লোভীর মত আমাকে 'প্রেজেণ্টেশান' দিয়েছিলে তখন মনে ছিল না?—ধারালো হয়ে উঠল নীরদার চোখের দৃষ্টি।

—লোভীর মত বলছো কেন? তোমাকে সত্যি ভালবাসি বলেই ত দিয়েছিলাম।

—পুরুষরা উপহার দেয় মেয়েদের ঐ ভালবাসাটুকুর লোভেই। 'প্রেজেণ্টেশান' মানেই ঘুস।

—কী ?—খরসান দৃষ্টিতে তাকাল ধীরেন্দ্রলাল তার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল,—তুমি কি বলতে চাও, তোমার ভালবাসার লোভে আমি তোমাকে ঘুস দিয়েছি! জেনে রেখ, আমি কোন কিছু না দিয়েও তোমার চেয়ে ঢের সুন্দরী অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি।

মৃদু হেসে নীরদা তার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল,—তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো ? পদ্মর কাছে থেকে আদর্শের রঙ মনে মাখিয়ে নিয়ে এসেছো দেখছি ?

—হাত ছেড়ে দাও। তার নাম উচ্চারণ করো না। তুমি তার নখেরও যোগ্য নও।

—কী !—জ্বলে উঠল নীরদা। হিংস্র সাপিনীর মত ফুঁসে উঠে বলল, —যখন প্রতিটি দিন রাতদুপুর পর্য্যন্ত আমার এখানে থাকতে—কতদিন তোমাকে বলেছি,—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নীরদা।

পাগলের মত চীৎকার করে উঠল ধীরেন্দ্রলাল—মুখ সামলে কথা বলো নীরদা। রাতদুপুর পর্যন্ত থাকতাম ? না তুমিই—বাদবাকী কথাটা তার গলায় আটকে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর মাটির দিকে তাকিযে সে বলল,—তুমি আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রেখ না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছো।

আগুনের একটা হলকার মত সাঁ করে বেরিযে গেল ধীরেন্দ্রলাল। কান্না-থমথমে মুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরদা। দূরে রামনগর বাজারের দিক থেকে আকাশ কাঁপিয়ে বিড়ি-কারিগরদের জয়ধ্বনি ভেসে এল—বিড়ি ইউনিয়ন জিন্দাবাদ! আমাদের দাবী—মানতে হবে, মানতে হবে! শত শত বিক্ষুব্ধ মানুষের নিরুদ্ধ আক্রোশের চীৎকারে রামনগরের শান্ত জীবন স্পন্দনের ধুকধুকি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

॥ চব্বিশ ॥

শুধু বিড়ি শ্রমিকরাই নয়, অনেক বাস্তুত্যাগী দোকানদারও তাদের মিছিলে যোগ দিয়েছে। শোভাযাত্রার আগে আগে চলেছে নিবারণ। মাথায় একরাশ উস্কোখুস্কো চুল হাওয়ায় উড়ছে। গায়ে ফতুয়া। কোমরে একটা কমলা রঙের চাদর জড়ানো। দুচোখে জলন্ত দৃষ্টি।

গলার রগ ফুলিয়ে চীৎকার করে উঠল নিবারণ—বিড়ি কারিগরদের দাবী—

—মানতে হবে! মানতে হবে!—জনতা দৃঢ়গলায় তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। শূন্যে আন্দোলিত হচ্ছে অসংখ্য পোষ্টার। পোষ্টারে লেখা রয়েছে, প্রতিটি বিড়ি কারিগরকে হাজারে সওয়া দুটাকা মজুরী দিতে হবে,—কোনটায় লেখা আছে, দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার মত মাইনে দিতে হবে।

দেশ ভাগের আগে, বিড়ি কারিগররা যৎসামান্য মাইনেতে খুসী হয়ে কাজ করেছে। কিন্তু শুধু বিড়িব দোকানের কাজ কবে সংসার চালাতে পারে নি কেউ। সবাইকেই বিড়ির দোকানের কাজ ছাড়াও অন্যত্র টুকটাক কাজ করতে হতো। কেউ করতো মোমবাতির ব্যবসা, কেউ বাড়ীতে তবিতরকারীর বাগান করে সেই সব্জী বাজারে বিক্রী করে সংসার চালাতো। কিন্তু দেশ ভাগের পর অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন রামনগরেব বিড়ি-কর্মীরা অধিকাংশই বাস্তুত্যাগী এবং তাদের অনেকেই অল্পসল্প লেখাপড়া জানা ভাল ঘরের ছেলে। তারা সর্বস্ব বিসর্জন দিযে এদেশে এসেছে। 'রিফিউজি লোন' নিযে কেউ কোন কলোনীতে মাথা গুঁজবার আশ্রয গডতে পেরেছে, কেউ পারে নি। দিনেরাতে হিংস্র দারিদ্র্যের সঙ্গে লডাই করে বেঁচে থাকতে হয। অনেকেই পেটের দাযে বিডির দোকানে চাকরী নিযেছে। তাই বিড়ির কাজ করেই ভদ্র ভাবে বেঁচে থাকার দাবী অমন প্রবল হযে উঠেছে।

বিক্ষুব্ধ বিডি-কারিগরদের মিছিল ধীর গতিতে এস. ডি. ও. র, বাড়ীর দিকে চলেছে। শহরের লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে তাদের শোভাযাত্রা

ঢ্যাপার বিড়ির কারিগর, সেই শান্তস্বভাব নিবারণের রোগা দেহটা উত্তেজনায় থরথর কাঁপছে। মুখমিষ্টি দোকান থেকে কে একজন বলে উঠল, —বিড়িবাঁধারা একটা কাণ্ডই করল রে!

থানার কাছে কাঁঠাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রোষে ক্ষোভে ফুলছে বাঁদর-ব্র্যাণ্ডের মালিক দীননাথ চৌধুরী। চৌধুরী মশাইয়ের চোখে আগুন ঝরছে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল—নিশ্চয়ই, এদের পেছনে কোন পলিটি-—ক্যাল পার্টির উস্কানী আছে। নিবারণকে এমন শিক্ষা দেব!

—আমাদের দাবী—মানতে হবে,—বিড়ি বাঁধাদের সম্মিলিত চীৎকার এস. ডি ও. র, বাংলোর দেয়ালে আছড়ে পড়ল। বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এস. ডি. ও. মিঃ ব্যানার্জি। নির্বিকার চোখে প্রায় হাজার লোকের একটা জনতার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তাঁর কন্‌ফিডেন্সিয়াল ক্লার্ককে পাঠিয়ে দিলেন জনতার কাছে। কেরানীবাবু বললেন—আপনাদের ভেতরে যে কেউ একজন আমাব সঙ্গে আসুন। এস. ডি. ও. সাহেবকে বলবেন, কী আপনাদের দাবী, কেন আপনারা ধর্মঘট করেছেন।

—নিবারণদা আপনি যান,—জনতা চেঁচিয়ে উঠল।

—আপনার নাম নিবারণবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনিই কি বিড়ি ইউনিযনের সেক্রেটারী?

—হ্যাঁ।

—বেশ, আপনি আসুন।

এস. ডি. ও.-র বাংলোর ভেতরে যাওয়ার সময় নিবারণ হেঁকে জনতাকে বলল—তোমরা এই মাঠে শান্ত হযে বসে থাকো। কোন গোলমাল করো না, আমি না আসা পর্য্যন্ত।

—নিবারণ, তোকে যে নোটগুলো লিখে দিয়েছিলাম, সেটা তোর পকেটে আছে তো?—নরেন এগিয়ে এসে বলল।

—হ্যাঁ, আছে, তোর কোন চিন্তা নেই, প্রতিটি দাবীর কথা বলবো।

স্পেশাল মতির বিশু বলল, ধলদীঘি বা বটুনের মেলায় আমাদের মালিকরা যখন দোকান নিয়ে যায়, তখন বিড়ি-বাঁধাদেরও যেতে হয় সেখানে। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত বিড়ি বেঁধে মেলার চাহিদা মেটাতে হয়। এই বাড়তি পরিশ্রমের জন্যে মাইনে ছাড়া একটা পয়সা ঠেকায় না—

—এই পয়েণ্টটাও নোট করে দিয়েছি, নিবারণ—বলল নরেন।

—হ্যাঁ আমার মনে আছে,—উদ্দীপ্ত হয়ে বলল নিবারণ,—আচ্ছা আমি যাই ভাই।

প্ল্যাষ্টিকের নীল পর্দা ঘেরা কার্পেটমোড়া এস. ডি. ও. র স্পেশাল চেম্বারে ঢুকেই নিবারণের চোখদুটোর দৃষ্টি চমকে উঠল। স্পেশাল মতির মালিক বাস্তুত্যাগী ইউনিয়নের সম্পাদক কামিনী সরকার এস. ডি. ও. র সম্মুখের চেয়ারে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। মিঃ ব্যানার্জী বললেন—আসুন, আপনিই বিড়ি ইউনিয়নের সম্পাদক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনাদের মুখপাত্র শুনেছিলাম মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ধীরেন জোয়ারদার?

—তিনি আমাদের ইউনিয়নের ফাউণ্ডার। কিন্তু ধীবেনদার সঙ্গে এ ধর্মঘটের কোন যোগ নেই। তিনি ত আমাদের এই আন্দোলন সমর্থন করেন নি!

—তাহলে আপনিই রিং লীডার?

—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বলুন কি কি আপনাদের দাবী? কেন বিড়ির দোকান বন্ধ রেখে শহরের বিড়ি পিপাসুদের মুস্কিলে ফেলেছেন!

শব্দ করে চেয়ার টেনে বসল নিবারণ। মৃদু হেসে বলল—বিড়িখোররা মাত্র একদিন অসুবিধা ভোগ করছে। আর আমরা যে বছরের পর বছর কষ্ট পাচ্ছি, আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে কাজ করছি! সেটাও ভেবে দেখবেন স্যার।

—বলুন, এক দুই করে আপনাদের 'গ্রিভেন্স'। মালিকদের নেতৃস্থানীয় কামিনী বাবুএখানে আছেন। সম্ভব হলে মিটমাট করে দেব।

শান্ত গলায় নিবারণ বলল,—প্রথমতঃ আমাদের মাইনে 'ডেলী' দিতে হবে। আমরা হাজারে সওয়া দুই টাকার কমে কাজ করবো না।

—দৈনিক সোয়াদুই টাকা করে দিতে হলে, মাসিক মাইনে হয় প্রায় আটষট্টি টাকা স্যার,—বলল কামিনী সরকার—এক একটা বিড়িবাঁধা আবার দিনে হাজার বিড়ির বেশীও তৈরী করতে পারে। বাংলাদেশের কোথাও কোন দোকানের মালিক একটা কারিগরকে এত দিতে পারে না। সম্পূর্ণ এ্যাবসার্ড !

—থামুন তো কামিনীবাবু—হাতের ইসারায় কামিনীকে কথা বলতে নিষেধ করে মিঃ ব্যানার্জী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন,—কিন্তু নিবারণবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি—

—বলুন।

—এই রামনগর তথা এই বর্ডার এরিয়ার বিড়িবাঁধাদের সম্বন্ধে জনমত খুব খারাপ। হিলি, কালিয়াগঞ্জ ও চাঁদগঞ্জের বিড়িবাঁধারা বেশীর ভাগই পাকিস্তানের বর্ডারে স্মাগলিং করে। সারাদিন দোকানে বসে বিড়ি বাঁধে আর রাত হলেই চিনি, বিড়ির পাতা, মশলা ওপারে চোলাই করে। হিলিতে অনেক বিড়ির দোকান 'সার্চ' করে আমি সিঙ্গার মেশিনের পার্টস, কয়লা, চিনি পেয়েছি। রামনগর মহকুমায় তো যারা চোরাই মালের চোলাইদার, তারা প্রায় সবাই আপনার সহকর্মী বিড়িবাঁধা।

—আপনি যখন ঠিক জানেন বিড়িবাঁধা মাত্রেই স্মাগলার, তাহলে তাদের গ্রেপ্তার করছেন না কেন ?

—হিলিতে যাদের ধরেছি, তাদের সবাইকেই হাজতে পাঠিয়েছি।

—চোরাই মাল চোলাই করলে দৈনিক প্রায় এক টাকা থেকে দুটাকা আড়াই টাকা পাওয়া যায়, স্যার। এখানে একটু বেশী মজুরী পেলে এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অসৎ পথে উপার্জনের চেষ্টা কোনো বিড়ি-বাঁধাই করতো না। আমরা সৎভাবে আর দশটা ভদ্রলোকের মতই বাঁচতে চাই স্যার। একটা মাটিকাটা মজুরও দিনে আড়াই টাকা পায়। আমরা তার চেয়ে বেশী ত দাবী করছি না।

—দ্বিতীয় দাবী কি ?

—দ্বিতীয়তঃ কোন দাবী নয়। আমাদের এই মাইনে বাড়ানোর সমর্থনে কতকগুলো যুক্তি আছে। বিড়ির কেঁদপাতা কলকাতার মহাজনদের কাছে আসে রায়পুর থেকে ডাল্টনগঞ্জ থেকে—নেপাল আর গুজরাট থেকে আসে বিড়ির মশলা। কলকাতার মহাজনরা চড়া দরে লাভ রেখে বিভিন্ন জেলায় বিড়ির মালিকদের মাল পাঠায়। মালিক বিড়িবাঁধাদের বারো ঘণ্টা খাটিয়ে ঐ বিড়ির দোকান থেকে মাসে প্রায় তিনশো টাকার কাছাকাছি লাভ করে। বিড়ির পাতার মহাজনেরা 'প্রফিট' করে। মালিকেরাও বেশ কিছু উপার্জন করে। আর সেই বিড়ির পাতা কেটে যারা বিড়ি বাঁধে, তাদেরই গায়ের রক্তজল-করা পরিশ্রমের কোন মূল্য নেই ? এইজন্যেই আমরা হাজারে সওয়া দুই টাকা—

—মিথ্যে কথা,—ক্ষিপ্ত জন্তর মত গোঁ গোঁ করে উঠল কামিনী সরকার, —তিনশো টাকার কাছাকাছি লাভ হয় না। আর লাভ হলেই বা, এষ্ট্যাব্লিশ-মেণ্ট খরচ নেই ? ঘরভাড়া আছে, আলোর জন্য কেরোসিনের খরচ আছে—

—খেরবাঁধা লাল খাতায় দোকানের হিসেব তো আমরাই রাখি কামিনীবাবু।—বলল নিবারণ।

—বিড়ির পাতা আর বিড়ির মশলার দাম দিতে হয় না ? এক বস্তা পাতার দাম বিয়াল্লিশ টাকা। তার ওপরে সেণ্ট্রাল এক্সাইজের ডিউটি দিতে হয় একশো ষাট টাকা। আসছে বছর থেকে এক পাউণ্ড বিড়ির মশলার ওপরে আরও কুড়ি নয়াপয়সা ডিউটি নেবে। আমাদের একেবারে কোমর ভেঙ্গে দেবে—

—তবুও তিনশো টাকা লাভ হয় কামিনীবাবু। চ্যাপার বিড়ির মালিক রমেশবাবু তো গত মাসে প্রায় পাঁচশো টাকা লাভ করেছেন—

—নিবারণবাবু, আপনাদের দাবীগুলো খুব যুক্তিসঙ্গত,—বললেন এস. ডি, ও. মিঃ ব্যানার্জী—আপনাদের হাজারে সওয়া দুই টাকা পাওয়া উচিত—

—কিন্তু স্যার আমরা যে পথের ভিখারী হয়ে যাবো ?—স্তিমিত গলায় বলল কামিনী সরকার।

বাস্তুত্যাগী ইউনিয়নের সম্পাদক সরকার মশায়ের তিন আঙুলে তিনটে আংটির দিকে তাকিয়ে নিবারণ মৃদু গলায় বলল—চার বছর বসে খেলেও আপনি পথের ভিখারী হবেন না সরকার মশায়।

—কেন, আমার কি জমিদারী আছে ?

—জমিদারী নেই। কিন্তু বেলতলীর মাঠে নবপল্লী কলোনীতে পাকা বাড়ী ত করেছেন।

—স্টপ! স্টপ!—নীরস গলায় বললেন মিঃ ব্যানার্জী—বড্ড বেশী পারসোন্যাল এ্যাটাক করে কথা বলছেন, নিবারণবাবু। আপনার আর কিছু বলবার আছে ?

—হ্যাঁ স্যার। আমরা সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত দোকানে পরিশ্রম করি। অবশ্য দুপুরে এক ঘণ্টা খাওয়া আর বিশ্রামের জন্যে ছুটি পাই। কিন্তু সকালে কি বিকেলে দোকানের পয়সা থেকে এক কাপ চা খেলে মালিকেরা চটাচটি করে, অপমান করে।

—বাজে কথা।

—আঃ সরকার মশায় আপনি থামুন তো ?

তবুও কামিনী সরকার বলল—বিক্রী তো আমার অনেক, কিন্তু কারিগর বিশু সব লেখেই না।

—গো অন্ নিবারণবাবু।

—আমরা সকালে এবং সন্ধ্যায় টিফিন চাই, অন্ততঃ এক কাপ চা। আর আমার শেষ কথা হচ্ছে, বিজয়া দশমীর মেলায় কি বটুনের চোদ্দহাত কালী পূজার মেলায় বা শহরে কোন সভা-সমিতি হলে বিড়ির বিক্রী ডবল হয়ে যায়। তখন প্রয়োজন হলে আমরা রাত দুটো পর্য্যন্ত বিড়ি বাঁধি। এই বাড়তি পরিশ্রমের জন্যে আমরা মজুরী চাই।

—খুব রিজনেব্ল কথা! কামিনীবাবু, এর বিরুদ্ধে বলবার কিছু

নেই। বিড়ি-বাঁধারা গরীব। ওরা আপনারই ঘরের সম্পদ বাড়াচ্ছে। আপনারা বসে বসে ওদের পরিশ্রমের মুনাফা ভোগ করছেন—গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ ব্যানার্জী—ওদের ভালবাসবেন। ওদের দুঃখে বুক দিয়ে পড়বেন। সুখে দুঃখে আপন জনের মত বাস করবেন।—তরুণ, আদর্শবাদী এস. ডি. ও. ঘরের দেয়ালে টাঙানো গান্ধীজীর সহাস্য প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে আবার বললেন,—আমি অনেক সময় ভাবি, কত মহৎ আর কত সুন্দর সব আদর্শ রয়েছে আমাদের সামনে। তবুও আমরা পরস্পরকে হিংসে করি, ক্ষতি করি, দুঃখ দিই, কেন? কি কারণে আমাদের জীবনে এত পাপ, এত পঙ্কিলতা জানেন নিবারণবাবু?

—আমরা সবাই খারাপ স্যার—বলল নিবারণ।

কামিনী সরকার বিচিত্র দৃষ্টিতে মিঃ ব্যানার্জীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মিঃ ব্যানার্জী বললেন—শুধু খারাপ নই। আমরা সবাই প্রচণ্ড লোভী। অর্থের লোভ, পদমর্য্যাদার লোভ পাগলা কুকুরের মত আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সারাক্ষণ। লোভ থেকেই আসে স্বার্থ-চিন্তা—

—স্যার, আপনি কি ওদের সব দাবীগুলোই ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিচ্ছেন? ভীত গলায় বলল কামিনী।

—হ্যাঁ, আমি ওদের কোন দাবীকেই ত অযৌক্তিক মনে করি না কামিনীবাবু। আপনারা যদি ওদের দাবীগুলো মেনে না নেন, তাহলে আমি ডি. এম-কে খবর দেব। তিনি এসে যা ভাল বোঝেন, করবেন।

কামিনীর ছোট ছোট চোখ দুটো সাপের জিভের মত চিক চিক করে উঠল।

মিঃ ব্যানার্জী আবার বললেন—দোকানে দুটো কি একটা কারিগরকে সকালে বিকেলে দু কাপ করে চা, হাজারে সওয়া দুই টাকা মজুরী আপনাদের পক্ষে কি এমন বেশী, কামিনীবাবু?

—আপনি স্যার সদাশিব মানুষ—চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কামিনী—ওরা যা বলল সবই মেনে নিলেন। আপনি তো জানেন না, ওরা এক-একজন কত বড় বেইমান!

—কি রকম ?—উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল নিবারণ।

কামিনী বলল—এক একটা কেঁদপাতায় প্রায় চারটি করে বিড়ি হয়। নিবারণের মত দু'একজন ছাড়া অনেক কারিগরই দোকানের বিড়ির পাতা থেকে কিছু কিছু পাতা সরিয়ে রাখে, বিড়ির মশলা বাইরে বিক্রী করে—

—এসব কথার কোন ভিত্তি নেই—বললেন মিঃ ব্যানার্জী—কামিনীবাবু আর ঝামেলা না করে, আপোষ করে নিন।

—না স্যার, আমরা মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের মিটিংএ ঠিক করেছি ওদের মাইনে একপয়সা বাড়াবো না। হাজারে পাঁচ সিকেই দেব—

—তাহলে কিন্তু আমরা বিড়ির দোকান খুলবো না স্যার।—জ্বলে উঠল নিবারণ।

কামিনী বলল—স্যার, আসছে কাল রামনগরের অনেকগুলো বিড়ির দোকানের জন্য বিড়ির পাতার চালান আসবে। ওরা দোকান বন্ধ করে রাখবে। বিড়ির পাতার বস্তা যদি দোকানে রাখতে না পারি—তাহলে আমাদের 'ডেমারেজ' দিতে হবে।

—না, দোকান আপনার। আপনি এখুনি খুলতে পারেন। ওদের বাধা দেবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার নেই।

—তাহলে আমরা ওদের ছাঁটাই করে কালিয়াগঞ্জ থেকে নতুন কারিগর নিয়ে এসে দোকান খুলবো।

—যা খুসী করুন। আমি সদরে ডি এম.-কে রেডিওগ্রাম করে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এখন যেতে পারেন।—বিরক্ত হয়ে বললেন মিঃ ব্যানার্জী।

একটা হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত কামিনী নিবারণের দিকে তাকাল। নিবারণ এস. ডি. ও.-কে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

নিবারণকে দেখেই অপেক্ষমান বিড়ি-বাঁধারা চেঁচিয়ে উঠল—নিবারণদা বেরিয়েছে !

—কিছুই হলো না, নিবারণদা, না ?

—আমাদের সওয়া দুই টাকা করে মাইনে দেবে ত ?

সহস্র কণ্ঠের হাজারো উৎসুক প্রশ্ন নিবারণের কানের পর্দায় চাবুকের মত আঘাত করল। শান্ত গলায় সে বলল—আমাদের আরও শক্ত লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে ভাই। কামিনী সরকার অর্থাৎ মালিকেরা আমাদের কোন দাবীই মানল না। বিড়ির পাতার নতুন চালান আসছে কাল। ওরা দোকান খুলবে। নতুন কারিগর নিয়ে এসে দোকান চালাবে। আর আমাদের—

—ছাঁটাই! ছাঁটাই করে দেবে আমাদের?—হু হু একটা দীর্ঘশ্বাসের ঝড যেন বয়ে গেল বিড়ি-বাঁধাদের জমাট ভীড়ের চারিদিকে। তাদের জীর্ণ বুক-গুলো আশঙ্কায় দুমড়ে উঠল। কিন্তু তবুও তাদের চোখে ঝিকিয়ে উঠল আগুন। তারা দৃঢ় গলায় কঠিন শপথ উচ্চারণ করল—দোকান খুলতে গেলে আমরা বাধা দেব। দোকানের সামনে না খেয়ে হত্যা দেব—

—অধৈর্য্য হয়ো না ভাই। শান্তভাবে আমাদের সব করতে হবে। কোন উচ্ছৃঙ্খলতা করো না—নিবারণ বলল—আমাদের দাবী ওদের মেনে নিতেই হবে। দেখি ডি. এম. এসে কি ব্যবস্থা করেন!

—তাহলে এখন আমরা কি করবো?

—বাড়ীতে যে সব বাড়ন্ত। চাল নেই, ডাল নেই, দুপয়সার মুড়ি পর্যন্ত কেনার উপায় নেই!

নিবারণ পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। খাদিমপুরের মোহিনী বিড়ির কারিগর শ্রীকণ্ঠ বলল—একবার ধীরেনবাবুকে বললে হয় না? তিনিই তো আমাদের ইউনিয়নের জন্ম দিয়েছিলেন।

—সেই বাঁদর-ব্র্যাণ্ডের কারখানায় আমাদের প্রথম মিটিংএর পর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

—বড় মানী লোক হয়ে গেছে কিনা। তাই আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ঘেন্না করে!

বাস্তুত্যাগী দোকানদার যারা এসেছিল তারা বলল—ধর্মঘট যে কয়দিন চলে, চালাও। আমরা যতটুকু পারি সাহায্য করবো।

—ধীরেনদা একেবারে বদলে গেছে।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকার চেপে নেমে এল নরেনের চোখে মুখে। ম্লান নির্জীব গলায় বলল—অনেক আশা করে আমাদের ভেতর থেকে তাকে মিউনিসিপ্যালিটিতে পাঠিয়েছিলাম।

—দরকার নেই কারো সাহায্যের। আমরা নিজেরাই হয় লড়বো, না হয় না খেয়ে মরে যাবো—উত্তেজিত হয়ে বলল নিবারণ। দূরে এস. ডি. ও.র বাংলোর মাথার ওপরে পশ্চিমের আকাশে রক্ত সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। চারিদিকে ধূসর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দিগন্তের কোলে শেষ সূর্য্যের চিতা জ্বলছে।

॥ পঁচিশ ॥

ওদিকে সেদিন দুপুরে পদ্ম ও লালু গঙ্গারামপুরে নামল। বাস-স্ট্যাণ্ডের সম্মুখেই ছোট ছোট টিনের চালাঘরে কয়েকটা মিষ্টির দোকান, পানের দোকান। তারপরেই অর্জুন ঠাকুরের হিন্দু হোটেলের সামনে দিয়ে সরু লাল মাটির রাস্তাটা পুলিশ আউট-পোষ্ট বাঁয়ে রেখে দেড় মাইল দূরে ধলদীঘিতে চলে গিয়েছে। রাস্তার দু'ধারে বাস্তুত্যাগীদের বাড়ী। ধলদীঘিতে রিফিউজি ক্যাম্পের পাশেই সরু সরু পুরানো কালের ইটে পরিকীর্ণ বিশাল মাঠে টকির তাঁবু পড়েছে। দূরে আকাশের গায়ে আঁকা বানরাজার রাজপ্রাসাদের বিপুল-ব্যাপ্ত ধ্বংসস্তূপ। স্বাধীন হিন্দু-রাজত্বের অবলুপ্ত কীর্ত্তির মহাশ্মশান এই গঙ্গারামপুর, ধলদীঘি ও বানগড় অঞ্চল। চারিদিকে উঁচু মাটির ঢিপি ও বাবলা গাছের নীচে নীচে আজও ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই হিন্দু-রাজত্বের ওপরে বুনো হাতীর আক্রোশ নিয়ে সুলতান গিয়াসুদ্দিনের তলোয়ারের আঘাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গঙ্গারামপুরের এক মাইল দক্ষিণে দেবকোট (বর্ত্তমান নাম দমদমা) থেকে সুলতান গিয়াসুদ্দিন নিজের নামে মুদ্রা প্রচার করেছিলেন। বাঙলার প্রথম টাকশাল এই দেবকোটে। আজও দেখা যায়, পুরানো নিমগাছের ছায়ার নীচে বাংলার প্রথম মসজিদের

ধ্বংসাবশেষ তাকিয়ে আছে প্রেত-পাণ্ডুর দৃষ্টিতে। এই ধলদীঘির যে প্রান্তর প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতুহল, সেই প্রান্তরেই নতুন একটা ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের ঢেউ ভেঙ্গে পড়েছে। সুদূর বরেন্দ্রভূমির এই মাঠে ঘর বেঁধেছে বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নোয়াখালীর অজস্র মানুষ। মৃত ইতিহাসের চিহ্ন বুকে নিয়ে পড়ে থাকা মৌন মূক প্রান্তর নতুন জীবনের কলরবে মুখর এক জনপদ হয়ে উঠেছে। সরকার রিফিউজি ক্যাম্পও বসিয়েছেন এখানে। ক্যাম্পের চারিদিকে মুদীর দোকান, চায়ের দোকান, ক্যাম্পের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের বাড়ী আর বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের লম্বা টিনের শেড ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে। কোন দিকে লক্ষ্য নেই পদ্মর। তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা অস্বস্তিতে ছিঁড়ে যাচ্ছে তার বুকটা। রোগের যন্ত্রণায় কাতর ন্যাদোনের মুখখানা তার বুকে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। লালুকে বলল—চল লালু—পা চালিয়ে চল। টকিব তাঁবুটা আর কতদূরে জিজ্ঞাসা কর।

—ঐ তো পদ্মদি, ধলদীঘির দক্ষিণ দিকে মাঠ জুড়ে যে তাঁবুটা, আমাব মনে হয় ওইটাই বোধহয় টকির তাঁবু।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখল, তাঁবুর সম্মুখে উঁচু একটা বাঁশেব গাযে পোষ্টার ঝুলছে। শালোয়ার পরা, আর হাওয়ায় রঙিন সিল্কের ওডনার পাল তুলে সাইকেল ছুটিয়ে যাওয়া একটা সুন্দরী তরুণী মেয়ের ছবি আঁকা আছে পোষ্টারে। নীচে মোটা লাল রঙের হরফে লেখা আছে—"সাইকেলওযালী"। ধলদীঘি, বানগড় বোল্লার দু'একজন স্থানীয লোক ছবিটার নীচে দাঁড়িয়ে বলছে—আজ আতোত ছায়াবাজি দেখমেন বাঁহে ?

—হয়, দেখবা তো হাউস করোছে ; কিন্তক টিকিসে যবা চড়া দর।

—এটাই কি টকির তাঁবু ?—তাদের জিজ্ঞাসা করল লালু।

—হয়, বাবু ইটাই তো ছায়াবাজীর তাঁবু। তোমরা কি শহরোত থে হামঘরে গাঁওত টুকি দেখবা আসলেন ?

—না। আমরা টকি দেখতে আসি নি—বিরক্ত হয়ে পদ্ম বলল—টকির 'গেটকিপার' কিম্বা মালিকের বাড়ী কোথায় বলতে পারো ?

—কালদীঘির ছামুতে যি বাঁশের ঘর দেখা যাচ্ছে—ঐগুলাই তো ছাযাবাজির মালিকদের ঘর।

পদ্ম আর লালু দ্রুতপায়ে হাঁটতে সুরু করল কালদীঘির দিকে। একটু যেতেই তাদের গতিরোধ করে দাঁড়াল হেলথ ডিপার্টমেণ্টের দু' তিনজন কর্মচারী—কোথায় যাবেন আপনারা?

—টকির গেটকিপারের বাড়ী।

—কলেরার ইনজেকশান নিয়েছেন?

একজন রেক্টিফায়েড স্পিরিটের শিশি বের করে এগিয়ে এল। বলল—তার কলেরা হয়েছে। ওখানে যেতে হলে ইনজেকশান নিযে যেতে হবে। তার অবস্থা ভাল নয়—

থর থর করে কেঁপে উঠল পদ্ম। তীব্র চীৎকারে চারিদিকে কাঁপিয়ে বলল —বেঁচে আছে তো? আমি তার দিদি। আমাকে যেতে দিন—উদ্‌ভ্রান্তের মত স্যানিটারী ইনস্পেক্টরকে ঠেলে ফেলে দিযে পদ্ম ছুটে একটা লম্বা টিনের চালাঘরে এসে দাঁড়াল। ঘরের সম্মুখে একফালি সরু রাস্তার ওপরে গোবরের টিপি, আমের আঁটি—কাঁঠালের ভূঁতি ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ, মাছি ভন ভন করছে। বাতাসে ভাসছে কেমন একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। লম্বা চালাঘরের জানালায জানালায় উৎসুক কৌতূহলী কতকগুলো মুখ উঁকি দিল।

—টকির গেটকিপার স্যাদোনের ঘর কোনটা? যার কলেরা হয়েছে!

ভযের ছাযা পড়ল সকলের মুখে। বলল—সেখানে আমরা কেউ যাই না। আপনি যাবেন?

—আমি যে তার দিদি—

—লম্বা এই চালাঘরের শেষ খোপটাই গেটকিপারের। গেটকিপারের ছেলেমানুষ বৌটা সকাল থেকে কাঁদছে!

শেষ খোপটার সামনে দাঁড়াতেই পদ্মর বুকের ভেতরটা শির শির করে উঠল। এত নিঃশব্দ কেন? হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে। ঘরের চৌকাঠের সামনে আসতেই, একটা ঢেউয়ের মত ঝাঁপিযে পুটি তার বুকের ওপরে

পড়ল। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল—দিদি তুমি এসেছো? দেখ, দেখ তোমার ভাইয়ের কি অবস্থা! হ্যাদোনের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল পদ্ম। বাঁশের মাচার ওপরে একটা ছেঁড়া ময়লা বিছানায় একটা কঙ্কালমূর্ত্তি যেন অবলীন হয়ে আছে। ঘরের মেঝের জায়গায় জায়গায় বমির দাগ। দু' একটা আরশোলা লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে বমি চেটে চেটে খাচ্ছে।

পদ্ম তার দিকে ছুটে যেতেই, খপ করে পুঁটি তার হাত ধরে বলল—ওঁকে ছুয়ো না দিদি! কলেরার কাপড়চোপড় তুমি ঘেঁটো না। আমিই ধোয়ামোছা ঘাঁটাঘাঁটি করছি আর বলছি, ভগবান আমাকে নাও। ওকে বাঁচিয়ে তোলো।

—মেয়েমানুষের প্রাণ কচ্ছপের মত। অত সহজেই কি আমরা মরি—মাটির ওপরে থপ করে বসে পড়ে শিশুর মত অঝোরে কেঁদে ফেলল পদ্ম।

বিছানার ওপর থেকে চিঁ চিঁ করে হ্যাদোন বলল—কাঁদিস না দিদি। তোকে যে দেখতে পেলাম, এই আমার ভাগ্য—টলতে টলতে সে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

কিন্তু পদ্ম তাকে শুইয়ে দিয়ে বলল—ডাক্তার কি বলেছে রে পুঁটি?

পুঁটি কোন কথা বলল না। ওর অসহায় চোখে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে পদ্ম দেখল, ওদের ভালবাসার সংসারের আশ্চর্য দৈন্য-দশা! হ্যাদোনের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সেই পুঁটির পরনে জীর্ণ, মলিন শাড়ি। তার কান্না-থরোথরো মুখের রেখায় রেখায় অনাহার, অর্দ্ধাহার আর দুশ্চিন্তার চিহ্ন। অভিমান করে ওরা জীবনটাকে দুঃখকষ্টের ভেতরে আছড়ে ফেলেছিল, তাই জীবন তার প্রতিশোধ নিয়েছে মর্মে মর্মে। নিস্প্রাণ একটা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল পদ্ম।

তীব্র যন্ত্রণায় গা মুচড়ে উঠে বসল হ্যাদোন। ক্ষীণ অস্ফুট গলায় বলল, আমি বমি করবো—

ব্যস্ত ভাবে পুঁটি একটা মাটির ডাবর নিয়ে এল। হড়হড়িয়ে বমি করেই

হাঁফাতে লাগল হ্যাদোন। সরু হাড় বের করা হাতটা শূন্যে আন্দোলিত করে ইশারায় সে ডাকল পদ্মকে—শোন দিদি—

পদ্ম এগিয়ে এল। হ্যাদোনের গর্তে ঢোকা চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে। বলল—দিদি, তোর ওপরে রাগ করে চলে এসেছিলাম। তুই আমাকে ক্ষমা করিস। তুই ক্ষমা না করলে মরেও শান্তি পাবো না।—অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে হাঁফাতে লাগল হ্যাদোন।

তার শীর্ণ হাড় জিরজিরে বুকটা ডলে দিতে দিতে পদ্ম বলল—তোকে আমি বাঁচিয়ে তুলবোই হ্যাদোন। লালুকে পাঠিয়ে রামনগর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসবো—

আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে এল চারদিক। আকাশে একটার পর একটা বিবর্ণ তারা ফুটল। দুপুরে লালু গিয়েছে রামনগরের বিখ্যাত ডাক্তার সুরেনবাবুকে ডাকতে। এদিকে হ্যাদোনের চোখের দৃষ্টি কেমন হয়ে আসছে। অদূরে কেরাসিনের কুপির ধোঁয়া ওঠা শিখাটার দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে আছে পুঁটি। একটা কঠিন আঘাতের বেদনাকে সহ্য করার জন্য যেন শক্তি সঞ্চয় করছে।

পরদিন লালু সুরেনবাবুকে নিয়ে এসে পড়ল। সুরেনবাবু বলল—আরো আগে ডাকো নি কেন পদ্ম!

পর পর দুটো স্যালাইন ইনজেকশান দিলেন হ্যাদোনকে। বললেন—হার্ট খুব দুর্বল। যদি আজকের রাতটা পার হয়ে যায়, তাহলে আর কোন চিন্তা নেই—

—আপনি আজকের রাতটা থেকে যান না ডাক্তারবাবু?—পদ্ম বলল।

—আমার যে তিন চারটে জরুরী কেস আছে পদ্ম। আমাকে যেতেই হবে—তুমি দু ঘণ্টা পর পর গ্লুকোজের সরবৎ খাওয়াবে, ডাবের জল খাওয়াবে। কোন চিন্তা করো না—

চিকিৎসকের অভ্যস্ত নিয়মে বাঁধাধরা ছকে কথাগুলো বলে সুরেনবাবু চলে গেলেন। সারারাত ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ালো পদ্ম। হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে সেবা করল। বুকে পিঠে করে ছয় মাস বয়সের শিশু হ্যাদোনকে

সে মানুষ করেছে। সংসারে ও-ছাড়া তার আপনার বলতে কেউ নেই। তাই হয়তো, বিশাল আকাশের অলক্ষ্য কোণে বসে যে ক্ষ্যাপাটে বিধাতা এই সংসারের স্নেহ-প্রীতি, দয়া-মমতা, হাব-ভাবে ঠাসা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মজা দেখেন, বুঝি বা তাঁর মনে দয়া হলো। শেষ রাতের দিকে হ্যাদোনের চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল। পুঁটির রাতজাগা চোখের কোটরে হাসির ঝিকিমিকি ফুটল। কেটে গেল আরো একটা দিন।

পদ্ম বলল—তুই আর পুঁটি চল দুপুরের মোটরে রামনগরে। এখানে আর নয়।

হ্যাদোনের চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল। বলল—সেই লোকটা কি এখনও আছে না কি রে?

—কোন লোকটা?—পদ্মর বুকের রক্ত চলকে উঠল। মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা শীতল জলের স্পর্শ হু হু করে বয়ে চলল।

—আরে, ঐ যে ইয়ে তোর ধীরেন্দ্রলাল! যাকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বানিয়েছিস।

—না, উনি অন্য বাড়ীতে থাকেন।

—তোর বাড়ীতে রোজ যাওয়া আসা করেন?

—হ্যাঁ রোজই আসেন।

—তোর সাথে তাহলে এখনও সম্বন্ধ আছে?

—কেন তিনি কি করেছেন?—বিরক্তিতে হিসিয়ে উঠল পদ্ম।

ছুটে এল পুঁটি। বলল হ্যাদোনকে—ওগো একটু কম কথা বলো। জোরে কথা বলা ডাক্তারের বারণ।

হ্যাদোন দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বলল—কি করেছেন তা তুই বুঝতে পারছিস না? তুই ওকে থাকতে জায়গা দিয়েছিলি, তোরই জন্যে ও চেয়ারম্যান হয়েছে। কিন্তু তোকে ও ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে একদিন চলে যাবে।—হ্যাদোনের ক্ষীণ দুর্বল দেহটা একটা উদ্ধত তর্জনীর মত শাসাতে লাগল তাকে। কোটরের ভেতর থেকে চোখদুটো যেন জ্বলছে। সে ভুলে গিয়েছে,

ঠিক এই মুহূর্তে তার মায়ের মত এই দিদিই তাকে মানুষ করেছে—আজ তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচিয়েছে।

—অত 'এক্সাইটেড' হস্ না ন্যাদোন—বলল লালু।

—তুই যা ভাবিস, সে সব কিছু নয় রে ন্যাদোন।—শান্ত গলায় পদ্ম বলল।

—কিছু নয়, তবুও লোকে তোকে খারাপ বলবে। বদনাম হবে এমন কাজ তুই করবি কেন?—হঠাৎ কোঁৎ করে একটা শব্দ হলো। বাদবাকী বক্তব্যটা তার গলার ভেতরে আটকে গেল। কে যেন সাঁড়াশীর মত শক্ত হাতে তার গলাটা টিপে ধরেছে। চোখছুটো যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। সে কাটা গাছের মত এলিয়ে পড়ল বাঁশের মাচার বিছানার ওপরে।

ডুকরে কেঁদে উঠল পুঁটি—কি হলো দিদি?

সে আছড়ে ন্যাদোনের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল পদ্ম। লালুর চোখে শূন্যদৃষ্টি। ন্যাদোন যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলল—দিদি আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে। পুঁটি তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ন্যাদোনের কপালে হাত রাখল পদ্ম।

পদ্মের হাতটা তার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ক্ষীণ গলায় যেন বহুদূর থেকে সে বলল—দিদি, আমি আর বাঁচবো না। কথা দে, তুই বিয়ে করবি।

—বিয়ে! এই বয়সে বিয়ে করে কি হবে!—কান্না-থমথমে গলায় বলল পদ্ম। তার দু-চোখ বেয়ে জল ঝরছে।

আবার বলল ন্যাদোন—ধীরেনদাকে তুই ভালবাসিস দিদি। ওকেই তুই বিয়ে করিস। তোর মন খুব নরম রে— বিয়ে না করে থাকলে তুই—জোরে পদ্মের হাতছুটো আঁকড়ে ধরল।

মৃদু গলায় পদ্ম বলল—যদি কখনো বিয়ে করি তাহলে ধীরেনবাবুকেই বিয়ে করবো, ন্যাদোন।—কিন্তু পদ্মের কথা আর শেষ হলো না। ন্যাদোনের চোখের দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠল। বিড় বিড় করে বলল,—আমার বুকটা জলে

যাচ্ছে দিদি—দিদি—তুই—তার মাথাটা ডানদিকে কাত হয়ে ঝুলে পড়ল। তার দেহে থেমে গেল প্রাণের ধুকধুকি।

রিফিউজি ক্যাম্পের কলরবকে এক নিমেষে স্তব্ধ করে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল পুঁটি—তুমি আমার সর্বনাশ করে গেলে গো!

টকির মালিক গণেশ দত্ত এল। এল ক্যাম্পের ডাক্তার তরুণবাবু। তিনি বললেন—হার্ট ফেল!

পদ্মের স্নায়ুগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। নিঃশেষ হয়ে গেছে চীৎকার করে কাঁদবার শক্তি। চোখের পরিখায় যেন দাবদাহ জ্বলছে দাউ দাউ করে। সারাটা জীবন তাকে যেন লেলিহান আগুন পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারছে। অস্থি-মেদ অঙ্গার করে দিচ্ছে। কে জানে এর শেষ কোথায়।

মেঘে ঢাকা সূর্য্যের বিষণ্ণ আলোয ভরা মধ্যাহ্ন যেন কালো মেঘের কান্না থমথমে মুখের মত। পুনর্ভবার তীরে শবদাহ করে শ্মশানবন্ধুদের দল ফিরে এল শ্মশান থেকে। গণেশ দত্ত এসে খুব দুঃখ প্রকাশ করে বিধবা পুঁটির হাতে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে গেল।

সংসারে একটিমাত্র রক্তের সম্বন্ধ, তার বড় আদরের ভাইকে পুনর্ভবার বিজন নদীর পাড়ে শ্মশানে আশস্যাওড়া আর শিমুল গাছের ছায়ায় ঘুম পাড়িয়ে পুঁটিকে নিয়ে মোটরে উঠল পদ্ম। তার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। কত কাঁদবে! কান্না, দুঃখের ক্ষতিপূরণ মাত্র। তার জন্মলগ্নে কী যে দুর্গ্রহের অভিশাপ ছিল। তার দুঃখের যে শেষ নেই। এত আঘাতেও মনটা অসাড় হয় না? পদ্ম বিস্মিত হয়। সেই বর্ষারাতের দুর্যোগে তার স্বামী তাকে চরম ঘৃণায় পরিত্যাগ করে মা-র কাছে রেখে চলে গেল। সেদিনও সে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। মা তাকে ছেড়ে যেদিন চলে গেল, সেদিনও উন্মাদিনীর মত শ্মশানে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল জ্বলন্ত চিতার ওপরে। আর এই হ্যাদোন! সংসারে তাকে ও সকলের বেশী ভালবাসতো, তার ওপরে অভিমান করে সে ধলদীঘিতে চলে এসেছিল। কষ্ট পেল তিলে তিলে সে। মৃত্যু তাকে গ্রাস করল। কার কাছে কি অভিযোগ করবে পদ্ম! কত

কাঁদবে ! মানুষ কাঁদে। কেঁদে বুকের ব্যথাকে হাল্কা করে। কিন্তু একটার পর একটা ক্ষয়-ক্ষতি আর আঘাতের বেদনা থরে থরে জমে আছে তার বুকে। এক-জন্মের কান্নায় সেই পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব হবে না। একটা ভারী নিঃশ্বাস তার বুকের পাঁজরকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে।

॥ ছাব্বিশ ॥

গুঁড়ি গুঁড়ি সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে চারিদিকে। বাঁদর-ব্র্যাণ্ড, চ্যাপার বিড়ির দোকানই শুধু নয়। শহরের প্রত্যেকটি বিড়ির দোকানের বন্ধ ঝাঁপের সম্মুখে পাতলা অন্ধকারে আরো একটু নিকষকালোর ইঙ্গিত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিড়ি-বাঁধারা। ওরা দোকান খুলতে দেবে না। ওদের উপোসী শুকনো মুখে আশ্চর্য দৃঢ়তার ছাপ। হঠাৎ রামনগর মোটর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর দিক থেকে একটা উত্তেজিত চীৎকার ভেসে এল— বিড়ির পাতা নিয়ে যেতে দেব না—

—এই রে বিড়ির পাতার চালান এসে পড়েছে !—বলল ভোঁদড়। শিবু বলল—নিশ্চয়ই টুলু আর সুদাস বাধা দিয়েছে।—মোটর-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটল ভোঁদড় আর শিবু।

কলকাতা থেকে কালিয়াগঞ্জ হয়ে এক ট্রাক বোঝাই বিড়ির পাতা এসেছে। দীননাথের কলেজে পড়া ছেলে হীরণ তাদের দোকানের বিড়ির বস্তাগুলোর 'ডেলিভারী' নিয়ে বাঁদর-ব্র্যাণ্ডের দোকানের দিকে আসছিল। তার হাত থেকে বিড়ির পাতা ছিনিয়ে নিয়েছে। লোক জমে গেল মোটর-ষ্ট্যাণ্ডে। হীরণ তার বাবাকে সব বৃত্তান্ত বলল। দীননাথ ছুটল থানায়।

শহরের আশপাশে বলদাবাড়ী, খাদিমপুরের বিড়ি-বাঁধাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে গিয়েছিল নিবারণ। সে এই খবর পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। অসহ্য বিরক্তিতে জ্বলে উঠে টুলুকে বলল—করেছিস কী ?

বিড়ির পাতা মালিক নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তুই আটকাতে গেলি কেন ? ছিঃ ছিঃ এত করে বললাম, কোন বে-আইনী কাজ করিস না !

—বিড়ির পাতা দোকানে নিয়ে গেলেই যে দোকান খুলতো নিবারণদা, আর আমাকে ছাঁটাই করে অন্য কারিগর নিয়ে আসতো।

—ছাঁটাই তো এখনও করেনি !

—হিলির একটা বিড়ি-বাঁধা ছেলেকে আমি মালিকের বাড়ীর আশপাশে যে ঘুরতে দেখেছি নিবারণদা।

—তুই বিড়ির পাতা কেড়ে নিতে গেলি কেন ? এখন পুলিশ 'কেস' হয়ে গেলে কি করবো !

বলতে বলতেই দীননাথের সঙ্গে রামনগর থানার ও. সি. এসে পড়লেন। তখনও টুলুর পায়ের কাছে বিড়ির পাতার দুটো বস্তা পড়ে আছে। ও. সি. চীৎকার করে বললেন—তোমরা কি কাউকেই শান্তিতে থাকতে দেবে না ? কেন, তুমি দীননাথবাবুর ছেলের হাত থেকে বিড়ির পাতার বস্তা কেড়ে নিয়েছো ?

নিবারণের ঠোঁটের রেখায় কতকগুলো কথা কেঁপে কেঁপে থেমে গেল। টুলু একটা কথা বলতে পারল না। টুলুকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে চলল পুলিশ। অন্যান্য বিড়ির মালিকের লোক নির্বিবাদে মাল নিয়ে দোকানের দিকে গেল। নিবারণ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল, সে যেন ধীরে ধীরে অতল একটা অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। নাঃ কোন আশাই নেই। দোকান ওরা খুলবে। আর অনিবার্য ভাবে প্রতিটি বিড়ি-বাঁধা ছাঁটাই হয়ে যাবে।

ধীরেন্দ্রলাল নিঃশব্দ পায়ে নিউ টাউনের বাস্তুত্যাগী নেতা কামিনী সরকারের বাড়ীর দিকে চলেছে। শহরে বিড়ি-কারিগরদের আন্দোলন চলছে। উত্তেজনার জোয়ার বয়ে চলেছে চারিদিকে। কোনদিকে তার খেয়াল নেই। লোক্যাল সেলফ গভর্ণমেণ্ট সেকসনের অডিটার এসেছেন। সর্বনাশের আশঙ্কা খাঁড়ার মত নাচছে তার মাথার ওপরে। শিবশম্ভু সরকারের পুকুরের পাড়ের ওপরে

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। রাশি রাশি নক্ষত্রের আলো আর অন্ধকার বুকে নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে পুকুরের জল। অজস্র তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে—ধীরেন্দ্রলালের মনে হল, সে যেন অনেক—অনেক কাল পরে মাথার ওপরে ঐ নীলাঞ্জন উদার আকাশটা দেখছে। চেয়ারম্যানের আসনে বসেই সে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। পদ্মর সরল স্নিগ্ধ চোখদুটো তার উত্তেজিত মনের ভেতরে ভেসে উঠল। কেমন করে সে পদ্মকে মুখ দেখাবে! হঠাৎ পদ্মর ওপরে তীব্র আক্রোশে তার মনটা জ্বলে উঠল। ওর ইস্পাতের মত কঠোর মন, ওর আদর্শবাদ, ওর নিষ্প্রাণ-স্তিমিত ভালবাসাই তো তাকে হাস্যে লাস্যে উজ্জীবন্ত নীরদার সর্বনাশা মোহের দুর্গন্ধময় অতল পাঁকের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। আজ সঙ্কোচের ভারে সে মাথা উঁচু করে চলতে পারে না। অথচ সেদিন যখন তার নিজের বলতে কিছু ছিল না, যখন সে ছিল সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও রিক্ত, সেদিন তার আদর্শ ছিল, ছিল সরল নির্ভীক একটি স্বচ্ছ মন। কিন্তু যখন তার দারিদ্র্য জীর্ণ জীবনে পদমর্য্যাদার গৌরব এল, এল অর্থ আর যশ, তখুনি তার পঁয়ত্রিশ বছরের ধু ধু রুক্ষ নীরস জীবনের দিকে দিকে যেন নিরুদ্ধ যৌবন বাসনা উতরোল হয়ে উঠল। নীরদা দেবীর সান্নিধ্যে এসে আর সব ভেসে গেল—তলিয়ে গেল তার নীতি, তার ধর্ম, তার সব সংযম। এককালের সেই নিষ্ঠাবান দেশ-কর্মীর বলিষ্ঠ বিবেক বোধ অভিভূত আচ্ছন্নতায় ছেয়ে গেল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার ঘুম আসে না। মনে হয়, যেন শ্বাসরোধী অন্ধকার ভরা একটি গভীর গহ্বরে ধীরে ধীরে সে নেমে যাচ্ছে। দুঃস্বপ্নে সে ককিয়ে চীৎকার করে ওঠে। হিংস্র থাবায় নিজের হাতে মাথার চুল ধরে উন্মাদের মত অন্ধকার ঘরে সে পায়চারী করে। শিবশম্ভু সরকারের পুকুরের সেই নির্জন পাড়ে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত সত্তা যেন ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইল।

—কামিনীবাবু আছেন?—বাস্তুত্যাগী ইউনিয়নের নেতা কামিনী সরকারের বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় ডাকল ধীরেন্দ্রলাল।

—কে? ভেতরে আসুন

কামিনীর বসবার ঘরে দাঁড়াতেই ধীরেন্দ্রলাল দেখল, একটা ফরাসের ওপরে লণ্ঠন জ্বলছে। কামিনী আর চ্যাপার বিড়ির মালিক রমেশ ঘোষ চাপা গলায় কী যেন আলাপ করছে। রক্তবর্ণ চোখে রমেশ, ধীরেন্দ্রলালের দিকে তাকাল। বলল—কী চ্যালাদের আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে মজা দেখতে এসেছেন ?

কাতর গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল—আপনাদের সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে। অত্যন্ত বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি।

—আমাদের সঙ্গে পরামর্শ! আপনি তো আমাদের মানুষ বলে গন্যই করতেন না!—তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল কামিনীর ঠোঁটে।

রমেশের কথা যেন শুনতে পেল না ধীরেন্দ্রলাল। দুচোখে কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কাঁপা গলায় সে বলল—কামিনীবাবু, আমাকে হাজার দেড়েক টাকা দিতে পারেন!

কামিনী সরকার চোখদুটো কুঞ্চিত করে বলল—কেন ?—কয়েক মুহূর্ত পরেই তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—বুঝতে পেরেছি। টাকা দিতে পারি, কিন্তু একটা কাজ করতে হবে!—বলেই চাপাগলায় কামিনী কতকগুলো ভয়ঙ্কর কথা বলল ধীরেন্দ্রলালের কানে কানে।

ভয়ের ছায়া পড়ল ধীরেন্দ্রলালের মুখে। বেদনায় করুণ হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। বলল—আমাকেই বলতে হবে!

—হ্যাঁ, আপনাকেই বলতে হবে! আপনার কথার দাম অনেক বেশী।

ধীরেন্দ্রলালের মনে হল তার শরীরটা যেন টলছে। নিবারণের সরল হাসি-হাসি মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কত শ্রদ্ধায় কত নিবিড় প্রীতিতে ওই নিবারণরাই তার জীবনকে কুসুমিত করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ওদেরই—

—কি ভাবছেন, পারবেন তো ? স্পষ্ট করে বলতে হবে কিন্তু!

ধীরেন্দ্রলালের চোখের কোণায় কোণায় জল চিক চিক করছে। কাঁপা গলায় বলল—হ্যাঁ পারবো, সরকার মশায়।

হঠাৎ ঝড়ের মত কামিনী সরকারের ছেলে নীরেন ঘরে এল। বলল, ডি. এম. এসেছেন। বিড়ি কারিগর আর মালিকদের ডাকিয়ে নিয়ে ধর্মঘটের কথা আলোচনা করছেন।

—ডি. এম. এসেছেন!—কামিনী চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল,—রমেশ তুমি চলে যাও, যা বলেছি, করবে।

রমেশ ঘোষ বেরিয়ে গেল।

কামিনী ধীরেন্দ্রলালকে বলল—ধীরেনবাবু, আপনার কোন চিন্তা নেই। শুধু আমার কথামত চলুন—

ওদিকে খাদিমপুরের রাসপূর্ণিমার মেলায় মহিলা সমিতির হাতের কাজের প্রদর্শনী শেষ করে নিউ টাউনের দিকে ফিরছে নীরদা দেবী আর উত্তর বঙ্গ মহিলা মণ্ডলের মার্কেটিং অফিসার অনিমেষ ব্যানার্জী। হাওয়ায় উড়ছে নীরদার রঙীন রেশমী শাড়ী। রাস্তার ধারের সারি সারি দোকানের আলো পিছলে পড়ছে অনিমেষের কড়া ইস্ত্রীর পাঞ্জাবীতে, আর 'হেক্সাগন' চশমার রোল্ডগোল্ডের ফ্রেম থেকে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল সেন্টের উগ্র গন্ধ। খুক খুক চাপা হাসির রোল পড়ে গেল, বাজারের দোকানীদের ভেতরে।

কে একজন বলে উঠলো—অল্পবয়সে বিধবা হলে যা হয়! চেয়ারম্যানকে ছেড়ে এখন জুটেছে ঐ লোকটার সঙ্গে!

দুপাশের আদিগন্তপ্রসার প্রান্তরের মাঝখানে নিউ টাউনের পীচবাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলেছে ওদের সাইকেল রিক্সাটা। দূরে ইসমাইলপুরের নিবিড় বাঁশবনের মাথায় সোনার থালার মত চাঁদের দিকে তাকিয়ে আচমকা অনিমেষ বলল—আমি কাল মালদহে চলে যাবো। এখানকার কাজ তো হয়ে গেল।

—ভুবলার মহিলা সমিতির মেয়েদের তৈরী বেতের ঝুড়ি, টেবিল ক্লথগুলোর কষ্ট অফ প্রোডাকশানস' তো ঠিক করে দিলেন না?

—ও আপনারাই করে নিতে পারবেন। র মেটিরিয়াল্‌সের দামের

ওপরে নিজেদের পরিশ্রমের জন্য কিছু মজুরী ধরে জিনিসটার 'সেলিং প্রাইস' ঠিক করে দেবেন।

—হঠাৎ মালদহে কেন?

—মালদহের ভবানীপুর দরিয়াপুর মহিলাসমিতিতে আমাদের সমিতির হেড অফিস থেকে লেখালিখি করে শাড়ীর পাড়ে নক্সা তোলার জন্যে ডবি ও জ্যাকার্ড নিয়ে এসেছি। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট থেকেই দিয়েছে। ওদের প্রোডাকশান কেমন হলো দেখতে হবে।

—সত্যি, সব জেলার মহিলাসমিতির ভেতরেই বেশ জাগরণ এসেছে, না?

—মহিলাসমিতির অধিকাংশ মেয়েই আপনার মত বাস্তুত্যাগী নীরদাদেবী। ঐ হাতের তৈরী জিনিষ বাজারে বিক্রী করেই তারা বাঁচবার চেষ্টা করছে। ওটা জাগরণ নয়। বাঁচার জন্য প্রতিটি মেয়ে উদয়াস্ত খাটছে। এটুকু বলতে পারেন—গভর্ণমেণ্ট সাহায্যও করছে প্রচুর।

—আমাদের রামনগর মহিলা সমিতিতে ঠকঠকি তাঁত দিযেছে সাতটা আর হাত-তাঁত দিযেছে কুড়িটা। সুতোও দিচ্ছে নামমাত্র মূল্যে।—সরকার আরও দেবে, নীরদা দেবী। আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা করছি অনেক দিন আগে থেকে। কিন্তু কুটিরশিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি না হলে জীবনেব মান বৃদ্ধি হতে পারে না।—গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ল অনিমেষের মুখে। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল—রামনগরের মহিলা-সমিতির এত ভাল এ্যাক্টিভিটির মূলে কিন্তু আপনি।

—যাঃ এ কি বলছেন?

—না, নীরদা দেবী, অনেক দেখেছি তো! কিন্তু আপনার মত এত ওয়াণ্ডারফুল অর্গ্যানাইজিং এবিলিটি খুব কম মেয়ের দেখেছি। আপনার মত মেয়ের পক্ষে কলকাতাই একমাত্র ফিল্ড।

—সেখানে গেলে কি আমার উন্নতি হবে?

—নিশ্চয়ই, সরকার আপনাকে সেখানে কোন উদ্বাস্তু শিল্প সমবায় সমিতির সুপারভাইজারও করে দিতে পারে!

—মাইনে কত দেবে ?

—কম করে দেড়শো।

—দেড়শো !—নীরদার চোখদুটো চকচক করে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পর মৃদু, অস্ফুট গলায় বলল—আগে ভাবতাম, ঘর-সংসার, মাতৃত্ব ছাড়া বুঝি মেয়েদের জীবনে আর কোন সার্থকতাই নেই—

—আপনারা মফস্বলের মেয়ে বলেই মেয়েদের মাতৃত্ব, ঘরসংসার ইত্যাদি সব বস্তাপচা কনজারভেটিভ আইডিয়াগুলোকে এখনও বিসর্জন দিতে পারেন নি। জেনে রাখবেন অদূর ভবিষ্যতে মেয়ে-পুরুষে কোন পার্থক্যই আর থাকবে না। দুনিয়ার দেশে দেশে মেয়েরা পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে মাঠে কাজ করছে, আকাশে এরোপ্লেন চালাচ্ছে।

কথা নয়, নীরদা দেবী যেন গান শুনছে আর মন্ত্রমুগ্ধ সাপিনীর মত তার গভীর কালো জোড়া চোখের দৃষ্টিটা অনিমেষের পায়ের কাছে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। মৃদু হাওয়ায় নিউটাউন রোডের দুধারে তালগাছের পাতায় পাতায় উল্লাসের করতাল বাজছে। নীরদার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল রিক্সা। অনিমেষ বলল—আমি এই রিক্সা করেই ডাকবাংলোয় ফিরে যাই, কেমন ?

—একটু চা খেয়ে যাবেন না ?

—না, না—কাল মালদহে চলে যাবো। জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করতে হবে।—অনিমেষ কয়েক পা এগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—আপনি যদি কলকাতা যেতে চান, তাহলে আমাকে বলবেন। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব—

—দেখি, আপনাকে পরে জানাবো !—মৃদু গলায় বলল নীরদা। তার মনে একটা উৎসাহের জ্বালা যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দৃপ্ত পায়ে সে ঘরের ভেতরে এল। ঘরের চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখল, আলনায় ঝুলছে সারি সারি রঙীন সিল্কের শাড়ি। ধীরেনের প্রীতির উপহার। নিজেরই কৃতকর্মের অনুশোচনায় আর ধিক্কারে তার মনটা জ্বলে যেতে লাগল।

আলনায় টাঙানো সারি সারি শাড়িগুলো যেন বিষাক্ত সাপের মত ফনা উঁচিয়ে ঝলকে ঝলকে বিষ ঢালতে উদ্যত হয়েছে। জানালাটা খুলতেই জ্যোৎস্নার ঢেউ বন্যার মত ঝাঁপিয়ে এল ঘরের ভেতরে। চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে আত্রাইয়ের খালের জল। হু হু করে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল উঠেছে, তার মনে হল, যেন একটা মন্ত্রোচ্চারিত হচ্ছে—পাপপঙ্কিল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এস। কিন্তু—

কিন্তু ধীরেন! মুহূর্তে তীব্র ঘৃণায় তার মনটা দড়ির মত পাক দিয়ে উঠল। তার এই দেহে সে যে তার উদগ্র লালসার জ্বালা ছড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো—হয়তো তার বহমান রক্তে রক্তে কোন একটা অনিবার্য ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। থর থর করে কেঁপে উঠল সে! ঘরের দেয়ালে শিবের ছবির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠল—কী আশ্চর্য তোমাব বিচার! যার কপাল পুড়িয়েছো, মাত্র তেইশ বছর বয়সে তুমি যার স্বামী কেড়ে নিয়েছো—তবুও—কেন,—কেন দিযেছো তার দেহে এই অপর্যাপ্ত যৌবন, মনের ভেতরে কামনার আগুন? বিছানায উপুড় হযে পডে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল নীরদা। নির্জন ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

ডি. এম. বললেন—দীননাথ বাবু, কামিনীবাবু, আপনারা বিডিবাঁধাদের দাবীগুলো মেনে নিন। বিড়ির কাজ একটা কুটির শিল্প। ওতে এই সহরের প্রায় সাড়ে তিনশো লোকের পেটের ভাত আসছে—

—কিন্তু হাজার বিড়িতে সওয়া দু টাকা—

—খুব পারবেন। আপনারা নানা ব্যবসা ফেঁদেছেন। আপনাদের মত বড়লোক রিফিউজি রামনগরে আর কেউ নেই—

—ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন স্যার।—বাংলোর বারান্দায মৃদু গুঞ্জন তুলল বিড়ি-বাঁধারা।

দীননাথের চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল। বাইরে সমবেত বিড়ি-বাঁধাদের মুখে সাফল্যের হাসি চিক চিক করছে।

ডি. এম আবার বললেন,—কি ভাবছেন অত মুখ নীচু করে? বিড়ি-বাঁধাদের সঙ্গে আপোষ করতে মন চাচ্ছে না?

বিদ্যুত চমকের মত মনে হল, রেজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট, মটর রুট পারমিট ইত্যাদি যাবতীয় কাজে ডি.-এমের অনুগ্রহ একান্ত প্রয়োজন। তিনি বিরূপ হলে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। বিচিত্র একটা মধুর হাসি মুখে ছড়িয়ে বলল দীননাথ—বেশ স্যার, ওদের প্রস্তাব মেনে নিলাম। বাড়তি কাজের জন্যেও মজুরী দেব—

—জয়! বিড়ি ইউনিয়নের জয়!—বিড়িবাঁধাদের উল্লসিত জয়ধ্বনি বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূবে মিলিয়ে গেল।

—তাহলে সভা ভঙ্গ হোক—রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ডি. এম বললেন।

কামিনী বলল—কিন্তু স্যার একটা কথা আছে।

—আবার কী?

—বিডি বাঁধাদের মধ্যে অনেকেই আছে স্মাগলিং করে স্যার।

—স্মাগলিং করে?

—হ্যাঁ স্যার। পাকিস্তানে বিড়িব পাতা, মশলা চালান দেয়।

—কোন প্রমাণ আছে?

—হ্যাঁ স্যাব চলুন, আপনি ওদের নেতা ঐ নিবারণ দাসের বাড়ীতে।

—কি বললেন? আমি দস্তুরমত ম্যাট্রিক পাশ। এসব ছোট কাজ আমি করতে পারি না।—গর্জে উঠল নিবারণ।

ডি. এম., এস. ডি. ও মিঃ ব্যানার্জীকে বললেন—ব্যানার্জী, যাও তো ব্যাপারটা দেখে এস।

—কন্সপিরেসি! কন্সপিরেসি।—রক্তের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল নিবারণের মাথার ভেতরে।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। বঙ্গীর রাস্তা ধরে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেলে বাঁদিকে পড়ে দত্তবাগান কলোনী। সেখানে নিবারণ দাসের

বাড়ী। নিবারণের বাড়ীর পেছনে মানগাছের জঙ্গলের ভেতরে পাওয়া গেল দুবস্তা বিড়ির পাতা, পাঁচ সেরের কাছাকাছি চিনি আর কিছু সাইকেলের পার্টস!

—ছিঃ ছিঃ নিবারনবাবু, শেষ পর্য্যন্ত আপনার এই কাজ!

আগুন ঝিকিয়ে উঠল আদর্শ বাদী এস. ডি. ও.র দুচোখে।

—আপনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক স্যার! বুঝতে পারছেন না? এটা সাজানো কেস!—করুণ গলায় বলল নিবারণ। তার দুগালের রঙ কাগজের মত সাদা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মুখনীচু করে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ ধক করে জ্বলে উঠল তার চোখদুটো—স্যার, সত্যের জয় হবেই। আমি নির্দোষ। দেবতার পায়ে হাত ছুঁয়ে আমি বলতে পারি—

কামিনী সরকার, মিঃ ব্যানার্জীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিযে বলেছিল—স্যার ওদের ইউনিয়নের ধীরেন জোয়ারদারের কাছে আমি শুনেছি—বহুদিন থেকেই নিবারণ চোরাই মালের ব্যবসা করছে—

—মিথ্যে কথা! ধীরেনদা একথা বলতে পারে না!

গর্জে উঠেছিল নিবারণ।

—কিন্তু—

কিন্তু শহরের সমস্ত বিড়ি বাঁধাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিযে তাদের প্রিয় নেতা ঐ ধীরেনদা'ই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিয়েছিল নিবারণের বিরুদ্ধে।

মিথ্যা সাক্ষী দিয়েই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে নদীর দিকে হন হন করে হেঁটে চলে গিযেছিল ধীরেন্দ্রলাল। বিড়িবাঁধাদের তীব্র অগ্নিদৃষ্টি তার পিঠে স্ঁচের মত বিঁধছিল। একটা তাড়া খাওয়া জন্তুর মত সে ছুটে পালাল।

—ধীরেনদার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে রে! কী আশ্চর্য! নিবারণদার বিরুদ্ধে সে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারল।—ব্যথিত বিক্ষুব্ধ বিড়ি বাঁধাদের দল অসহায়ভাবে প্রতিবাদ করল।

—আমরাই ওকে নেতা করেছিলাম, তাই আমাদেরই মুখে ও থু থু ছিটিয়ে দিল। ছিঃ ছিঃ!—রোষে ক্ষোভে জ্বলে উঠল টুলু-ভোঁদড়দের দলটা।

বিড়ি-বাঁধারা আবার কাজে যোগদান করল। হাজারে সওয়া দুই টাকা করেই তারা মজুরী পেতে লাগল। কিন্তু ছমাস জেল হয়ে গেল নিবারণের।

॥ সাতাশ ॥

পরদিন সকালে মোটর থেকে নামল পদ্ম, পুঁটি আর লালু। রাস্তায় দুই এক জন বিড়ি কারিগরের সঙ্গে দেখা হল পদ্মর। কিন্তু তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। অবাক হলো পদ্ম। ঢাকা কলোনীর সম্মুখে আসতেই ল্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন অফিসের বারান্দায় বুড়োদের আড্ডা থেকে কে একজন তার দিকে তাকিয়ে কি যেন ফিসফিসিয়ে বলল। পদ্ম বলল,—ব্যাপার কিরে লালু, সবাই আমাকে দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করছে মনে হচ্ছে!

—সে তো চিরকালই বলে। তোমার নিন্দে না করলে ঘুম হয় না ওদের।

কিন্তু পদ্মের বুকের ভেতরটা শির শিব করে উঠল। মনে হয় যেন আকাশে-বাতাসে তার বিরুদ্ধে একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে আসছে। হয়তো আবার আরেকটা আঘাত দেবার জন্য বিধাতা ষড়যন্ত্রে মত্ত হয়ে উঠেছেন। ধীর পায়ে বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়াল পদ্ম। ফটা নেই। সুধা রান্না করছিল। ছুটে বাইরে এল। আনন্দ উচ্ছ্বসিত গলায় বলল— তোমরা এসেছো পদ্মদি!—তারপর সাদা থান কাপড় পরা পুঁটির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল সুধা। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—তোর কপাল পুড়েছে পুঁটি!—তার চোখদুটো ভিজে উঠল।

তীব্র একটা বেদনা কণা কণা জল হয়ে ঝরল পুঁটির চোখে। বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে মিছরীভোগ আমগাছটা। পুঁটির মনে পড়ল হ্যাদোনের হাত ধরে ঐ গাছের নীচেই সে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল। গাছের গায়ে

চাকু দিয়ে কেটে হ্যাদোন নিজের নাম খোদাই করেছিল—সেই লেখাটা জ্বল জ্বল করে উঠল তার চোখের সামনে। বাড়ীটার চারিদিকে হ্যাদোনের অজস্র স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। কত জ্যোৎস্নার আলোয় ধোয়া রাতে, কত নির্জন দুপুরে ঐ আমগাছের নীচে বাঁশের মাচাটার ওপর তারা দুজনে বসে কত কথা বলেছে। সব—সব আনন্দ, হাসি, গান শেষ হয়ে তার জীবনটা যেন নিরর্থক শূন্যতায় ভরে গেছে। হু হু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা।

সুধা বলল—কাঁদিস না পুঁটি। যা হবার, তাই হয়েছে। স্বামী মারা গেলেই আজকালকার মেয়ে একেবারে অনাথা হয় না। তুই সব সময় মনে করবি, তোর যেন বিয়েই হয় নি!

—ফটা কৈ রে সুধা?

—সে তো দোকানে। জানো পদ্মদি ষ্ট্রাইকের পর থেকে দোকানে খুব কাটতি বেড়েছে! নিউ টাউনে অনেক নতুন নতুন বাড়ী হচ্ছে কিনা, রাজমিস্ত্রী কুলী কামীন প্রচুর এসেছে তাই—। হঠাৎ থেমে গেল। যেন আরও কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সুধা।

—ধীরেন বাবু এসেছিলেন?

—না। তোমরা যাওয়ার পর আর আসেন নি—

ধীর পায়ে নিজের ঘরে এল পদ্ম। ঘরের দেয়ালে দড়িতে ঝুলছে সুধার শাড়ী, চুলের ফিতে, তাকের ওপরে সস্তা সেণ্টের আর পাউডারের কৌটো। মৃদু সুগন্ধ ঘরের বাতাসে ভাসছে। হ্যাদোনের জলভরা চোখদুটো পদ্মর মনের ভেতরে ভেসে উঠল। কানের কাছে বাজতে লাগল তার করুণ মিনতি—দিদি তুই বিয়ে করিস। তুই ধীরেনদাকে ভালবাসিস—

হ্যাঁ, সে তাকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে কিন্তু বিয়ের বন্ধনে সেই প্রেমকে সে সীমিত করতে চায় নি। ভেবেছিল দূর আকাশের পাশাপাশি দুটো নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করবে। দুজনে দুজনকে আলো দেবে, প্রেরণা দেবে। আরও বৃহৎ পটভূমিতে ওর উন্নতি, নাম যশ খ্যাতিকে প্রসারিত করে দেবে। বিয়ে হলে তার জন্মলগ্নের সেই সর্বনাশা অভিশাপ যদি

নিষ্ঠুর হাতে তাকে ছিনিয়ে নেয়—দূরে সরিয়ে দেয়! ধীরেন্দ্রলালকে নিয়ে সংসারের স্বপ্ন যখনি তার স্নায়ুকে মাতাল করে দিয়েছে, তখনি বুকের ভেতরে ফুঁসে উঠেছে সেই দুর্ভাগ্যের অন্ধ রাক্ষসটা কিন্তু—

শক্ত হয়ে মেঝের ওপর দাঁড়ায় পদ্ম। স্যাদোনের বুকে হাত রেখে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জানালার বাইরে খাদিমপুরের আদিগন্তপ্রসার প্রান্তর নির্বাক বিষণ্ণতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। পদ্মর মনে হল, তার জীবনে সামনে পিছনে যতদূর চোখ যায় শুধু নিরাকার শূন্যতা। মা চলে গেছে অনেকদিন আগে। ভাইও তাকে ছেড়ে চলে গেল। তবুও—তবুও যেন তার অন্ধকার জীবনের কোণে-কোণে রামধনুর ঝিলিমিলি ফুটে ওঠে। ধীরেনের জন্যই যেন এত দুঃখ কষ্টের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়েও তার বাঁচতে ইচ্ছে হয়।

—পদ্মদি এসেছো!—দোকান বন্ধ করে ফটা আসে। পদ্ম ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফটা বলল,—পদ্মদি তুমি শুনলে খুসী হবে। এতদিনে আমার মা আমাদের দুজনকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। ছোট ভাইকে দোকানে পাঠিয়েছিলেন।

—তুই আর সুধা তাহলে তোদের বাড়ীতে চলে যাবি?—বলল লালু।

—হ্যাঁ তাই যেতে হবে, এতদিনে মায়ের রাগ যখন ঠাণ্ডা হয়েছে। তাঁর আশীর্বাদ না পেলে আমরা সুখী হতে পারবো না—সুধার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফটা বলল,—পদ্মদি তুমি কিছু বলছো না যে?

—কি বলবো ভাই? খুব আনন্দের খবর। তোরা নিশ্চয়ই যাবি। একটু থেমে বলল—হ্যাঁরে ধীরেনবাবুর খবর কি?

—তাঁর কথা আর বলো না পদ্মদি। গম্ভীর হয়ে গেল ফটা। কয়েক মুহূর্ত পর সহজ গলায় বলল, ধীরেনদার মিউনিসিপ্যালিটির খাতাপত্র গভর্ণমেণ্ট 'অডিট' করছে কি না, তাই তিনি খুব ব্যস্ত আছেন।

—তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই আমার এখানে পাঠিয়ে দিবি কিন্তু—

—হ্যাঁ, তাঁকে আসতে বলবো।—চিন্তার ছায়া পড়ল ফটার চোখে। কথার

মোড় ঘুরিয়ে বলল—জানো পদ্মদি মা ডেকে পাঠিয়েছেন—এত আনন্দ হয়েছিল যে ছুটে এসেছি—এখুনি যাবো কিন্তু—কিন্তু—

—ফটা, তুই যেন কি একটা কথা চেপে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে—

—কিছু না পদ্মদি।

তবুও তীব্র একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল পদ্মর চোখে। অস্বস্তিতে তার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। দূরে বারান্দার এক কোণে বিষাদের প্রতিমার মত বসে থাকা পুঁটির দিকে তাকিয়ে ফটা বলল,—হ্যাদোনকে বাঁচাতে পারলে না পদ্মদি!

—যে যাওয়ার তাকে কি রাখা যায় ভাই?

বেদনায় মেদুর হয়ে উঠল ফটার চোখের দৃষ্টি।

শাড়ী বদলে হাতে একটা টিনের সুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে এল সুধা। বলল—চল তোমাদের বাড়ী।—পদ্মর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

পদ্ম সুধাকে কোলের ভেতরে টেনে নিয়ে বলল—মাঝে মাঝে আসিস কিন্তু শাশুড়ী দেওর ননদকে পেয়ে আমাকে ভুলিস না—

—তোমাকে ভুলবো!—সুধার চোখে জলের ছায়া পড়ল। বলল—তুমি বিয়ে না দিলে আমার এই রূপ দেখতে পেতে না। সংসারে তোমার মত আমার এত আপন আর কেউ নেই পদ্মদি।

—তুমি আমাদের সকলের মায়ের মত পদ্মদি!—বলল লালু।

ফটা আর সুধা ধীর পায়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। খাদিমপুরের মাঠের ওপরে সরু রাস্তা দিয়ে এক জোড়া সুখী দম্পতি আনন্দে হাসিতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে চলেছে যেন। রজনীগন্ধার মত সুধার দীঘল দেহটা যেন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে। ওদের দেখে পদ্মর চোখদুটো জুড়িয়ে গেল।

তীব্র একটা কান্নার শব্দে চমকে উঠল পদ্ম। বারান্দার উপরে উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে পুঁটি। বিষণ্ণ বিকেলের রুদ্ধশ্বাস বাতাসে তার গুমরানো কান্নার চাপা শব্দ তরঙ্গিত হয়ে গেল চারিদিকে।

সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখল পদ্ম। বলল—ওঠ, কাঁদিস না পুঁটি।—আর কি বলবে সে ভেবে পেলো না।

সংকীর্ণ মনের মামা-মামীর আশ্রয়ে লালিতা দুঃখিনী মেয়ে ত্যাদোনের হাত ধরে সংসার রচনা করেছিল। বিধাতা তাকে সন্তান দেয় নি; নিষ্ঠুর হাতে স্বামীকে কেড়ে নিয়ে পুঞ্জীভূত বেদনায় ভরে দিয়েছে তার সতের বছরের যৌবনকে। দুঃখ পাওয়ার জন্যই যার জন্ম, তাকে কী সান্ত্বনা দেবে পদ্ম!

॥ আটাশ ॥

পরদিনও ধীরেন্দ্রলাল এল না। পদ্ম ভাবল, ধীরেনের বাড়ীতে একবার খোঁজ নেবে না কি। শ্রাবণের আকাশে কালো মেঘ জমেছে। টিপ টিপ্ বৃষ্টি ঝরছে। আর এক একটা দমকা বাতাসে উঠোনের আমগাছের রাশি রাশি পাতা বেয়ে চোখের জলের মত জল ঝরছে টপ—টপ—টপ।

ওদিকে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসের বারান্দায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে বিশু দাশগুপ্ত, সুবিনয়, নান্নু, কালীনাথ ইত্যাদি আরও দু' একজন শহরের গণ্যমান্য লোক। তিনদিন ধরে অডিট চলছে। আজ তার ফাইনাল রিপোর্ট দেবেন লোক্যাল সেলফ গবর্ণমেন্টের অডিটার মিঃ রায়। চেয়ারম্যানের ঘরে বসে তিনি মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে এঁটে, লাল, নীল পেন্সিলের টিক দিয়ে হিসেব পরীক্ষা করছেন আর কপালে হিজিবিজি রেখা ফুটে উঠছে। এ্যাকাউন্ট্যান্ট গোপালবাবুকে বললেন—টিউবওয়েল পাম্প পারচেজিং—এই খাতে খরচ দেখিয়েছেন আটশো টাকা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।—গোপালের বাদুড়চোষা দেহটা ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

—কোন কোম্পানী থেকে কেনা হয়েছিল? সাপোর্টিং ভাউচার নিয়ে আসুন—

কাঁপা হাতে 'ভাউচার বুক' নিয়ে এল গোপাল। রাশি রাশি ভাউচার উল্টে শেষদিকের একটা ভাউচারের দিকে মিঃ রায়ের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। কলকাতার নেতাজী সুভাষ রোডের 'মায়া পাম্প' কোম্পানীর ভাউচার! চারটি পাম্প কেনা হয়েছিল···কিন্তু এ কী! অডিটারের চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। ভাউচারের গায়ে ইরেজারের দাগ! ঘসে ঘসে পেন্সিলের লেখা টাকার অঙ্কটা তুলে ফেলে বড় বড় করে আটশো টাকা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! মিঃ রায় তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের দিকে—কী ব্যাপার! কার হুকুমে আপনি অরিজিন্যাল ভাউচারের গায়ে ইরেজারের দাগ বসিয়েছেন? বলুন, চারটি পাম্পের 'এ্যাকচুয়েল প্রাইস' কত ছিল?

কেঁদে ফেললেন গোপালবাবু। কান্নাভাঙ্গা করুণ গলায় বললেন—আমাকে মারবেন না স্যার। আমার কোন দোষ নেই—'এ্যাকচুয়েল প্রাইস' ছিল সাড়ে ছয়শো টাকা। চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, ওটাকে আটশো টাকা করে দিতে—

—দেড়শো টাকা বুঝি তিনি পকেটে করে নিয়ে গেলেন, না? আপনাকে ভাগ দেয় নি!

—হ্যাঁ স্যার। দশ টাকা দিয়েছিল।

খস খস করে একখণ্ড কাগজে ভাউচারের নাম্বারটা লিখে রাখলেন মিঃ রায়। তাঁর কড়া আদেশ—মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা 'অডিটে'র সময় কেউ ভেতরে আসতে পারবে না। বিশু দাশগুপ্তের দল বাইরে দাঁড়িয়ে কাচের দরজার ওপার থেকে তীব্র আগ্রহে দেখছে গোপালবাবুর কাতর মুখখানা আর অডিটার মিঃ রায়ের রোষদীপ্ত চোখ দুটো। তাদের চোখের কোণায় কোণায় ধূর্ত্ত অভিসন্ধির হাসি চক চক করছে। ভাইস চেয়ারম্যান সুনীল মোক্তার বলল—শালা, আমাদের একটা পয়সা ছোঁয়ায় নি! কোনদিন ডেকে এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়ায় নি—দুহাতে নিজে লুটেছে!

—কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব গেলেন কোথায়?—বলল বিশু দাশগুপ্ত।

ধীরেন্দ্রলালের সমর্থক, তার দলের কালীনাথ আর নানু সেনের মুখে

অন্ধকার নেমে এসেছে। সুবিনয় বলল—বলুন কালীনাথবাবু—বলুন নানুবাবু আপনারা কি এখনও ধীরেনবাবুর মত এই রকম একজন অর্থপিশাচ, দুশ্চরিত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনবেন না ?

—আমরা অনাস্থা না আনলেও যারা আমাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে, তারাই ওকে টেনে নামাবে চেয়ার থেকে। গায়ে থুথু ছিটিয়ে দেবে—নানুর চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

কালীনাথ বলল—বিয়াল্লিশ সালের জেলখাটা লোক। উদার মনের যুবক এবং ও বাস্তুত্যাগী তাই আমরা সমর্থন করেছিলাম। কিন্তু সে যে এত নীচে নেমে গেছে—

—নামবে না।—সুবিনয়ের কুতকুতে চোখ দুটোয় হাসি ঝিকমিক করে উঠল—দু দুটো মেয়েলোক। একটা বিধবা, আরেকটা স্বামী পরিত্যক্তা। তাদের নিয়ে স্ফূর্তি তো বিনে পয়সায় হয় না !

—আসুন আপনাদের 'এসটাবলিশমেণ্ট' ফাইল—ঘরের ভেতরে গর্জে উঠলেন মিঃ রায়।

'এসটাবলিশমেণ্ট' ফাইল খুলেই অডিটার দেখলেন—মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে চন্দ্রনাথ সেনের ভাঙা ঘাট পরিদর্শন করতে গেছেন চেয়ারম্যান। মাত্র ছয় মাইল রাস্তা। পেট্রোল খরচ হয়েছে চার গ্যালন। কী ব্যাপার !

কাতর গলায় বললেন গোপালবাবু—উনি মোটরে করে সঙ্গী সাথী নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন স্যার !

আবার কাগজে 'নোট' করলেন অডিটার। বর্ষার সকালেও তিনি ঘেমে উঠলেন। ফাইলে ফাইলে নানা অসাধুতার স্বাক্ষর জ্বল জ্বল করছে। ধীরেন্দ্রলালের বাইরের দলটা ফিসফিসিয়ে উঠল—শালার ঘাড়ের ভাঁজে ভাঁজে কি রকম মাংস থল থল করছিল।

—ওসব টাকায় করে হে—

—আপনারা এবার ভেতরে আসুন—গম্ভীর গলায় ডাকলেন অডিটার মিঃ রায়।

মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা সবাই ভেতরে এলেন। অডিটার খস খস করে লিখে রিপোর্টটা তাদের হাতে দিলেন। বললেন—এরকম লোককে চেয়ারম্যানের পদে রাখা জনস্বার্থের বিরোধী।—বলেই তিনি নিউকাট জুতোর মশ মশ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরে বৃষ্টিটা থেমে গেল। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ভেতর দিয়ে ম্লান রৌদ্রের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সুবিনয় দাস রামনগরের বাজারের দোকানে দোকানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে লাগল, ধীরেন্দ্রলালের দুষ্কৃতির কথা। হাঁ হাঁ করে উঠল দোকানীরা। বলল—আমরা বিশ্বাস করে তাঁকে ভোট দিয়েছিলাম। তাঁর এই কাজ!—বাজারের দোকানীর মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সুবিনয় দলবল নিয়ে চলল বরিশাল, ফরিদপুর কলোনীতে। যে বাস্তুত্যাগীরা ধীরেন্দ্রলালকে ভোট দিয়েছিল, তাদের ভেতরেও তার বিরুদ্ধে তীব্র কটু ভাষায় নিন্দা করে বক্তৃতা করল। বাস্তুত্যাগীরা রুখে উঠে বলল—শালার মাংস কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

বিড়ি-কারিগর নরেন, লালু, ফটাদের মুখ চূণ হয়ে গেল। তারা আভাস পেয়েছিল, ধীরেনদা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একেবারে পুকুরচুরি। এখন তারা বুঝতে পারল, কেন ধীরেন্দ্রলালের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল! তারা বিড়ির কারিগর। লেখাপড়া জানে না। সহরের লোকের কাছে তাদের কোন সম্মান নেই, মর্য্যাদা নেই। কিন্তু ধীরেন্দ্রলাল তাদেরই একজন বলে, শহরের লোক তাদের সমীহ করতো। এইজন্যেই ধীরেন্দ্রলালকে তারা একটা জনপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ নেতার পদে বরণ করেছিল। বিড়ি-কারিগর হলেও, ধীরেন্দ্রলাল তাদেরই একজন বলে শহরের লোক তাদের অবহেলায়, ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিত না।

নরেন বলল—ধীরেনদা আমাদের মাথাটা একেবারে নীচু করে দিল।

লালু বলল—লোকে আমাদের গায়ে থুথু দেবে—

ছোট পুকুরে সামান্য ছোট একটা ঢিল পড়লেই যেমন তার নিস্পন্দ জলে তরঙ্গ ওঠে, তেমনি ছোট এই মফস্বল শহরের জীবন এই ঘটনায়

প্রচণ্ড বেগে আবর্ত্তিত হয়ে উঠল। সন্তুবাবুর মাঠে সভা করল জনসাধারণ। বিভিন্ন বক্তারা হাতের মুঠো উদ্যত করে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করল। আকাশে ঘুসি ছুঁড়ে বলল—'অর্থলোভী, দুশ্চরিত্র, ধীরেন্দ্রলালকে হটিয়ে দিতে হবে।' জনতা চেঁচিয়ে উঠল—'জনসাধারণের টাকার হিসেব চাই আমরা।'—উত্তেজিত মানুষগুলোর চোখে যেন আকাশের বজ্রঝিলিক।

দূর সমুদ্রের গর্জিত কলরোলের মত বিক্ষুব্ধ জনতার চীৎকার শুনে চমকে উঠল পদ্ম। জিন্দাবাদ বিড়ির দোকানের দিকে যাওয়ার পথে সে থমকে দাঁড়াল। ফটা ছুটে এসে বলল—সর্ব্বনাশ হয়েছে পদ্মদি! সব মিলিয়ে দু বছরে প্রায় এক হাজার টাকা চুরি করেছে ধীরেনদা।

—কি।—ককিয়ে চীৎকার করে উঠল পদ্ম—না—না, টাকা চুরি সে করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না—তার মাথাটা যেন ঘুরছে। যেন ধমনীতে-ধমনীতে তার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল—ফটা, তুই ধীরেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে একবার খোঁজ কর তো। ওখানে না পেলে নীরদা দেবীর বাড়ীতে নিশ্চয়ই পাবি।—টলতে টলতে বাড়ীতে ফিরে এল পদ্ম।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ধীরেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এল বিশুরঞ্জন। সবাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করল সেই প্রস্তাব। সেই খবরটা আবার শহরের উৎসাহী ছোকরারা সাইকেল-রিক্সার সঙ্গে লাউড স্পীকার ফিট করে ঘোষণা করল। এক বছর আগে যেমন মহাসমারোহে উচ্ছ্বসিত বিপুল হর্ষধ্বনির ভেতরে শহরের লোক ধীরেন্দ্রলালকে সম্মানের আসনে বসিয়েছিল, তেমনি, দ্বিগুণ ঘৃণায় তারা ধিক্কার দিল তাকে। পদ্মর কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুকের ভেতরটা তার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

পুঁটি বলল—তুমি তাকে খুব বিশ্বাস করতে পদ্মদি, বড় বেশী প্রশ্রয় দিতে। তুমিই বেশী আঘাত পাবে।

—ঐ নীরদা দেবীই ওর সর্ব্বনাশ করছে। ধাপে ধাপে অধঃপাতের শেষ সীমায় টেনে নামিয়েছে।—শান্ত, স্পষ্ট গলায় পদ্ম বলল। ফটাকে

পাঠিয়েছে। লালুকে পাঠিয়েছে সে ধীরেন্দ্রলালের কাছে। কিন্তু তারা কেউ এখনও ফিরে এল না। কোথায় গেল ধীরেন্দ্রলাল? অনেক অহংকার আর অনেক বিশ্বাস দিয়ে গড়া ধীরেন্দ্রলাল যেন পদ্মের বুকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে! আজ এই আঘাত পেতে হবে বলেই হয়তো তাকে এত বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু—কিন্তু এখনও যদি একবার ধীরেন্দ্রলাল তার সামনে এসে দাঁড়াতো, তাহলে তার সব অন্যায় আর দুষ্কৃতির গ্লানিকে সে স্নেহসিক্ত হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিত। তাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেত—অনেক—অনেক দূরে। তার সব অপূর্ণতাকে সে হৃদয়ের সব স্নেহ প্রীতি ঢেলে দিয়ে ভরিয়ে দিত। তার মত একটা কুশ্রী ও দুর্ভাগিনী মেয়েকে সে যে প্রথম মধুর এক ভালবাসার বিচিত্র স্বাদ দিয়েছে! সেই প্রেমের অনুভূতি তার রক্তে-রক্তে ছড়িয়ে দিয়েছে সূর্য্য আর নক্ষত্রের অগ্নিকণা। তার সব অন্যায়কে সে ক্ষমা করতে পারতো, বাড়ীঘর দোকান বিক্রী করে সে তার হয়ে মিউনিসি-প্যালিটির টাকাও শোধ করে দিতে পারতো। কিন্তু—

সন্ধ্যার ছায়া ছায়া অন্ধকারের সঙ্গে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। একটানা তীক্ষ্মমুখ বর্শার মত বৃষ্টির ধারায় আর ঝড়ো বাতাসে মেতে উঠল শ্রাবণের রাত্রি। গায়ে কাপড় জড়িয়ে সেই বৃষ্টি মাথায় করে দুর্যোগ-রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে সন্তর্পণে হেঁটে চলেছে ধীরেন্দ্রলাল নিজের বাড়ীর দিকে। দিনের আলোয় কাউকে সে মুখ দেখাতে পারে নি। সারাদিন সে তার বন্ধু, মোটর ড্রাইভার বিরজা দাসের বাড়ীতে দুই হাঁটুর ভেতরে মাথা লুকিয়ে বসে ছিল। বিরজার ছোট ভাই সদাকে পাঠিয়েছিল কামিনী সরকারের বাড়ীতে সেই দেড় হাজার টাকার জন্য। কিন্তু সদা ফিরে এসে বলল,—কামিনীবাবু বাস্তুত্যাগীদের সভায় গেছে।—সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে নেমে এসেছিল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। বিদ্যুৎচমকের মত মনে হল পদ্মর কথা। পদ্মকে বললে হয়তো—কিন্তু কোন মুখে সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! পদ্মর সরল চোখদুটো তার মনের ভেতরে ভেসে উঠতেই দুরু দুরু কেঁপে উঠল বুকটা। কি বলবে পদ্ম? হয়তো আঘাতের যন্ত্রণায়

সে কেঁদে ফেলবে। কিন্তু কি করবে সে? কি করতে পারে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে তার জীবনকে অটুট সংযম আর সুউচ্চ একটা আদর্শবাদের লৌহ নিগড়ে বন্দী করে রেখেছিল। তাই জীবন তার প্রতিশোধ নিয়েছে নির্মম ভাবে। অর্থের স্বাচ্ছল্য আর হাস্যোচ্ছল সুঠাম তনু নীরদার চোখের কোণায় কোণায় আমন্ত্রণের হাতছানিই তাকে ঘন অন্ধকারের অতল শূন্যতার ভেতরে দুর্গন্ধময় একতাল কাদার মত ছুঁড়ে দিয়েছে। নিজের ওপরে অসহ্য ক্রোধে জ্বলে উঠল সে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বন্দুকের গুলীর মত ধীরেন্দ্রলালের গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। কড়—কড়—কড়াৎ—কোথায় বাজ পড়ল। দূরে বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে উঠল চারিদিক। ধীরেন্দ্রলালের মনে হল, গর্জিত এই রাত্রি যেন রাশি রাশি সরীসৃপের মত তাকে লক্ষ্য করেই ক্রুদ্ধ ছোবল তুলেছে। যেন চারিদিকের ঘনীভূত কালোর ভেতর থেকে বিষজর্জর মৃত্যু যেন তার দিকেই নিরুদ্ধ আক্রোশে ছুটে আসছে। তার লোভের পাপ—সেই বিষের জ্বালায় সে টলে পড়বে। বৃষ্টিতে ভেজা জন্তুর মত মাথা নীচু করে জল কাদার ভেতর দিয়ে হাঁটছে ধীরেন্দ্রলাল। সকলের অলক্ষ্যে এই শহর ছেড়ে সে চলে যাবে! যে ঘাড়ে-ঝুলানো খদ্দরের ব্যাগটা নিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে ভাগ্যের সন্ধানে এ শহরে এসেছিল—সেই ব্যাগটা নিয়ে বন্ধু বিরজার মোটরেই সব হারিয়ে সব খুইয়ে নিঃশেষে রিক্ত হয়ে সে চলে যাবে! কিন্তু বাড়ীর সম্মুখে আসতেই থমকে দাঁড়াল ধীরেন্দ্রলাল। এই দুর্যোগ মাথায় করে কে তার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে? পদ্ম। ধীরেন্দ্রলালের পা দুটো যেন ভেজা মাটিতে আটকে গেল। দুরু দুরু কেঁপে উঠল বুক। যদি পদ্ম হয়, কি বলবে তাকে? কেমন করে সে এই মুখ দেখাবে! ভীত কম্পিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল—কে ওখানে?

অন্ধকারে সেই অস্পষ্ট সাদা ছায়ামূর্ত্তি চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল—আমি—এসো, এসো, তুমি এসেছো!

বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে বারান্দায় উঠে এল ধীরেন্দ্রলাল। কঠিন গলায় বলল—কে তুমি?

—আমি নীরদা।—কোমল গলায় বলল নীরদা—তোমার এই দুরবস্থার জন্যে আমিই দায়ী। আমাকে ভালবেসে—আর কথা বলতে পারল না নীরদা। তার জলভরা চোখদুটো ম্লান নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করে উঠল। পরম মমতায় তার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল—দেখ, তুমি আমাকে স্ত্রীর মতই ভালবেসেছিলে। তাই তোমার দেওয়া সব জিনিসই নিয়েছি। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো? তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, কেমন করে বাঁচবো বলো তো!

—আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।—ঝড়ো বাতাসকেও শিউরে দিয়ে চীৎকার করে উঠল ধীরেন্দ্রলাল। কিন্তু তবুও তার বুকের কাছে আরও ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল গলায় নীরদা বলল—তোমার দেওয়া সব গয়না আর জিনিসপত্র তোমাকে দিচ্ছি। তুমি বিক্রী করে মিউনিসিপ্যালিটির টাকা শোধ করে দাও। নিজের মান বাঁচাও, লক্ষ্মীটি। আমার সব কথাই তো তুমি রেখেছো—

—এসব বুদ্ধি বুঝি তোমাদের মার্কেটিং অফিসারের কাছে থেকে নিয়ে এসেছো।—ঘৃণায় জ্বলে উঠল ধীরেন্দ্রলাল।

তার কথা যেন শুনতেই পেল না নীরদা। কান্না থরোথরো গলাটা আরও করুণ করে বলল—তুমি আমার সঙ্গে চল। চল কলকাতায়। সেখানে দু'জনে চাকরী করবো। আমাদের—তার কথাটা আর শেষ হলো না। ধীরেন্দ্রলালের হিংস্র একটা হাতের থাবা এগিয়ে এল তার দিকে। দুচোখে আগুন ঝরিয়ে সে বলল—এ বুঝি নতুন কোন ছলনা? তোমাকে চিনতে আমার বাকী নেই।—নীরদাকে এক ধাক্কায় দূরে ছিটকে ফেলে দিল। উন্মাদের মত সে চেঁচিয়ে উঠল—তোমার নিঃশ্বাসে বিষ আছে। ধীরেন্দ্রলালের পা দুখানা বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরে অর্থহীন আকুলতায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল নীরদা। বলল—আমাকে তুমি মেরে ফেল। তবুও আমার সঙ্গে চল তুমি।

—তোমার অনেক নাটক দেখেছি।—পা দুখানা তার কোলের ভেতর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বৃষ্টিঝরা রাস্তায় নেমে এল ধীরেন্দ্রলাল।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল নীরদা। আগ্নেয় একটা নিঃশ্বাস চেপে দূর থেকে চাপা গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল—কাঁদো—যত পারো—

বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। ঘুম নেই পদ্মর চোখে। বুকচাপা অন্ধকার ঘরের বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। পাশের ঘরে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে পুঁটি। হাওয়ায় উড়ছে তার চটের পর্দার দরজাটা। পদ্মর বিক্ষুব্ধ চেতনার ওপরে একটা মুখের ছবিই ভেসে ভেসে উঠছে। একবার যদি সামনে এসে দাঁড়াতো, তাহলে তার সব জ্বালা, সব অপমান ধুয়ে মুছে সে তাকে নিয়ে অবারিত একটা আনন্দের জীবনে প্রবেশ করতো। যদি শহর ছেড়ে চিরকালের মত সে চলেই গিয়ে থাকে তাহলে? তার সঙ্গে একবার দেখাও করবে না! বিছানার ওপরে উঠে বসল পদ্ম। হঠাৎ চমকে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। জানালার পাশে শিউলিগাছের ছায়া ছায়া অন্ধকারে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে! না, পুঁটির ময়লা থান কাপড়টা গাছের নীচে বাঁশের ওপরে বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে ঝুলছে! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল পদ্ম—কে ওখানে?

ধীরেন্দ্রলাল বারান্দায় উঠে এল। বলল—পদ্ম, আমি!

—তুমি! থর থর করে কেঁপে উঠল পদ্ম। মাতলা একটা ঝড়ের মত ছুটে বাইরে এল। তার হাত ধরে বলল—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস—

—আমি চলে যাচ্ছি পদ্ম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না পদ্ম। বলল—ভেতরে আসবে না।

—তোমার ঘরে এই নিশি রাতে যাবো?—বিস্মিত গলায় ধীরেন্দ্রলাল বলল।

একদিন নয়, দুইদিন নয়, বছরের পর বছর সে এই বাড়িতে পদ্মের পাশের ঘরে রাত্রি কাটিয়েছে। তাকে ঘিরে কত মধুর কল্পনায় অতন্দ্র রাত্রি আমন্থর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার ঘরে পা দিতে কোনদিন সাহস হয় নি। একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে রাত কাটিয়েছে। আর আজ?

আজ এই নিদারুণ দুঃসময়ে তার সেই দুর্ব্বার কামনার মূর্ত্তিই তাকে গভীর রাতে নিজের ঘরে নিয়ে চলেছে। আশ্চর্য! ধীরেন্দ্রলালকে তার বিছানায় বসিয়ে তার মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে পদ্ম বলল—ভাবনায় ভাবনায় শরীর যে একেবারে ভেঙ্গে ফেলেছো!

তার মমতা-গভীর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে অনুশোচনায় ভারী হয়ে উঠল ধীরেন্দ্রলালের মনটা। বলল—তুমি কি সব শুনেছো পদ্ম?

—হ্যাঁ। তোমার এ দুর্মতি হলো কেন বলো তো?

ধীরেন্দ্রলালের মুখে কোন কথা নেই। আশ্চর্য পদ্মর চোখে কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই। কোন সন্দেহের ছায়া পর্যন্ত নেই। যেন কোন স্বপ্নের উল্লাসে ছটফট করছে তার চোখের তারাদুটো। আবেগরুদ্ধ গলায় পদ্ম বলল—চল এখানকার বাস তুলে দিয়ে চলে যাই। তোমাকে আমার জীবন থেকে মুছে যেতে দেব না।

—বড্ড দেরী করে বললে পদ্ম। কতদিন তোমাকে বলেছি, কত অনুরোধ করেছি। বিয়ের কথা বললেই তুমি গম্ভীর হয়ে যেতে। এতদিন ধরে পাশাপাশি থাকলাম, কিন্তু তুমি জীবনটাকে লোহার সিন্দুকের মত আটকে রাখলে। আর দেখ আমিও তো—

—কিন্তু তোমাকে ঘিরে আমার স্বপ্ন যে অনেক বড ছিল—

—স্বপ্নকে যত খুসী বড় করে দেখা চলে। কিন্তু জীবন আর যৌবনের দাবী খুব নিষ্ঠুর পদ্ম!—তীব্র অনুশোচনায় কাতর ধীরেন্দ্রলালের দুটো ব্যথাপাণ্ডুর চোখে কান্নার ছায়া।. পদ্মর হাতদুটো ধরে কান্নাভরা গলায় কেঁপে কেঁপে বলল—পদ্ম! তুমি তো—তুমি তো জানতে আমি কত দুর্ব্বল—

—এসব তুমি কি বলছো!—পদ্মর চোখের সামনে যেন কুয়াশার ঝিলিমিলি ভেসে ওঠে। তার ধ্যানের মূর্ত্তি ধীরেন্দ্রলাল যেন অনেক—অনেক দূর থেকে কথা বলছে। পদ্ম বলল—তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

—শুধু এইটুকু জেনে রাখ—তোমার ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারি নি।

—রুদ্ধ একটা অস্থিরতায় জ্বলে যাচ্ছে তার ভেতরটা।

—কেন ? জনসাধারণের টাকা ভেঙ্গেছো বলে তুমি একথা বলছো !

আর পারল না ধীরেন্দ্রলাল। তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটা যন্ত্রণার চমক ছিঁড়ে দিল তার বুকটা। শুচিতার আভায় স্নিগ্ধ পদ্মর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলল—টাকা আমি নীরদাকে দিয়েছি পদ্ম। শুধু তাই নয়, তোমার এখান থেকে যাওয়ার পরই তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করেছি।

পাথর হয়ে গেল পদ্ম। তীব্র আঘাতে মৃত্যুর মত বিবর্ণ দুটো চোখের দৃষ্টি। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে একটা মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে ধীরেন্দ্রলাল। তার মনে হলো, পদ্মর চোখের কোটর থেকে যেন দুটো লকলকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে তার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিচ্ছে। তার পা জড়িয়ে ধরে পাগলের মত ধীরেন্দ্রলাল বলল—তোমার আদর্শ আমি রাখতে পারি নি। আমাকে ক্ষমা করো। মৃত্যুর সময় যেন তোমার নাম উচ্চারণ করে মরতে পারি। তুমি সব সময় আমাকে তোমার কাছে কাছে ধরে রাখো নি কেন পদ্ম—কেন—

—ওঠ।—আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল পদ্ম—শহরের সবাই তোমাকে চোর বলেছে এতে আমার দুঃখ ছিল না। তোমার-আমার নামে লোকে কত নোংরা কথা বলেছে, তাও সহ্য করেছি। কিন্তু তুমি এত নীচ কাজ করলে কি করে ? এত সস্তা, এত সাধারণ হতে পারলে তুমি !

উঠে দাঁড়াল ধীরেন্দ্রলাল। করুণ চোখে পদ্মের গম্ভীর মুখখানার দিকে তাকাল। পদ্মর চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে। কিন্তু মৃদু অথচ কঠিন গলায় বলল— যাও—নীরদাকে বিয়ে করে সুখী হও। তাকে সুখী করো। তুমি একদিন আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলে, সেই স্মৃতি নিয়েই—অব্যক্ত একটা ব্যথার উজান ঠেলে আর কিছু বলতে পারল না পদ্ম। এক পা এক পা করে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ধীরেন্দ্রলাল।

পুঁটি এসে ঘরের চৌকাঠে দাঁড়াল। বিছানায় মুখ গুঁজে হু হু করে কাঁদছে পদ্ম। পুঁটিরও চোখ বেয়ে অশ্রুর ফল্গু ঝরল। পদ্মর

পিঠে হাত রেখে বলল—এইরকমই হয় দিদি। যা তোমার করা উচিত ছিল বহুদিন আগে, তা না করে তুমি শুধু স্বপ্নই দেখতে।—

কান্নায় উত্তাল রাত্রি শেষ হলো।

পরের দিনই ফটা আর লালু এল। উঠোনে পা দিয়েই তারা চমকে উঠল। রান্নাঘরের বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে পুঁটি। দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে। ভাতের হাঁড়ি চাপায় নি। আর পদ্ম তার বিছানার ওপরে বসে আছে। তার নিস্পন্দ মূর্ত্তিটা ভারী নিঃশ্বাসের বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। জ্বলন্ত অপলক দুটো চোখের পাতায় জমাট অশ্রুর চিহ্ন। লালু ফটার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল। ফটা বলল—বৌদি, কি হয়েছে পদ্মদির ?

—কাল রাত্রে সে এসেছিল—চাপা গলায় পুঁটি ফিসফিসিয়ে বলল—ভেতরে এস, বলছি।—পুঁটি উত্তেজিত কম্পিত গলায় বলল গত রাত্রির সব কথা। সব শেষে নিজের কপাল চাপড়ে বলল—ওদিকে দেখ, দুদিন ধরে দোকান বন্ধ আছে। ঘরে একটা চাল নেই। তোমরা একটু দিদিকে বলো না ভাই !

—লালু যা তুই, পদ্মদিকে বল, তোকে বেশী ভালবাসে।

—আমি পারবো না। তুই যা।

পুঁটি বলল—এস আমরা তিনজনেই যাই। তিনজনে গুটি গুটি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ছে। যদি পদ্মদি বলে—এখানকার বাস তুলে দিয়ে অন্য কোন শহরে চলে যাবো, তাহলে একেবারে বেকার হয়ে যাবে তারা ! ছয়টা চোখের কাতর চাউনির দিকে তাকিয়ে পদ্ম বিচলিত গলায় বলল—কি হয়েছে রে তোদের ?

—পদ্মদি, আমরা অন্য বিড়ির কারখানায় চাকরী নেব ?

—দুদিন খোলো নি পদ্মদি।

—ঘরে এক দানা চাল নেই।

বিছানা থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াল পদ্ম। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। দৃঢ় গলায় বলল—আজ থেকেই আবার দোকান চলবে।

—চলবে !

—চলবে পদ্মদি ?

—বাঁচালে দিদি, তুমি এবার বসবে দোকানের ক্যাশে। আর আমি পেঁয়াজী বিক্রী করবো।—বলল পুঁটি।

—শোক, দুঃখ কার নেই বলো পদ্মদি। হাজার দুঃখ পেলেও মানুষ উঠে দাঁড়ায়, গান গায়, হাসে।—ফটা হঠাৎ দার্শনিক হয়ে ওঠে।

—আরে শালা জীবনটা কয়দিনের রে ! হেসে খেলে, গান গেয়ে ফুঁকে উড়িয়ে দাও না।—আকাশের দিকে হাত ছুড়ে বলল লালু—ঐ যে পদ্মদি—কি একটা গান আছে না—হায় রে মানুষ, ভাবের ফানুস—

ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে হাসতে গিয়ে পদ্মের চোখে জল এসে পড়ল।

॥ উনত্রিশ ॥

তারপরেও বছর কেটেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে রামনগর শহরের। আত্রাইয়ের খালের ধারে পাওয়ার হাউস বসেছে। এখন পীচ বাঁধানো রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিজলী বাতি জ্বলে। লোকসংখ্যাও অনেক বেড়েছে। কবে একদিন রাত্রিশেষের ফিকে অন্ধকারে কালিয়াগঞ্জের যাত্রীবাহী মোটরে আরও দশটা মানুষের মত এক ছন্নছাড়া যুবক, ধীরেন্দ্রলাল চাকরী খুঁজতে এসেছিল এই শহরে। সে বিড়ি কারিগরদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও হয়েছিল—সেসব কথা এখনকার মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে নিঃশেষে। কিন্তু বাজারের মোড়ে শিব-পার্বতী ঔষধালয়টা ছাড়িয়ে সোজা পশ্চিমদিকে বঙ্গীর রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে 'জিন্দাবাদ' বিড়ির দোকানটা আজও আছে। আরও বড় হয়েছে দোকানটা। নতুন করে সাইনবোর্ড লেখা হয়েছে—"বিড়ি বিক্রেতা—বিড়ির পাতা এবং গুজরাটী ও নেপালী মশলা সর্বদা বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে।" ইলেকট্রিকের

আলোয় জলজল করছে লেখাগুলো। দোকানের ফরাসের এক কোণে ক্যাশবাক্সের ওপর হাত রেখে বসে থাকে পদ্ম। তার কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রূপোর তারের মত কয়েকটা সাদা চুলও উঁকি দিচ্ছে। মুখের ভাঁজে ভাঁজে রেখা পড়েছে। ফটা আর লালুর মুখেও বয়সের ছাপ পড়েছে।

সেদিন শিব-পার্বতী ঔষধালয়ের সামনে কলেজের ছেলেদের একটা দল গোল হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কলেজ ইউনিয়নের ইলেকশান নিয়ে হল্লা করছিল। হঠাৎ কলেজের ছাত্রনেতা অসীম রায়, পদ্মর দিকে ইঙ্গিত করে বলল—নিজের দল থাকলে আবার দাঁড়ানো যায় না। বহুদিন আগে—ঐ যে দেখছিস মেয়েলোকটা, সে আর শহরের সব বিড়ি কারিগররা মিলে একটা ক্যারেক্টার-লেশ গুণ্ডাকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান করে দিয়েছিল বুঝলি?

গুণ্ডা! পদ্মর কানে কথাটা যেন তীরের মত বিঁধে যায়। সে গুণ্ডা? কিন্তু কৈ তাকে তো সে এক মুহূর্তের জন্যও মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না! কেমন করে সে তাকে ভুলবে? তার ক্ষয়ক্ষতিতে ভরা, নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখী জীবনের হাজারো জ্বালাধরা দুঃস্মৃতির পীড়নের ভেতরে শুভ্র ও পবিত্র ফুলের মত একটি—মাত্র একটি মধুর স্নিগ্ধ স্মৃতি—ধীরেন্দ্রলাল। তার জীবনের প্রথম ও শেষ ভালবাসা। কোন অভিযোগের কালো ছায়া পড়ে না পদ্মর মনে। শুধু বুকের ভেতরে একটা প্রার্থনা মধুর নিঃশব্দ সঙ্গীতের মত ঝরে পড়ে—ভগবান ওকে সুখী করো—কিন্তু—

•

কিন্তু ঘরের একটা অন্ধকার কোণে ধীরেন্দ্রলালের নাম দেওয়া 'জিন্দাবাদ বিড়ি'র রঙীন লেবেলের স্তূপকৃত কাগজ, তার টাঙানো নেতাজী ও গান্ধীজীর ছবির দিকে তাকাতেই তীব্র একটা ব্যথা পাক দিয়ে উঠল তার বুকের ভেতরে। চোখ দুটো জলে ভরে এল।

—কি ভাবছো দিদি?—তেলেভাজা বিক্রী শেষ করে পুঁটি দোকানের ভেতরে এসে দাঁড়ায়। চমকে ওঠে পদ্মর চেতনা। চেঁচিয়ে বলে—ফটা,

লালু তাড়াতাড়ি হাত চালা রে। বংশীহারী, পতিরাম বোল্লার পাইকাররা এখুনি এসে পড়বে। মালদহ থেকেও বিড়ির পাতার খরিদ্দার আসবে—

—তা তো আসবেই পদ্মদি—ফটা বলে,—বিড়ির পাতা আর মশলা স্টক রাখার জন্য আমাদের মার্কেট এ জেলার বাইরেও যে ছড়িয়ে পড়েছে!

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কলের মত দ্রুত হাত চালায় লালু। বলে—ঘাবড়িও না পদ্মদি। বিকেলের ভেতরে সব বিড়ি একেবারে আগুনে সেঁকে বিড়ি সাপ্লাই দেব।

॥ শেষ ॥